জিজ্ঞাসা ও জবাব
(৫ম খণ্ড)
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

লেখক পরিচিতি

ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
জন্ম: ঝিনাইদহ জেলায় ১৯৫৮ সালে।
মৃত্যু: ১১ই মে ২০১৬।

পিতা মরহুম খোন্দকার আনোয়ারুজ্জামান। মাতা বেগম লুৎফন্নাহার।

ঝিনাইদহ আলিয়া মাদ্রাসায় ফাজিল পর্যন্ত অধ্যয়নের পর ১৯৭৯ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রথম শ্রেণীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে হাদীস বিষয়ে কামিল পাশ করেন। সৌদি আরবের রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬, ১৯৯২ ও ১৯৯৮ সালে যথাক্রমে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পি-এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন । দেশ ও বিদেশে যে সকল প্রসিদ্ধ আলিমের কাছে তিনি পড়াশোনা ও সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খতীব মাওলানা ওবাইদুল হক (রাহ.), মাওলানা মিয়া মোহাম্মাদ কাসিমী (রাহ.), মাওলানা আনোয়ারুল হক কাসিমী (রাহ.), মাওলানা আব্দুল বারী সিলেটী (রাহ.), মাওলানা ড. আইউব আলী (রাহ.), মাওলানা আব্দুর রহীম (রাহ.), আল্লামা শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আযীয ইবন বায (রাহ.), আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন (রাহ.), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আল-উসাইমীন (রাহ.), শাইখ সালিহ ইবন আব্দুল আযীয আল শাইখ, শাইখ সালিহ ইবন ফাওযান ইবন আব্দুল্লাহ আল ফাওযান।

কর্ম জীবনে তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৯৮ সালে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সালের ১১ই মে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করার আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলা ইংরেজী ও আরবি ভাষায় তাঁর প্রায় অর্ধশত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক।

গবেষণা কর্মের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আল ফারুক একাডেমী' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রচার ও মানব সেবার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে 'আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট' নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০১২ সালে Education and Charity Foundation Jhenaidah নামে একটি শিক্ষা ও সমাজ সেবাসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সকল প্রতিষ্ঠান শিক্ষাপ্রচার, ধর্ম প্রচার, দুস্থ নারী ও শিশুদের সেবা ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

জিজ্ঞাসা ও জবাব

(৫ম খণ্ড)

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদনা

শাইখ ইমদাদুল হক

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

মোবাইল: ০১৭৩০৭৪০০১, ০১৭৮৮৯৯৯৬৮

dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust

www.assunnahtrust.com

জিজ্ঞাসা ও জবাব (৫ম খণ্ড)

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
(১৯৫৮-২০১৬)

সম্পাদনা
শাইখ ইমদাদুল হক

অনুলিখন
আল মাসুদ আব্দুল্লাহ
সাফায়াত শাহরিয়ার সাক্ষর

প্রচ্ছদ : আলি মেসবাহ
গ্রন্থস্বত্ব : আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২০ ঈসায়ি, রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরি

প্রকাশক : উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

বিক্রয়কেন্দ্রঃ
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবাইলঃ
০১৭৩০৭৪৭০০১, ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৫, ০১৭১৬৪৮৯৯৭৫
আস-সুন্নাহ টাওয়ার, ঝিনাইদহ, মোবাইলঃ ০১৭১৬৪৮৫৯৬৬, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪
ফুরফুরা দরবার, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা, মোবাইলঃ ০১৮৭৩৯৩৫২৪৫, ০২-৯০০৯৭৩৮

হাদিয়াঃ ২২০ (দুইশত বিশ টাকা মাত্র)

Jiggasa O Jawab (Volume-5) (Question & Answer)
by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir (Rahimahullah)
First Published by As-Sunnah Publications.
As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. November-2020

Price : Taka 220 only
ISBN : 978-984-93633-2-2

প্রকাশকের কথা

প্রশংসা আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের উপর। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন মাহফিলে ও টিভি চ্যানেলে বহু মানুষের যুগজিজ্ঞাসার জবাব কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রদান করেছেন। তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি মাহফিলগুলো ভিডিও ক্যাসেটবন্ধ করতেন। ফলে তাঁর প্রশ্নোত্তর ও বক্তৃতা যেমন সংরক্ষিত রয়েছে; তেমনি তা সংযোজন ও বিয়োজনের হাত থেকেও রক্ষা পেয়েছে। তিনি তাঁর মৌলিক রচনাগুলো যেমন তথ্যনির্ভর করে সাজিয়ে গেছেন, তেমনি তাঁর যুগজিজ্ঞাসার জবাবগুলোও কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে প্রদান করে গেছেন। বর্তমান জটিল জীবনধারায় তাঁর প্রদত্ত বহু জিজ্ঞাসার জবাব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে ইসলামের আলোর পথ দেখাবে বলে আমরা আশা রাখি। বিভিন্ন ভিডিও ক্যাসেট, টিভি চ্যানেল ও ইউটিউবে থাকা তাঁর প্রশ্নোত্তরমালা সংগ্রহ করে '*জিজ্ঞাসা ও জবাব*' নামে সিরিজ আকারে আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স তা প্রকাশ করছে বলে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই। মহান আল্লাহ যেন লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করেন এবং লেখকের রচনাগুলোকে তাঁর জন্য কবুল করেন। পরিশেষে সকলের নিকট দুআ কামনা করি।

উসামা খোন্দকার
চেয়ারম্যান
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট।

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান দয়াময় আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও কল্যাণ কামনায় প্রলয়দিবস পর্যন্ত তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর।

আমাদের রব মহান দয়াময়। তাঁর দয়ার অন্যতম নিদর্শন, দুনিয়ার অন্ধকারে কল্যাণপথে চলবার জন্য তিনি আপন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন ওহির জ্ঞান এবং আপন শরীআতে জ্ঞানার্জনকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ মর্যাদা। বান্দার কথা ও কর্ম, এমনকি চিন্তাকে পর্যন্ত সঠিকভাবে চালিত করবার জন্য জ্ঞানকে করেছেন সকল বিধানের উপর অগ্রগামী।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন বিশ্বমানবতা ছিল ধ্বংস ও সর্বনাশের একেবারে দ্বারপ্রান্তে, যেখান থেকে আর একপা ফেললেই সে হারিয়ে যাবে চিরপতনের অতল তলে– যদি আমরা চিন্তাশক্তির সবটুকু প্রয়োগ করে মানুষের দ্বারা সম্ভব এমন সকল পাপ ও অপরাধের তালিকা প্রস্তুত করি এবং ইতিহাসের পাতা উল্টে ফিরে যাই খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীতে, তবে সেখানে কোনো একটি জনপদ হয়ত এমন পাওয়া সম্ভব নয়, যেখানে আমাদের প্রস্তুতকৃত অপরাধ ও পাপের তালিকার কোনো একটি পাপ অনুপস্থিত; সেসময়ে মানবতা যেন নিজেদেরকে ধ্বংস ও সর্বনাশের খেলায় ও নেশায় মেতে উঠেছিল– এই ধ্বংস-উন্মুখ, মুমূর্ষু মানবতাকে মুক্তি ও চিকিৎসার জন্য এই মঙ্গলময় কল্যাণকামী সর্বজ্ঞ সত্তা আমাদের উম্মি নবী (ﷺ) এর নিকট যে আসমানি ব্যবস্থাপত্র পাঠালেন তার সর্বপ্রথম অবতারণ যে মাত্র পাঁচটি আয়াত, সেখান একটি মাত্র আদেশ, দ্বিরুক্ত– 'পড়ো'। এই অবতারণ-দস্তুরই বলে দেয়, মানবতার মুক্তি, সুস্থতা, চিকিৎসা ও সফলতার জন্য 'সর্বস্রষ্টা রবের নামে' পড়ার গুরুত্ব কতটুকু।

পথ-পদ্ধতির ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামে জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প রাখা হয় নি। ইমাম বুখারি রাহ. তাঁর 'কিতাবুস সহীহ'র একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, 'কথা ও কর্মের পূর্বে জ্ঞানার্জন'। মহান আল্লাহ বলেন, "অতএব তোমাদের জানা না থাকলে যারা জানে তাদের

কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও"।[১] নবীজি (ﷺ) বলেন, "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ"।[২] অতএব পড়া, শোনা ও দেখা– যে কোনো পথ ও পদ্ধতিতে আমাদেরকে জ্ঞানার্জন করতে আদেশ করা হয়েছে।

জ্ঞানার্জন তাই মুসলিম উম্মাহর কাছে এক মহান ইবাদত। এই উম্মাহর মনীষী পুরুষগণ জ্ঞানের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছেন জনপদের পর জনপদ। জ্ঞান তাদের কাছে হারানো সম্পদ, জ্ঞানের অন্বেষায় কদম উঠানো 'আল্লাহর রাস্তা', জান্নাতের সহজতম পথ।

মহান আল্লাহ বলেন, "আমি এ উপদেশগ্রন্থ নাযিল করেছি আর আমিই তার সংরক্ষক"।[৩] তিনি এই উম্মাতের উলামায়ে কিরামকে দিয়ে আল কুরআন ও তার ভাষ্যবাণী নবীজি (ﷺ) এর হাদীসকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন। যেখানে অন্যান্য উম্মাত তাদের নবীদের তিরোধানের সাথেসাথেই বড় অবহেলায় নিজেদের কিতাব হারিয়ে ফেলেছে, বিস্মৃত হয়েছে, অপসারণ ও বিকৃত করেছে, সেখানে মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর কিতাব ও নবী (ﷺ) এর হাদীস অবিকল সংরক্ষণের জন্য সাধ্যের সবটুকু করেছে। তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও আমলি নমুনার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এবং কিয়ামত পর্যন্তই এধারা অব্যহত থাকবে।

আর চৌদ্দশত বছর পরে এই পতনুম্মুখ কালেও উম্মাতের অসংখ্য সদস্য কুরআন-সুন্নাহর বিধান জেনে জীবনে তা প্রতিপালনের জন্য পাগলপারা। যারা নানান কারণে ইসলামকে অ্যাকাডেমিকভাবে জানার সুযোগ পান নি তারা বিভিন্নভাবে আলিমদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে শরীআত পালনের চেষ্টা করেন। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ. ছিলেন এমন অসংখ্য মানুষের জিজ্ঞাসাস্থল।

দিনদুপুরে মেঘমুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সূর্যের পরিচয় দানের জন্য একটি শব্দও উচ্চারণ করা যেমন বাহুল্য ও বোকামি, ড. খোন্দকার আব্দল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.কে পাঠক মহলের কাছে পরিচিত করবার জন্য

---

১. সূরা: [১৬] নাহল, আয়াত: ৪৩; সূরা: [২১] আম্বিয়া, আয়াত: ৭।

২. সহীহ বুখারি, হাদীস নং-৬৩১; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-১৬৫৮।

৩. সূরা: [১৫] হিজর, আয়াত: ৯।

বাক্য ব্যয় করাও তেমনই। আমরা শুধু মহান আল্লাহর দরবারে সকৃতজ্ঞ শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি আমাদেরকে এই সূর্যসম মহান মনীষীর ইলমি খেদমতের সাথে কোনোভাবে শরীক হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। আর তাঁর নিকট সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে এই কল্যাণকর্মটি সমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

পাঠক, 'জিজ্ঞাসা ও জবাব' সিরিজের যে বইটিতে আপনি এখন চোখ রেখেছেন তা কোনো লিখিত পুস্তক নয়– এর কিছু প্রশ্ন হয়ত লিখিত, যেসব প্রশ্ন আপনারা বিভিন্ন সময়ে মিম্বারে, ময়দানে ও টিভিতে করেছিলেন। আর জবাবগুলো সবই মৌখিক। তখন স্যার রাহ. আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব আর মুখভরা হাসি নিয়ে আপনাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তখন আপনারা ছিলেন শ্রোতা আর এখন পাঠক।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো তথ্য প্রেরক আর অনুধাবনকারী হচ্ছে মস্তিষ্ক। এক্ষেত্রে চক্ষু ও কর্ণের বিরোধ সুস্পষ্ট। কানের পাঠানো যে তথ্যগুলো মস্তিষ্কের জন্য সুখকর ও সহজবোধ্য, ঠিক সে তথ্যগুলোই যখন চোখ পাঠায় অবিকলভাবে তখন অনেক সময় তা হয়ে পড়ে বিরক্তিকর ও দুর্বোধ্য। উচ্চসাহিত্যমান সম্পন্ন সুলিখিত কোনো প্রবন্ধ, যার পাঠ আপনাকে মুগ্ধ, মোহিত ও আনন্দিত করেছে, সেটি একই গাঁথুনিতে যখন কোনো মঞ্চের বয়ান বা ওয়াযে আপনাকে শোনানো হবে আপনি বিরক্ত হয়ে পড়তে পারেন। তেমনি কোনো মঞ্চ কাঁপানো, দর্শক মাতানো বক্তব্য যখন হুবহু লিখিত হয়ে চোখের সামনে আসে তখন তা সম্পূর্ণ অখাদ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এজন্যই লেখা ও বলার রয়েছে আলাদা আলাদা ধাঁচ।

পাঠক, স্যার রাহ.র হাসিমুখ দেখতে দেখতে যে জবাবগুলো এক সময় আপনারা শ্রবণ করেছেন এখন হতে যাচ্ছেন তার পাঠক। কিন্তু এক্ষেত্রে চক্ষু-কর্ণের বিরোধ যেন আপনার মস্তিষ্ককে পীড়িত না করে সে জন্য আমরা আমাদের সীমা ও সাধ্যের ভেতর থেকে চেষ্টা করেছি। তবে এদিকেও ষোলোআনা খেয়াল রাখা হয়েছে, যেন মূল বক্তব্যের মর্ম কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়, আবার বক্তব্যের কথ্য আমেজ হারিয়ে সম্পূর্ণ লেখ্যাকৃতে পরিণত না হয়। আমরা চেয়েছি, এই সঙ্কলনটি পাঠ করতে গিয়ে আপনি

একই সাথে পাবেন বক্তব্য শ্রবণ ও প্রবন্ধ পঠনের স্বাদ।

'জিজ্ঞাসা ও জবাব' সঙ্কলনটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজনের করা প্রশ্নের জবাবের সঙ্কলন হওয়ার কারণে একই প্রশ্নোত্তরের রিপিট হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে একই বিষয়ের একাধিক প্রশ্নের জবাবগুলোতে অতিরিক্ত ভিন্নভিন্ন কিছু তথ্য বা বিষয় থাকলে আমরা সবগুলো প্রশ্নোত্তরই অবিকল রেখে দিয়েছি। তবে এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নোত্তরকে মূল রেখে অন্য উত্তরগুলোর অতিরিক্ত উপকারী অংশগুলো তার সাথে বিন্যাস্ত করে দেওয়া যেত। চূড়ান্ত সংস্করণের জন্য আমরা এই চিন্তাটা তুলে রাখছি এবং পাঠকের সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি। পাঠকের জন্য সুবিধাজনক ও উপকারী হত প্রশ্নোত্তরগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজাতে পারলে। সেজন্য প্রয়োজন প্রশ্নোত্তরের পুরো ভাণ্ডারটা লিখিত হয়ে যাওয়া। তাই এই বিষয়টাও আমরা চূড়ান্ত সংস্করণের জন্য রেখে দিচ্ছি। তবে এ খণ্ডের ভেতরের বিষয়গুলোকে বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে শুরুতে একটা সূচিপত্র সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও পাঠক দেখতে পাবেন, প্রশ্নে লিখিত বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু পয়েন্ট স্যার উত্তরে আলোচনা করেছেন। প্রধানত তিনটি কারণে এমনটি হয়েছে। টেলিভিশনের লাইভ প্রোগ্রামে স্যার কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, তখন হয়ত কোনো দর্শক- শ্রোতা ফোনে প্রশ্ন করলেন। উপস্থাপক প্রশ্নটির কিছু পয়েন্ট ইঙ্গিতে লিখে রাখলেন এবং চলমান প্রশ্নের জবাব শেষ হলে স্যারকে তার লেখা ইঙ্গিতের আলোকে প্রশ্নটি করলেন। কিন্তু কোনো পয়েন্ট হয়ত বাদ পড়ে গেছে। যেটা স্যার নিজের স্মৃতি থেকে জবাব দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের লিখিত প্রশ্নে আসে নি। স্যারকে লিখিতভাবে প্রশ্ন করলে সবসময় তিনি পুরোটা প্রশ্ন শব্দ করে পড়তেন না, কিন্তু জবাব দিতেন। প্রশ্নের সেই নিঃশব্দে পঠিত অংশ আমরা লিখতে পারি নি। কেননা আমরা তো লিখেছি রেকর্ড থেকে শুনে। আবার কখনো স্যার রাহ. মনে করেছেন, এই প্রশ্নের মৌলিক জবাবের সাথে অতিরিক্ত কিছু কথা না বললে শ্রোতার জন্য বিষযটি বোঝা কষ্টকর হবে অথবা তিনি ভুল বুঝতে পারেন। কখনো তিনি প্রশ্ন শুনে ভেবেছেন, সমাজে এ সম্পর্কে ব্যাপক ভুল ধারণা বিদ্যমান। যে কারণে শুধু প্রশ্নের উত্তরটুকু

যথেষ্ট নয়। তখন তিনি অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কথা বলে সমাজের ভ্রান্তি দূর করতে চেয়েছেন। কেননা পর্দার সামনে শুধু একজন প্রশ্নকর্তা নয়, বরং সেখানে বসে আছে গোটা একটি সমাজ।

সাধারণতই লিখিত বক্তব্যের মতো মৌখিক বক্তব্য উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ হয় না। তবে স্যার রাহ. এক্ষেত্রে ছিলেন অনেকটা ব্যতিক্রম। এসব প্রশ্নের মৌখিক জবাবেও যথেষ্ট কোটেশন তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে সাধারণত রেফারেন্স দেন নি। আমরা তাঁর উদ্ধৃতিগুলোর পাশে রেফারেন্স সংযুক্ত করে দিয়েছি। তবে তার অর্থ এই নয় যে, উদ্ধৃতিটি শুধু আমাদের উল্লেখিত রেফারেন্স গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ, এছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থে তা থাকতে পারে।

বিভিন্ন হাদীসের বইয়ের একাধিক অনুবাদ বাজারে আছে। সেসব অনুবাদের একটার সাথে আরেকটার হাদীস নাম্বারের অনেক অমিল রয়েছে। তাই পাঠক, বাজারের যেকোনো অনুবাদ হাতে নিয়ে যদি আমাদের উদ্ধৃতির সাথে মেলাতে যান হয়ত মিলবে না। আমরা হাদীসের মতন ও নাম্বার সংযোজন করেছি 'মাকতাবা শামিলা' থেকে। একই হাদীস যখন একাধিক সঙ্কলক তাদের নিজনিজ সঙ্কলনে বা একই সঙ্কলক তার কিতাবের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন সেক্ষেত্রে শব্দের তারতম্য ঘটেছে এবং কোথাও অংশবিশেষ, কোথাও পূর্ণ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। পাঠক সাধারণকে কোটেশন মেলানোর ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

কুরআন-হাদীসের কোটেশন উল্লেখ করে স্যার রাহ. সর্বত্র হুবহু অনুবাদ করেন নি। আগে বা পরের বক্তব্যের মধ্যে মর্ম উল্লেখ করেছেন। আমরাও সবক্ষেত্রে অনুবাদ সংযোজনের প্রয়োজন মনে করি নি। কোথাও সংযোজন করলে তা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রেখেছি। পাঠক দেখতে পাবেন, তিনি কখনো পূর্ণ কোটেশন উল্লেখ করে অংশবিশেষের অনুবাদ বা মর্ম উল্লেখ করেছেন, আবার কখনো আয়াত বা হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করে সম্পূর্ণ অনুবাদ বা মর্ম উল্লেখ করেছেন। আমরাও তেমনই রেখে দিয়েছি। তবে দুআর ক্ষেত্রে স্যার যেখানে আংশিক বলে ইঙ্গিত করে থেমে গেছেন, পাঠকের সুবিধার্থে আমরা সেখানে হাদীসের কিতাব থেকে পূর্ণ দুআ

সংযোজন করে দিয়েছি।

স্যার রাহ. ছিলেন অত্যন্ত শরীফ তবিয়তের মানুষ। ছোটবড়, দূরের, কাছের সবাইকেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন এবং হাসি মুখে কথা বলতেন। কিন্তু পাঠক, দেখবেন অনেক জবাবের ক্ষেত্রে স্যার প্রশ্নকর্তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি এমনটি করেছেন যখন বুঝতে পেরেছেন, এই প্রশ্নকর্তা তাঁর ছাত্র বা সন্তানতুল্য অত্যন্ত স্নেহভাজন কেউ।

উলামা ও আয়িম্মায়ে কিরামের প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনের ধারা অনেক প্রাচীন। অনেকেরই প্রশ্নোত্তর সঙ্কলিত হয়ে উম্মাতের কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে এবং ইলমি আকাঙ্ক্ষার পিপাসা মিটিয়েছে। তার ভেতর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রাহ.র 'মাজমুউল ফাতাওয়া' সমাদর, গ্রহণযোগ্যতা ও উপকারিতায় অনন্য। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ. যে দরদ ও কল্যাণেচ্ছা নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন এবং উম্মাতের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন, আমাদের আশা, মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনকেও সমাদৃত, উপকারী ও দীর্ঘস্থায়ী করবেন।

'জিজ্ঞাসা ও জবাব' সিরিজির এখণ্ডটির শ্রুতিলিখন করেছে স্নেহাস্পদ *আল মাসুদ আব্দুল্লাহ ও সাফায়াত শাহরিয়ার সাক্ষর*। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে এ সঙ্কলনটির ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে কবুল করে নেন। একে অনুলেখক, সম্পাদক, ব্যবস্থাপক, প্রকাশক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠক– সকলের নাজাতের ওয়াসীলা বানিয়ে দেন। একাজের মূল ব্যক্তিত্ব ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.র সকল উত্তম কর্মকে কবুল করেন, তাকে উম্মাতের জন্য কল্যাণকর করেন, তাঁর সকল ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে আপন রহমতের কোলে আশ্রয় দেন, তাঁর প্রিয় বান্দাদের সর্বোচ্চদের কাতারে শামিল করে নেন এবং আমাদেরকে জান্নাতে তাঁর সাথে একত্রিত করেন। আমীন! সালাত ও সালাম আল্লাহর খলীল ও হাবীব মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন ও সহচরগণের উপর।

ইমদাদুল হক
মাদরাসাতুত তাকওয়া
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

সূচিপত্র

ঈমান/আকীদা

জিজ্ঞাসা: ০১

কোনো ব্যক্তি যদি জান্নাতি হয়, সে কি তার পরিবার বা পিতামাতার জন্য সুপারিশ করতে পারবে?

জবাব:

প্রথমত সুপারিশ বিষয়ে আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে। শিরক পর্যায়ের বিশ্বাস আছে। মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাদের ইবাদত করত। কারণ ফেরেশতারা সুপারিশ করবে। আমরা যদি তাদের খুশি করতে পারি, মানত করি, তাদের নামে গরু জবাই করে দিই তাহলে তারা খুশি হবে। তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। ফেরেশতারা সুপারিশ করবে এটা সঠিক। আরবের কাফিরদের বিশ্বাসটা সঠিক না ভুল? ভুল। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার এটাকে খণ্ডন করেছেন।

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضَى.

ফেরেশতারা সুপারিশ করবে কিন্তু আল্লাহর অনুমতি লাগবে, আল্লাহর খুশি লাগবে।[১]

১. সূরা: [৫৩] নাজম, আয়াত: ২৬।

অন্য জায়গায় বলেছেন:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ • لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ • يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ.

[তারা বলল, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তা থেকে পবিত্র। বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না, তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে। তাদের সামনে ও পেছনে যা আছে তিনি তা জানেন। তারা শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করবে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত।][২]

ফেরেশতাদের তারা এজন্য ইবাদত করত যে তারা আল্লাহর সন্তান। তাদের ইবাদত করলে তারা আমাদেরকে তরায়ে নেবে। আল্লাহ বললেন, আল্লাহ যার উপরে খুশি তাকে ছাড়া কাউকে সুপারিশ করতে দেবেন না। অর্থাৎ ইচ্ছা করে কেউ নিতে পারবে না। শাফাআত/ সুপারিশের ক্ষমতা মানে ক্ষমতা না, এটা হল অনুমোদন। আল্লাহ যার উপরে খুশি তাকেই শুধু শাফাআত করতে দেবেন। তাহলে সুপারিশের দরকার কী। আসলেই সুপারিশের কোনো দরকার নেই। আমরা একটা প্রচণ্ড ভুল ধারণার মধ্যে আছি। আমরা মনে করি, বাবামা প্রিয়, সন্তান প্রিয়, পীর সাহেব প্রিয়, মাওলানা সাহেব প্রিয়। সবার চেয়ে প্রিয় কে? আল্লাহ। বাবা দয়ালু, মা দয়ালু, পীর দয়ালু। সবার চেয়ে বড় দয়ালু কে? আল্লাহ। আমার মুক্তির জন্য আমার চেয়েও বেশি ভাববেন আল্লাহ। আমাকে হয় আল্লাহ নিজে মুক্তি দেবেন, আর নইলে কারো মাধ্যমে মুক্তি দেবেন। শাফাআত হল, যিনি শাফাআত করেন, এটা তার একটা সম্মান। রাসূল (ﷺ) এর কাছে কেউ সাহায্য চাইলে তিনি বলতেন:

اِشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ.

যখন কেউ চাইবে, তোমরা কেউ সুপারিশ করবে। কেউ যদি এসে বলে, হুযুর আমার এই সাহায্য লাগবে। আমার অসুবিধা। তোমরা বলবে যে, হুযুর, এটা ভালো মানুষ। আমরা তাকে চিনি। একটু সাহায্য করেন। এতে তোমরা সাওয়াব পাবে। ভালো শাফাআতের জন্য। কিন্তু সিদ্ধান্ত

---

২. সূরা: [২১] আম্বিয়া, আয়াত: ২৬-২৮।

আল্লাহ আমার মাধ্যমে জানাবেন।[৩]

অর্থাৎ শাফাআতটা হল, যিনি করবেন এটা তার একটা ইকরাম। যেমন রাসূল (ﷺ) মক্কা বিজয়ের সময় ঘোষণা দিলেন, যারা হারাম শরীফের ভেতরে থাকবে তারা নিরাপদ। যে নিজের বাড়িতে থাকবে সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে থাকবে সে নিরাপদ। কাউকে মারবেন না, সবাইকে মাফ করে দেবেন। এটা আবু সুফিয়ানের নাম দিয়ে আবু সুফিয়ানকে একটু সম্মান করলেন।

আসলে তোমার ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তোমার ব্যাপারে সবকিছু জানেন কে?... আল্লাহ যখন দেখবেন, আমার বান্দা অনেক গুনাহ করে ফেলেছে, কিন্তু ওই ব্যাপারে একটু ভালো ছিল, আল্লাহ নিজে হয়ত কাউকে দিয়ে তোমার নাজাত দেবেন। সহীহ বুখারিতে এসেছে, যখন সবার শাফাআত ফুরিয়ে যাবে তখন আর কারোর কোনো ক্রাইটেরিয়া দিয়ে বাঁচাতে পারবেন না, তখন আল্লাহ বলবেন, আমারটা বাদ রয়ে গেছে। এখন আমি আমার বান্দাকে জান্নাতে দেব।

আমাদের সমস্যা হল, আমরা খালি বুঝি, অমুক দয়াল, তমুক দয়াল। আসলে সবচেয়ে বড় দয়াল তিনি যিনি মালিক। তিনি আমার সব জানেন, তিনি খুশি হলে কীভাবে আমাকে নেবেন সেটা তিনি বুঝবেন।

সন্তান পিতামাতার জন্য শাফাআত করতে পারবে– এটা দুই রকমের। যখন ছোট বাচ্চা মারা যায়, তাদের জন্য দুআ করি:

اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا.

এটা মাসনুন একটা দুআ। সুতরাং তারা শাফাআত করতে পারবে। এটা অন্যান্য ক্রাইটেরিয়ার (নিয়মের) মতোই। তাদের পিতামাতা যদি আল্লাহ তাআলার দেয়া শর্তগুলো পূরণ করে তারা করতে পারবে।

এছাড়া আর একটা হাদীস আছে। হাফিযদের ব্যাপারে।

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

---

৩. সহীহ বুখারি, হাদীস-১৪৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬২৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫১৩১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৭২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৫৫৬।

যে কুরআন মুখস্থ করল। তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে জানল, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং নিজ পরিবারের এমন দশজনের বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের উপর জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে। এই হাদীসটা সনদগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল।[৪]

জিজ্ঞাসা: ০২

ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে দেশের খুব খারাপ অবস্থা। আমার কাছে এটাকে রং-তামাশা মনে হয়। আসলে ধর্মকে বাদ দিয়ে আমি টুপি মাথায় পরব না, দাঁড়িও রাখব না, ইসলামি পোশাক পরব না, নামায পড়ব না, আবার কীভাবে আমি ধর্মে যাব? এইগুলো মিডিয়ায় প্রচার করে কীভাবে? আমার মাথায় ঢোকে না!

জবাব:

যাদের মিডিয়া তারা বললে তুমি ঠেকাবে কীভাবে? আসলে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে দুনিয়ায় কিছু নেই। সেক্যুলারিজম মানে ধর্মমুক্ততা, ধর্মহীনতা, ধর্ম বিচ্ছিন্নতা। এটাকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা অনুবাদ করি। অনুবাদটা ভুল। যারা অভিজ্ঞ তারা জানেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মহীনতা। এটা ইসলামি বিশ্বাসের সাথে কন্ট্রাডিকটরি (অসঙ্গত)। এটা একটা কুফরি মতবাদ। কেউ যদি মনে করে, আমার জীবনে এই জায়গায় ধর্ম মানব আর এই জায়গায় মানব না। অথবা আমার বিশ্বাসে ধর্ম থাকবে, কর্মে থাকবে না– এটা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে কেউ আর মুসলিম থাকবে না।

জিজ্ঞাসা: ০৩

ইসলামি রাষ্ট্রের রাজা ও প্রজার সম্পর্ক মালিক-ম্যানেজারের। তবে রাষ্ট্রের মালিক রাজা নন, রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদে এটি বলা আছে। এটা আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বের সাথে সাংঘর্ষিক কি না?

জবাব:

---

৪. সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯০৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২১৬; আলবানি, যয়ীফুল জামি', হাদীস-৫৭৬১।

আমার লেখা একটা বই আছে এবং আমি বিভিন্ন বইয়ে এটা লেখেছি। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রথম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে আসেন। এর আগে গ্রিসে ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অচিরেই মৃত্যুবরণ করেছিল। রাসূল (ﷺ) যখন আসেন তখন রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল বংশতান্ত্রিক। বংশের লোকই রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাবে। এবং রাজা প্রজার সম্পর্ক ছিল মালিক এবং চাকরের। রাজা মালিক, প্রজারা তার অধীন। ইচ্ছামতো প্রজাকে মারতে পারেন, বাঁচাতে পারেন। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। চাকর দাস গরু-ছাগল যেমন, ওরকম ছিল মানুষ। ইসলাম বলল, দুটোর একটাও ঠিক না। সরকার ও প্রশাসন নির্বাচন হবে পরামর্শের মাধ্যমে। পরামর্শের মাধ্যমে যে যাবে সে ব্যক্তি মালিক নন। সেই ব্যক্তি জনগণের প্রতিনিধি, সেবক। আর এ জন্যই জনগণ মূলত ইচ্ছা করলে তাকে বাদ দিতে পারে। ইচ্ছা করলে তাকে রাখতে পারে। তিনি ভুল করলে জনগণ জবাবদিহি করতে পারে। এই চিন্তা, এই পদ্ধতি রাসূল (ﷺ) দেন। সাহাবিরা পালন করেন। যারা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে জানেন তারা এটা জানেন।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা যেটা বলি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌম শব্দের অর্থ কী? এটা খুব গালভরা একটা শব্দ। অনেক সময় আমরা বুঝিও না। সার্বভৌম 'সর্বভূমি' থেকে এসেছে। সবটুক ভূমির মালিক সে। এটা ইংরেজিতে Sovereign বা Sovereignty. আরবি হল মালিক বা মিলক। মালিকানা। এখন কথা হল, এই টেবিলটার মালিক আমি। একথা বললে কুফর হবে কি না? আর এই টেবিলটার মালিক আল্লাহ, এই কথা বললে ভুল হবে কি না? আমার একটা বাড়ি আছে বা জমি আছে, সম্পত্তি আছে– আমি যদি বলি। সবকিছু আল্লাহর, এটা ঠিক আছে। আবার যদি বলি, এটার মালিক আমি, তাহলে এটাও নাজায়িয না। প্রকৃত মালিকানা। কিন্তু জনগণ বা কোনো ব্যক্তির অধীনে রয়েছে, যিনি এটা ব্যবহার করেন। তবে তাকে আল্লাহর বিধান মতো ব্যবহার করতে হবে। বিধানের বাইরে গেলে আল্লাহর কাছ থেকে আটকা পড়তে হবে।

জিজ্ঞাসা: ০৪

আমাদের সমাজে অনেক শিরক চালু আছে। দুয়েকটি প্রচলিত শিরক যদি আমাদেরকে বলেন!

জবাব:

শিরক বিষয়টার অর্থ আমরা জানি। অর্থাৎ অংশীদারত্ব। কোনো সৃষ্টির ভেতর, কোনো মানুষ, ফেরেশতা, নবী, পয়গম্বর ওলি– কারো ভেতরে আল্লাহর তাআলার কোনো গুণ আছে বা ক্ষমতা আছে অথবা আল্লাহর যে ইবাদত তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পেতে পরে, এটা মনে করা হল শিরক। যেমন, কেউ আল্লাহর ভেতরে ফানা হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর সাথে মিশে যেতে পারে। আল্লাহর সাথে এক হয়ে যেতে পারে। অথবা আল্লাহর ক্ষমতা ভাণ্ডার তার কাছে আছে। অথবা ইচ্ছা করলে ভালো-মন্দ করে দিতে পারে। অথবা দূর থেকে ডাকলে শুনতে পারে। এই বিশ্বাসগুলো শিরক। ঠিক তেমনই দূর থেকে কাউকে ডাকা। কোনো মাযারে বা দরগায় মানত করা। এগুলো সবই শিরক। মৃত ব্যক্তির কাছে চাওয়া শিরক। যেগুলো সমাজে ব্যাপক হয়ে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা: ০৫

'আল্লাহু মুহাম্মাদ' নাম দুটি এইভাবে বলা যাবে কি না? অর্থাৎ এটা বললে শিরক হবে কি না?

জবাব:

'আল্লাহ মুহাম্মাদ' কীভাবে বলব? একটা হল 'আল্লাহ' এক জায়গায় লেখা আছে, 'মুহাম্মাদ' আলাদা লেখা আছে। 'আল্লাহু মুহাম্মাদুন' (الله محمد) দুইটা শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারণ করা আছে। আরেকটা হল, দুইটা একসাথে 'আল্লাহু মুহাম্মাদুন', অর্থ আল্লাহই মুহাম্মাদ (নাউযুবিল্লাহ), এটা বলা। আরেকটা যেটা, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এখানেও 'আল্লাহু'র পরে 'মুহাম্মাদ' আছে। এই তিনটি বাক্যের তিন রকম বিধান। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এটাতে তাওহীদের দুটা কালিমা একত্রে বলা। এতে কোনো দোষ নাই। এক্ষেত্রে অনেকে খুব বেশি আপত্তি করেন। এটা একমাত্র মূর্খ, আরবি জানে না, দীন জানে না, এরা ছাড়া এই ধরনের কথা আর কেউ বলে না। তারা বলতে চান, এটা বললে শিরক হয়। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ হয়ে গেলেন। প্রথম হল, কুরআনের যে দুটা আয়াত– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কুরআনের আয়াত। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কুরআনের আয়াত। দুইটা আয়াতকে এক জায়গায় বললে, মাঝখানে 'ওয়াও' (و) না দিলে, শিরক

হবে, কুফর হবে– এটা কে বলল? যেমন, আমি যদি বলি, 'সুবহানাল্লাহ' এটা একটা বাক্য। 'আলহামদু লিল্লাহ' একটা। দুইটা কুরআনে আছে। আমি সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ বললাম, মাঝখানে ওয়াও লাগালাম না। এটার জন্য তো নষ্ট হবে না। দুইটাই কুরআনের দুটো বাক্য। একটা কথাকে খারাপ বলতে গেলে তার দলীল লাগে।

দুই নাম্বার কথা হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এটা পরিপূর্ণ বাক্য। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এটা আলাদা একটা বাক্য। আমি যদি বলি, দেশের প্রেসিডেন্ট আব্দুল সালাম, আব্দুল করীম তার চাকর। আমি কি বলব যে, আব্দুল সালাম আব্দুল করীম একসাথে বললাম বলে আব্দুল সালাম আব্দুল করীম হয়ে গেল? এক হয়ে গেল অথবা শিরক হয়ে গেল? অথবা প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদা নষ্ট হল। রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার হতে হবে? এটা কোনো কথা হল নাকি? দুটো ভিন্ন বাক্য। দুইটা ভিন্ন বাক্যকে একত্রে উচ্চারণ করার ভেতরে কোনো সমস্যা নেই। তবে হাদীস শরীফে কালিমায়ে শাহাদাত হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ওয়া আন্না' এসেছে। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এসেছে।

যেমন ইমাম ইবন হাজার আসকালানি 'ইসাবা'র মধ্যে একটা বর্ণনায় এনেছেন, আবু যার গিফারি (রা.) এর সূত্রে– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এমন একটা বর্ণনা। সনদটা সহীহ। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে রয়েছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পতাকায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা থাকত। এটা বিভিন্ন রিওয়ায়াতে এসেছে। সেখানে উপরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' নিচে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' দুইটা বাক্য লেখা থাকত।

তৃতীয়ত হল, তাবিয়িদের যুগ থেকে, বিশেষ করে, অনেকেই ব্যবহার করছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এটা হল শাহাদাতাইনের খোলাসা। আরবরা পড়েছেন, মেনে নিয়েছেন। সাহাবি, তাবিয়ি মেনে নিয়েছেন। কোনো কোনো সহীহ রিওয়ায়াতেও এসেছে। আমি এত বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেলাম, আরবদের চেয়ে বেশি আরবি বুঝলাম যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বললেই শিরক হয়ে যাবে? এটা খুবই মূর্খতাসুলভ কথা।

আর দ্বিতীয় বিষয় হল যে, একদিকে 'আল্লাহ' লেখা আরেকদিকে 'মুহাম্মাদ' লেখা। মসজিদে অনেক সময় লেখা হয় বা ঘরে লেখা হয়। এটা অনুচিত। কারণ এটা থেকে মনে হয় আমাদের উপাস্য দুইজন। তবে কোনো মুসলিম কোনো এই কাজ করলে এটাকে সরাসরি শিরক বলতে হয় না। তিনি এই সেন্সে লেখেন নি। তিনি আল্লাহকে মাবুদ হিসেবে। মুহাম্মাদ (ﷺ) কে রাসূল হিসেবে দুজনের নাম লেখেছেন দুই জায়গায়। আলাদা আলাদা করে। তবে এটা অনুচিত। আমাদের উচিত আল্লাহর সাথে আল্লাহর পরিচয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' আর মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সাথে তাঁর পরিচয় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এরকম বাক্য লেখা। আর কেউ যদি বলে 'আল্লাহু মুহাম্মাদুন' (নাউজুবিল্লাহ), আল্লাহ-ই মুহাম্মাদ– এটা শিরক। এটা কুফর। এটা তো সবাই জানে।

<u>জিজ্ঞাসা: ০৬</u>

একভাই প্রশ্ন করেছেন, 'হুযুর আমি নামায পড়তে পারি না। নামায ঠিকমতো পড়া হয় না। কিন্তু আমার ঈমান ঠিক আছে । নামায পড়ি না, কিন্তু ঈমান ঠিক আছে'। প্রশ্নটা হচ্ছে নামায না পড়েও ঈমান ঠিক থাকে কি না?

<u>জবাব:</u>

এক্ষেত্রে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় বুঝতে হবে। যে ভাই প্রশ্ন করেছেন নামায না পড়লে ঈমান ঠিক আছে। আমার তাকে বলার প্রথম বিষয় হল, আমি আমার মায়ের কাছে যাই না। মায়ের সাথে কথা বলি না। মাকে ডাকি না। কিন্তু আমার পুত্রত্ব কিন্তু ঠিক আছে। আমি যে তার সন্তান এটুকু ঠিক আছে। এইটুকু ঠিক থাকালেই হবে? না, মায়ের কাছে যাব। মাকে মা বলে ডাকব। মায়ের আদর নেব। মাকে আদর করব। এটা আমার মনের দাবি। এটাকে প্রথমে বুঝতে হবে।

নামায না পড়লেও যদি ঈমান ঠিক থাকে, যদি থাকেও, এটুকু ঈমানে তো আমাকে তৃপ্তি দিচ্ছে না। আমি মায়ের কাছে যাই না। আমাকে মা বলে ডাকি না। তারপরও মা আমাকে পুত্র মানে। আমিও তাকে মা মানি। ঈমানটা আছে, কিন্তু এটাতো সব না। আর এই ঈমান তো আমাকে মুক্তি দেবে না। আমার মাকে মা ডাকব, জড়িয়ে ধরব। মায়ের কাছে বসব, কথা বলব। ঠিক তেমনই আমার রবকে আমি ডাকব। তার কাছে একটু

বসব। তিনি আমাকে মায়ের দৃষ্টিতে দেখবেন। এটা আমার জন্য সবচেয়ে বড় নিআমত।

দ্বিতীয় বিষয় হল, আমরাও একথা সমাজে শুনি, নামায না পড়লে কী হয়? ঈমান তো ঠিক আছে! এটা অবাস্তব কথা হলেও আমাদের জন্য (হুযুরদের জন্য) কিন্তু ভালো কথা। আমরা যারা হুযুর আমাদের জন্য ভালো কথা। কী জন্য? যারা নামায পড়ে না, কিন্তু ঈমান আছে। অর্থাৎ মনে করে, বোঝে, আল্লাহ বিপদ-আপদ দেয়। আল্লাহ বিপদ-আপদ কাটায়। এতটুকুতে ঈমান আছে। কিন্তু নামায পড়ে না। আল্লাহর কাছে দুআ করা, কান্নাকাটি করতে জানে না, সিজদা করতে জানে না। তারা প্রথমত, একটু অস্থির হন। ছোটখাট বিপদ-আপদে অস্থির হয়ে পড়েন। ধৈর্য তাদের কম থাকে। দ্বিতীয়ত, যেকোনো বিপদ-আপদেই তারা আল্লাহকে যেহেতু ডাকতে পারে না, ডাকার জন্য আমাদের মতো মানুষদের কাছে যায়। এবং খালি হাতে আসে না কখনো। কিছু নিয়ে আসে। কাজেই সমাজে বেনামাযি ঈমানদার যত বেশি থাকে, আমাদের সুবিধা তত বেশি হয়। সবসময় দেখবেন, নামাযি মানুষের সবর বেশি, এবং কিছু হলে নামাযের মাধ্যমে দুআ-খায়ের করে বিপদ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। আর সহজে আমাদের কাছে টাকা পয়সা নিয়ে আসেন না। এজন্যই বেনামাযি মুসলিম– ঈমান আছে, এরকম মানুষ সমাজে থাকা আমাদের লাভ।

কিন্তু পাঠক, আপনাদের কী? আপনাদের তো বহুমুখি লস। প্রথমত ঈমানের লস হল। অনেক হাদীসে বলা হচ্ছে, সালাত আদায় না করলে ঈমান থাকে না। দ্বিতীয়ত, যদি থাকেও, বিপদে পড়ে অন্যের কাছে গেলে ঈমান নষ্ট হতে পারে। কারণ বিপদে তো আল্লাহকে ডাকতে হয়–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

[আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।][৫]

তৃতীয়ত, আপনি হাদিয়া-তোহফা আমাকে দিয়ে গেলেন। আমি দুআ করলাম। বিপদ সাধারণত কাটে না। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ... وَأَمَّا السُّجُوْدُ

৫. সূরা: [১] ফাতিহা, আয়াত: ৪।

فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ .

বান্দা যখন নামাযে সিজদা করে তখন আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। ও সময় যে দুআ করে আল্লাহ সেই দুআ কবুল করবেন-ই করবেন। সেই সম্ভাবনা খুবই বেশি। কাজেই তোমরা এই সময় বেশি বেশি দুআ করো।[৬] বান্দা যদি সালাতে দাঁড়ায়, আল্লাহ বলেছেন:

وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

[তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।][৭]

যেকোনো বিপদে সালাতে দাঁড়িয়ে, সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে বলে, আল্লাহ, আমার বিপদ কাটিয়ে দাও। তাতে তার বিপদ কেটে যায়। আর আল্লাহর কাছে কান্নার কারণে, সিজদার কারণে আল্লাহর ওলি হয়ে যান। কাজেই আমরা এই কথা না বলে আমাদের ঈমান বাড়াতে থাকি।

আর সালাত তো আমার জন্য। হুযুরের জন্য নয়। কারো জন্য নয়। বরং সালাত আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে মূল সম্পর্ক। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করেন। স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়া যায়। মায়ের সান্নিধ্য যেমন মজা লাগে, স্রষ্টার সান্নিধ্য এর থেকে অনেক বেশি মজা লাগে। পার্থক্য হল, দুষ্টু ছেলে এত দুষ্টু হয়ে যায়, মায়ের কাছে যে মজা পায় না। এটা দুষ্টামির কারণে। কিছুদিন মায়ের কাছে গেলে, আদর পেলে তখন বুঝবে মায়ের কাছে যাওয়া কেমন মজার। ঠিক তেমনই দুষ্টু ঈমানের অধিকারীরা আল্লাহর কাছে না যেতে যেতে নামাযে মজাটা পায় না। কিছুদিন গেলে বুঝবে নামাযটা কি মজার জিনিস। আসলে নামাযটা লোভের বিষয়। নামায আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়ার সুযোগ, যে, আমার মালিকের সাথে আমি কথা বলছি। আমার মনের দুশ্চিন্তা চলে যাচ্ছে। সালাত আদায় করলে, কিছু না করে দাঁড়িয়ে থাকলেও সালাতে সালাম ফেরানোর পরে মনের বোঝা অনেকটা কমে যায়।

---

৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৭৯, ৪৮২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৭৫, ৮৭৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১১৩৭।

৭. সূরা: [২২] বাকারাহ, আয়াত: ৪৫।

তাহারাত/পবিত্রতা

জিজ্ঞাসা: ০৭

পেশাব-পায়খানা করার পরে ঢিলা-কুলুখ ও পানি দুটা একসাথে নিতে হবে? নাকি যে কোনো একটি নিলেই চলবে?

জবাব:

প্রথমে এক্ষেত্রে, আমাদের বুঝতে হবে, ঢিলা-কুলুখ কীভাবে নেব? রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবিগণ, তাবিয়িগণ, আমাদের চার ইমামসহ সবাই ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার বলতে বসা অবস্থায় ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন বুঝিয়েছেন। পেশাবের পরে, পায়খানার পরে বসা অবস্থায় পানি ব্যবহার করা। দাঁড়ানো, হাঁটা– এসব তারা কখনো করতেন না।

দ্বিতীয় হল, এক্ষেত্রে মূল ওয়াজিব হল পানি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন হওয়া। কেউ যদি শুধু পানি ব্যবহার করে তাহলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কোনো সমস্যা নেই। তবে কোনো কোনো হাদীসের আলোকে উলামায়ে কিরামের প্রায় সবাই একমত, প্রথমে ঢিলা ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন হয়ে এরপরে পানি ব্যবহার করে পবিত্র হওয়াটা সর্বোত্তম। এক্ষেত্রে হাদীস নিয়ে কিছু কথা ছিল। অনেকেই দুটো ব্যবহারের হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানি (রাহ.) যয়ীফ বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে আরো একটা হাদীস পাওয়া গেছে 'তারীখুল মদীনা' আবু শুব্বাতে [ইবন শাব্বাহ]। সেখানে একটা সহীহ হাদীস পাওয়া গেছে। সাহাবিরা দুটো একসাথে ব্যবহার করতেন। দুটো একসাথে ব্যবহার করা, অর্থাৎ আগে ঢিলা ব্যবহার করে পরিচ্ছন্ন হওয়া, পরে পানি ব্যবহার করা উত্তম। তবে শুধু পানি ব্যবহার করলে তার সব আদায় হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা: ০৮

একবোন প্রশ্ন করেছেন, ওযু করার পরে যদি কোনো মহিলার মাথার কাপড় পড়ে যায় তাহলে তার ওযু ভাঙে কি না?

জবাব:

আমাদের দেশের মানুষের ধারণা, ওযুর পরে মাথার কাপড় খুলে গেলে, পর পুরুষ দেখলে বা শরীরের কাপড় খুলে গেলে ওযু ভেঙে যায়। এই চিন্তাগুলো ভুল। এগুলো সবই ভুল চিন্তা। ওযু ভাঙার সুনির্ধারিত কারণ আছে। এর বাইরে মাথার কাপড় খুলে গেলে। এমনকি শরীরের সব কাপড় খুলে গেলেও অযু ভাঙে না। কারো যদি একাকী কাপড় খুলে যায়, তাহলে গুনাহও হবে না। কারো যদি স্বামীর সামনে, সন্তানের সামনে বা আপন জনের সামনে মাথার কাপড় খুলে যায়, তাহলে কোনো গুনাহ হবে না। ওযু ভাঙবে না। বেগানা পর পুরুষের সামনে মাথার কাপড় খুলে গেলে গুনাহ হবে। বড় একটা ফরয তরকের গুনাহ হবে। কিন্তু ওযু ভাঙবে না।

সালাত/নামায

জিজ্ঞাসা: ০৯

ফজরের সালাত ৫:৩৫ এবং আসরের সালাত ৪:৩০ এ পড়লে জামাআত শুদ্ধ হবে কি না?

জবাবঃ

সময়টা অস্পষ্ট। তবে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, অক্টোবরে ৬টার পরে বেলা উঠে সাধারণত। আমরা যেহেতু অক্টোবর পার হয়ে আসলাম। আর সাড়ে পাঁচটা, ৫:৪৫টার দিকে সূর্য ডোবে। কাজেই কেউ যদি সূর্য ওঠার আগে ছয়টার আগে ফজরের নামায পড়ে নেয় তাহলে ফজর সহীহ, জামাআত সহীহ। আর কেউ যদি বেলা ডোবার অন্তত ঘণ্টা খানেক আগে আসর পড়ে তাহলে জামাআত সহীহ। বেলা একেবারে লালচে হলে নামায মাকরুহ হবে। হাদীসে বারবার নিষেধ করা হয়েছে। ওয়াক্তের শুরুর ব্যাপারে যত মতভিন্নতাই থাক, শেষটা হাদীসে খুবই স্পষ্ট। আর শেষের আগে জামাআত করলে জামাআত সহীহ। তবে এখানে একটা হাদীসের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যেটা অনেক সময় আমরা মনে করি– রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

سَتَكُوْنُ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا.

তোমাদের উপর এমন কিছু আমীর আসবে, যারা সালাতকে তার ওয়াক্তের পরে নিয়ে যাবে। আসরের ওয়াক্ত হলে যুহর পড়বে। সাহাবিরা যখন বললেন, তখন আমরা কী করব? রাসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা

ওয়াক্ত মতো নামায পড়বে, আবার তাদের সাথে জামাআত করবে।[১] এই হাদীসের অর্থ করেন, তারা সালাতকে শেষ ওয়াক্তে নিয়ে যাবে। হাদীসটা তা না। হাদীসে এসেছে 'আন'। 'আন' শব্দের অর্থ ওয়াক্ত পার হয়ে পরে চলে যাওয়া। যদি পরের ওয়াক্তে চলে যায়, তাহলে নামায হবে না আর ওয়াক্তের শেষে গেলে নামায হবে।

জিজ্ঞাসা: ১০

একই সাথে বিভিন্ন এলাকায় মসজিদে আযান হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কোনটার জবাব দেব?

জবাব:

যেটা প্রথমে আমি শুনতে শুরু করেছি ওটার জবাব দেব। এটাই যথেষ্ট। দুয়েকটা মাইক তো, এখন? আমি একটা শুনতে শুরু করেছি। আমি জানি, এটা শেষ পর্যন্ত শুনতে পারব। এটা হতে পারে। অথবা অপেক্ষা করব, আমার মহল্লারটা দিলে আমি জবাব দেব। যে কোনো একটা জবাব দিলেই হবে।

জিজ্ঞাসা: ১১

আমাদের একভাই প্রশ্ন করেছেন, পাঞ্জাবি বা যেকোনো জামা শরীরকে ঢেকে রাখার পর পায়জামা বা যেকোনো কাপড় নাভির নিচে রেখে নামাযের বিধান কী? অর্থাৎ পাঞ্জাবি দিয়ে আমাদের পুরো ঢাকা আছে। এখন নিচ থেকে পায়জামা কেউ যদি নাভির নিচে পরে, তাহলে এই ক্ষেত্রে নামায জায়িয হবে কি না?

জবাব:

জি, এই প্রশ্নটা অনেকেরই আছে। বিশেষ করে আমাদের সমাজে, বর্তমানে সারা বিশ্বেই প্যান্টগুলো বানানো হচ্ছে এমনভাবে যে, প্যান্ট পরলে নাভির নিচে থাকবেই থাকবে। অর্থাৎ নাভি ঢাকা যায় না নাকি

---

১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২৬৮১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৪৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১২৫৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৫৯।

আজকাল ওইসব প্যান্ট পরে। অবশ্য আমি পরি না। কিন্তু অনেকেই বলেছেন। এখন ভাইয়ের যে প্রশ্ন, এটা সহজ। উপরের কাপড়ে যদি নাভি পর্যন্ত আবৃত হয় এমনভাবে যে, রুকু সিজদা কোনো সময় যেন এটা না খোলে। না উন্মুক্ত হয়। তাহলে প্যান্ট নাভির নিচে থাকলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমাদের উচিত আমাদের প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গি নাভি পর্যন্ত পরা। এটা ইসলামি আদব। আর যদি উপরে গেঞ্জি থাকে বা শার্ট থাকে বা এমন কোনো পোশাক থাকে যেটা রুকু করতে গেলে, সিজদা করতে গেলে একটু উঁচু হয়ে যাবে। নাভির নিচের অংশ কিছু খুলে যাবে তাহলে সালাত আদায় হবে না। সালাত ভেঙে যাবে। কারণ সালাতের ভেতরে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত শরীর আবৃত করা ফরয। আর দুই কাঁধসহ উপরের অংশ ঢেকে রাখা ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। কাজেই এমন পোশাক যদি পরি..., স্যান্ডো গেঞ্জি, কাঁধ খোলা আছে, তাহলে সালাত মাকরুহ হবে। তবে এমন পোশাক পরি, গেঞ্জি বা শার্ট, হাতাওয়ালা। রুকু বা সিজদা করতে গেলে উঠে গেল, কোমরের পেছন থেকে খুলে গেল। ফলে সালাত আদায় হবে না।

[আমাদের সমাজে দেখা যায়, মসজিদে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। যদিও নামায পড়ার কারণে তাকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু দেখা যায়, অনেকে এমনভাবে প্যান্ট পরেছে, সিজদা করতে গেলে পেছনের অনেক খানি বেরিয়ে যায়। দেখতেও খুব অডলুকিং এবং নামাযটাও নষ্ট হয়ে যায়। -উপস্থাপক]

আরেকটা বিষয় পাঠকদের বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে পাঞ্জাবি, যেটা উপরে পরা হয়, সেটা পুরো হতে হবে। অর্থাৎ যদি এমন পাতলা হয় যে, পায়জামা নাভির নিচে আর পাঞ্জাবি এত পাতলা যে শরীরের চামড়ার কালার দেখা যাচ্ছে। তাহলেও কিন্তু সালাত আদায় হবে না।

[অনেক ভাই আছেন যারা প্যান্ট পরেন ঠিকই, কিন্তু দেখা যায়, প্যান্ট পায়ের নিচে চলে গেছে। এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখা জরুরি। -উপস্থাপক]

পাঠকেরা হয়ত মনে করতে পারেন, পোশাকের মতো ছোটখাট বিষয় নিয়ে উলামায়ে কিরাম কেন এত কথা বলছেন! আসলে পোশাকের বিষয়টা

সামান্য বিষয় নয়। পোশাকের ভেতরে আমাদের আদব বা আচরণ ফুটে উঠে। দ্বিতীয়ত, এটা থেকে সহজেই অনেক সাওয়াব আমরা পেতে পারি। একজন মানুষ পোশাক ঝুলিয়ে পরেছেন, খারাপ আছে, অনেক অন্যায় করেন, সালাত আদায় করেন, আলহামদু লিল্লাহ। আমরা মোবারকবাদ জানাই, একটা ভালো কাজ করছেন। কিন্তু যে ভাই বা যে বোন আরো ভালোভাবে আল্লাহর কাছে যেতে চান, যে পাপটা পরিহার করা সহজ, পরিহার করলে তার কোনো লস হবে না, সেটা কেন করবেন না? প্যান্টটা একটু সুন্দর করে পরে। কাপড়টা একটু উঁচু করে পরে। পোশাক দিয়েই সভ্যতার সূচনা।

জিজ্ঞাসা: ১২

একভাই প্রশ্ন করেছেন, নামাযের মধ্যে ১৩টি ফরয আছে। কতটি ফরয ছুটে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়?

জবাব:

আমরা যারা বাংলাদেশে থেকে দীন শিখি, সাধারণত হানাফি মাযহাবের আলোকে দীন শিখি। তারা জানি যে, সালাতের ভেতরে ১৩টি ফরয আছে। কিন্তু যখন আমরা বাইরে যাব, (এবং বর্তমান মিডিয়ার যুগ। আবার প্রবাস থেকেও কথা ইন্টারনেট, ডিশ, স্যাটালাইটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে সব যায়গায়), তখন আমরা দেখি ১৩ ফরয নয়। এই বিষয়ে মতভেদ আছে। অর্থাৎ রাসূল (ﷺ) সালাত হাদীসে শিখিয়েছেন। কোনটা ফরয, কোনটা সুন্নাত, এটা তিনি বলে যান নি। এটা নির্ধারণে ফুকাহাদের ইজতিহাদ আছে।

তবে ভাই যে প্রশ্ন করেছেন, সালাতের যেকোনো একটা ফরয নষ্ট হয়ে গেলে সালাত ভেঙে যাবে যদি ইচ্ছাকৃত হয়। সালাত আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে সহজ ইবাদত। দাঁড়ানো ফরয। না পারলে বসবে। না পারলে শুয়ে থাকবে, হেলান দিয়ে পড়বে, চোখের ইশারা দিয়ে পড়বে। কাপড় পরা ফরয। কাপড় নেই। বিনা কাপড়ে, একেবারে উলঙ্গ হয়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। কিবলামুখি হওয়া ফরয। কিন্তু ধরার কোনো সিস্টেম নেই। আমি যেকোনো মুখি হয়ে নামায আদায় করলে নামায হয়ে

যাবে। এভাবে প্রতিটি ফরযই ওজরের কারণে বাদ দেওয়া যায়। অর্থাৎ আমার আর প্রয়োজন থাকে না। ওটা ছাড়াই সালাত হয়ে যাবে। তবে জানা সত্ত্বেও একটা ফরযও যদি নষ্ট হয় তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

[আমরা আমাদের সমাজের অনেক ভাইকে বলতে শুনি নামায অনেক কঠিন। এই কঠিনটা আমরা উলামায়ে কিরামরাই করে দিলাম কি না যে, তারা ভয় পাচ্ছে নামাযটাকে! -উপস্থাপক]

দীনটাকেই আমরা অনেক সময় কঠিন করে ফেলি। আল্লাহ তাআলার দীন আমার জন্য। আমার জীবনের জন্য। হুযুরদের জন্যও নয়, আল্লাহর কোনো স্বার্থের জন্যও নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর স্বার্থের জন্য নয়। আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন যেন আমি ভালো হই। কাজেই আমার সাধ্যের ভেতরে ওটা করা আছে। এটার একটাই বিষয় আছে, শিক্ষক যখন ছাত্রকে পড়া দেন, ছাত্রের স্বার্থ দেখে পড়া দেন। কড়াকড়ি করেন এটা পড়তেই হবে। এটা পড়লে ভালো। কিন্তু সবকিছুই ছাত্রের স্বার্থের সাথে জড়িত। ঠিক আল্লাহর দীন খুবই সহজ। সালাত সহজ, সিয়াম সহজ, আল্লাহর ওলি হওয়া সহজ। এর চেয়ে সহজ কিছু নেই। কারণ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের অনেক সময় কোয়ালিটির সাথে কোয়ান্টিটি যুক্ত থাকে। আপনি সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছেন, পরীক্ষার সময় লেখতে পারেন নি, অজ্ঞান হয়ে গেছেন। পাশ হবে না। কিন্তু আপনি সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছেন, সালাতের জন্য বের হয়ে আসছেন। সালাতে মসজিদে যেতে পারেন নি। পথে অজ্ঞান হয়ে গেছেন বা গাড়ি আটকে গেছে, আপনি পুরো ষোলোআনা জামাআতের সাওয়াব পেয়ে যাবেন। এজন্য সালাত সর্বোচ্চ সহজ। প্রতিটি ইবাদত-ই সহজ। আল্লাহ বিভিন্নভাবে এটাকে সহজ করেছেন। সিয়াম সহজ। এখন না পারলে অন্য সময় পালন করো। সালাত সহজ। পুরো না পারলে যতটুকু পার ততটুকু করো। এভাবে আল্লাহ সহজ করেছেন।

জিজ্ঞাসা: ১৩

আমরা সাধারণত মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে থাকি। এখন একটা সমস্যা হচ্ছে, জুমুআর দিনে জুমুআর আযানের পর মসজিদে প্রবেশ করে দুখুলুল মসজিদ দুই রাকআত নামায পড়ার পর জুমুআর সুন্নাত আছে কিনা। এই নিয়ে সমাজে একটা ইখতিলাফ দেখা

দিয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।

জবাবঃ

ইখতিলাফ সবসময় সেই বিষয় নিয়েই হয়, যেই বিষয় নিয়ে ইখতিলাফ করলে শয়তান খুশি হয়। মানুষ হারাম করে ফেললে সেটা নিয়ে ঝগড়া করতে পার। জুমুআর আযানের পরের দুখুলুল মসজিদের পরে নামায পড়লে কেমন হারামের গুনাহ হয় বলো? হারাম হবে? জুমুআর নামাযের আযান হয়ে গেছে মসজিদে ঢুকেছ। ইমাম সাহেব নেই। তুমি যদি নামায পড়, তাহলে গুনাহ হবে কি না? না। সাওয়াব তো হবে। এটা নিয়ে মানুষ ইখতিলাফ করবে কেন। এটা খুব অদ্ভূত ব্যাপার। এই সময়ের নামাযটা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ না কি সুন্নাতে যায়িদাহ– এই নিয়ে আগের যামানার আলিমদের কিছু ইখতিলাফ আছে। কিন্তু নামায যে পড়া লাগবে, এটা নিয়ে তো ইখতিলাফ নেই। আমরা এই ইখতিলাফের মাধ্যমে মানুষ যাতে নামায না পড়ে সেই ব্যবস্থা করছি।

রাসূল (ﷺ) জুমুআর দিনে জুমুআর আগে নামায আদায় করতেন। কয় রাকআত, এটা খুব একটা বেশি স্পষ্ট না। সহীহ রিওয়ায়াত পাওয়া যায় না যে, তিনি কয় রাকআত নামায পড়তেন। কিন্তু নামায পড়তেন এবং দীর্ঘ পড়তেন– এটা হাদীসে এসেছে। সাহাবি নামায পড়তেন। চার রাকআত পড়তেন, বেশি পড়তেন, কম পড়তেন। কোনো কোনো সাহাবি থেকে চার রাকআত সহীহ সনদে প্রমাণিত। এর বেশিও তারা পড়েছেন। আর রাসূল (ﷺ) হাদীসে সাধারণভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, তোমরা জুমুআর দিনে মসজিদে গেলে ইমাম মিম্বারে না উঠা পর্যন্ত নামায পড়তে থাকবে।[২]

এক্ষেত্রে যে যত বেশি পারবে পড়বে। এখন পড়া লাগবে না বলে মানুষকে নামায পড়তে বিরত রাখার মাধ্যমে কোন সুন্নাত জিন্দা হয়, আমার জানা নেই। আমার মনে হয়, এই ধরনের বিতর্কগুলো যারা করেন, তারা হয় না জেনে হঠাৎ একটা নতুন কথা শিখে, উনি বিরাট পণ্ডিত হয়ে গেছেন। পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য করেন অথবা মুসলিমদের ভেতরে এই ধরনের ছোটখাট বিতর্ক বাঁধিয়ে কোনো ফায়দা লোটার জন্য করেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

২. সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৫৭।

জিজ্ঞাসা: ১৪

সালাতের মধ্যে রাফউল ইয়াদাইন না করলে কি গুনাহ হবে?

জবাব:

রাফউল ইয়াদাইন করার ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। শুরুতে রাফউল ইয়াদাইন একবার করার পরে না করার ব্যাপারেও একটা সহীহ হাদীস রয়েছে। তবে সকল অবস্থায় সবাই একমত যে রাফউল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব। প্রথম রাফউল ইয়াদাইন এবং পরবর্তী রাফউল ইয়াদাইনগুলো মুস্তাহাব। ইমাম মুসলিম বাব এনেছেন, 'বাবু ইসতিহবাবি রাফউল ইয়াদাইনি...' রুকু করার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন করা যে মুস্তাহাব এই বিষয়ক হাদীসসমূহ। এজন্য ফুকাহারা রাফউল ইয়াদাইনকে মুস্তাহাব বলেছেন। আর মুস্তাহাব ত্যাগ করলে গুনাহ হবে, এটা ঠিক না।

আরেকটা বিষয় আছে, আমরা যখন হাদীস নির্ভর হব... রাসূল (ﷺ) রাফউল ইয়াদাইন করেছেন, কিন্তু করতে আদেশ দিয়েছেন অথবা না করলে আপত্তি করেছেন, এরকম পাওয়া যায় না। অর্থাৎ করা সুন্নাহসম্মত। কিন্তু না করলে গুনাহ হবে বলার জন্য যে পরিমাণ হাদীস দরকার, যে পরিমাণ দলীল দরকার, সে রকম পাচ্ছি না। ïরুর রাফউল ইয়াদাইনটাও মুস্তাহাব। এটা না করলে গুনাহ হবে, না করলে আপত্তি করেছেন, এরকম তো দেখা যায় না।

জিজ্ঞাসা: ১৫

আমরা বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে দেখতে পাই যে, নবী করীম (ﷺ) কখনো আমীন জোরে বলেছেন আবার কখনো আস্তে বলেছেন। দুটাই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আবার কখনো হাত বুকের উপরে বেঁধেছেন, কখনো নিচে বেঁধেছেন। এদুটো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এক্ষেত্রে আমাদের সমাজে দেখা যায়, দুইটাই প্রচলিত আছে। যেখানে আমীনের প্রচলনটা নেই নতুন করে আমীন বলতে গিয়ে ইমাম সাহেবরা অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন। যেটা আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে। এই যে এই ক্ষেত্রে আমীন জোরে/

আস্তে, হাত বুকের উপরে/ নিচে দুই ধরনের বিধান। যদি নবী করীম (ﷺ) যদি একটি করতেন, যদি বুকের উপরে বাঁধতেন এবং সেটা সকল সাহাবি থেকে একই সনদে হাদীস থেকে প্রমাণিত হত, তাহলে সমাজে এত মতানৈক্য বা ইখতিলাফ হত না। আমীন শুধু জোরেই বলতেন বা শুধু আস্তেই বলতেন। তাহলে সবাই আস্তেই বলত। এই যে জোরে/আস্তে, উপরে/নিচে মিলে একটা ফেতনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ক্ষেত্রে যে নবী করীম (ﷺ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নটা করেছেন, এর হেকমত কী এটা জানাবেন।

জবাবঃ

প্রথমত জোরে আমীন এবং আস্তে আমীন, দুই ব্যাপারেই রিওয়ায়াত আছে। আর বুকের উপরে বা নাভির নিচে এদুটোর ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই। হাত বাঁধতেন এটা আছে। উপরে-নিচে যেখানেই বাঁধা হোক সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তবে রাসূল (ﷺ) এর অনেক বিষয়ে একাধিক মত আছে। এখন আমার প্রশ্ন হল, এই কর্মগুলো ফরয বিষয়ে কি না? যুহরের নামায কয় রাকআত? এই নিয়ে মতভেদ আছে? আসরের? মাগরিবের নামায? ফজরের নামায? কোনো নামায নিয়ে আছে? বিতরের নামায? সিজদা কয়টা হবে? রুকু কয়টা হবে? নামাযের ফরযগুলো নিয়ে ইখতিলাফ আছে? নেই। কোনগুলো নিয়ে আছে? নফল-মুস্তাহাব নিয়ে। কারণ ইবাদতগুলো যদি তুমি শতভাগ একভাবে কর, তাহলে এটা অটো হয়ে যায়। তোমরা যখন কম্পিউটারে বোতাম টেপ। টিপলে বুট হয়। দেখবে কয়েক মিনিট পরে উইন্ডোজ দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে কী হল, তুমি কিছুই বুঝতে পারলে না।

আমাদের নামাযে এ রকম অটো হয়। 'আল্লাহু আকবার' বলার পরে 'আস সালামু আলায়কুম' এর মাঝখানে কী হল, আমরা ভুলে যাই। কিন্তু যখন নামায অল্টারনেট (অদলবদল) করবে তখন দেখবে নামাযে মনোযোগ থাকে। তেমনি প্রতি নামাযের সময় এক রকম সূরা পড়তেন না। বিভিন্ন রকম পড়তেন। ঠিক তেমনি কিছুকিছু ফেয়েলে [কর্মে] একাধিক রিওয়ায়াত সহীহ। যেমন রাফউল ইয়াদাইন একবার করা, একাধিকবার করা। এতে মনে হয় যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এগুলো অল্টারনেট করতেন। যে সাহাবি

যেটা দেখেছেন সেটাই করেছেন। আর এই ধরনের বিষয়গুলোতে ব্যতিক্রম থাকাটা ইসলামের প্রশস্ততা বোঝায়, উদারতা বোঝায়। ইবাদতগুলোর ভেতরে একেবারে রিজিডনেস (একঘেঁয়েমি) আনে না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুআ, বিভিন্ন যিকির, বিভিন্ন আয়াত, বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইবাদতের সচেতনতা বাড়ে। আর যে সাহাবি যেটা দেখেছেন সেটা বলেছেন। আর এটা ছিল ইসলামের উদারতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এটাকে সংকীর্ণতায় পরিণত করেছি।

এখনো হজ্জে গেলে..., সারা বিশ্বের মানুষ আসে। কেউ রাফউল ইয়াদাইন করছে, কেউ করছে না। কেউ হাত বেঁধেছে, কেউ ঝুলিয়ে রেখেছে। রাসূল (ﷺ) এর প্রতিটি ছোট বড়কর্ম কেউ-না-কেউ পালন করছে। এটা দেখে কিন্তু আমাদের খুশি হওয়ার দরকার ছিল। হাজিরা কী করে? ওই দেখো নামায হচ্ছে না। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দেখায়। নানাভাবে এগুলো নিয়ে ক্রিটিসাইজ (সমালোচনা) করে। অর্থাৎ আমাদের বড়ত্বটাকে আমরা ছোট করে ফেলেছি। এজন্য রবীন্দ্রনাথের গান অধিকাংশ একই সুরে। কিন্তু নজরুলের গান একেকটা বিভিন্ন সুরে। বৈচিত্র অনেক বেশি। মজা অনেক বেশি। দুর্ভাগ্যজনক হল, এই মজাটাকে যদি তুমি সমালোচনায় নিয়ে যাও, তাহলে তো মুশকিল।

জিজ্ঞাসা: ১৬

সকল নামাযের আগে এবং পরে যে সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযগুলো রয়েছে, এগুলো যদি কেউ নিয়মিত না পড়ে তাহলে গুনাহগার হবে কি না?

জবাব:

সুন্নাতে মুআক্কাদা বলতে আমরা যেগুলো বলি– ফজরের আগের সুন্নাত মূলত ওয়াজিব। রাসূল (ﷺ) কখনো এটা ছাড়তেন না। এটা নিয়মিত বা অনিয়মিত ছাড়াটা গুনাহের কাজ। বাকি সুন্নাতগুলো– যুহরের আগে-পরে, মাগরিবের পরে, ইশার পরে, পড়লে সাওয়াব হবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন। না পড়লে কোনো নিষেধাজ্ঞা বা আপত্তি তেমন পাওয়া যায় না। এটা যদি কেউ মাঝেসাজে প্রয়োজনে ছেড়ে দেয়, এটা কোনো গুনাহ হবে না। অনুচিত হবে। আর যদি এটা ছেড়ে দেওয়া অভ্যাসে পরিণত

করে, এটা কিছুটা হলেও গুনাহের কাজ হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেটা নিয়মিত করেছেন, সেটা নিয়মিত না-করা সুন্নাতের একটা বড় অবজ্ঞা। তিনি যুহরের আগে চার রাকআত সুন্নাত পড়তে না পারায় পরে সেটা আবার ঘরে গিয়ে পড়েছেন। এটা দ্বারা বোঝা যায়, তিনি এটাকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।

জিজ্ঞাসা: ১৭

আমাদের বন্ধুদের অনেকেই নামায পড়ে না। তাদের কি গাফিলতি আছে? আমারো মাঝেমধ্যে নামায কাযা হয়ে যায়। পরামর্শ চাই।

জবাব:

নামায যে কত মজার জিনিস এটা আমরা বুঝি না। আমরা মনে করি, নামায একটা বোঝা। অনেকেই রোযা রাখে কিন্তু নামায পড়ে না। যুবকদের জন্য সারাদিন না খেয়ে থাকাটা কষ্টের কিছু না। কিন্তু নামায পড়তে হলে, ওযু করা, জামাকাপড় পরা, একটু বোঝা মনে হয়। তোমাকে প্রথমত বুঝতে হবে, নামায কত মজাদার। যখন এটা বুঝবে, তখন নামায না পড়ে থাকতে পারবে না। যেমন আমাদের জীবনে সবচে কঠিন কাজ হল খাওয়া। আমরা মাত্র দশ মিনিটে গালের ভেতর খাবার নেড়ে মজা পাই। কিন্তু খাবার আগে টাকা উপার্জন অনেক কষ্ট। বাজার করা অনেক কষ্ট। রান্না করা অনেক কষ্ট। খাবার পরে গ্যাস, এসিডিটি.. অনেক কষ্ট। বাথরুমে যাওয়া, অনেক কষ্ট। এখন, খাওয়ার আগে পরে অনেক কষ্ট, তাই বলে কি খাবার খাওয়া বাদ দেব? এ রকম কেউ নিয়ত করবে? দশ মিনিটের মজা! তোমার এত ভালো লেগেছে, যে তুমি এটা ছাড়তে পারছ না। নামায কিন্তু পুরোটাই মজা। আল্লাহর সাথে কথা বলা, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো, আল্লাহর কাছে দুআ করা। এই মজাটা তোমাকে বুঝতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমরা মনে করি, নামায আল্লাহর কাজ। নামায আল্লাহর কাজ না। আমার কাজ। নামায পড়লে আমার উপকার হয়, আমার মন শক্ত হয়, আমার আচরণ ভালো হয়। আমি দুনিয়াতে সফল হব, আখিরাতে সফল হব। তৃতীয় হল, নামাযকে আমরা কঠিন মনে করি। সূরা কিরাআত

শিখা..., অনেক কষ্ট! মূলত নামায সবচেয়ে সহজ ইবাদত। কারণ তুমি সূরা জানলে ভালো, না জানলে সূরা বাদ দিয়ে পড়বে। যেটুকু জানো সেটুকু পড়বে, পাশাপাশি শিখতে থাকবে। এই নামায সহজ, আমার উপকারী এবং আমার জন্য সবচেয়ে কল্যাণময় এবং এটা সবচেয়ে মজাদার... এ কথাটা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে।

তোমাদের বন্ধুদেরকে এটা ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করবে। অনেকেই বুঝতে চাইবে না। আমরা এই দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি শান্তি পাই মায়ের সাথে কথা বলে। অনেক দুষ্টু ছেলে আছে মায়ের কাছে যেতে চায় না। এই মজাটা সে আসলে বুঝতে পারে নি। বুঝলে তখন সে আর এটা ছাড়তে পারবে না। এজন্য তোমাদের দায়িত্ব হল, তোমাদের বন্ধুদেরকে নামাযের কথা বলা, ভাই! নামায সবচেয়ে সহজ সবচেয়ে উপকারী। তুমি কিছু না পার, অন্তত ফরয নামাযটা পড়ো। সূরা কিরাআত না জানলে, দাঁড়িয়ে যতটুকু পার, পড়ো। এতে তুমি তোমার নিজের জীবনে শান্তি পাবে। মনের অস্থিরতা চলে যাবে। অন্তরে শক্তি পাবে। আল্লাহ দুআ কবুল করবেন। এবং এর মাধ্যমে তুমি দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি তোমার ভালো করে, কল্যাণ করে, উপকার করে, তাকে একটু ধন্যবাদ দিতে এমনিতেই মন চায়। তার উপর একটা কৃতজ্ঞতার অনুভূতি এমনিতেই মনে আসে। এটা মানবীয় প্রকৃতি। তুমি বিপদে পড়েছ, কেউ তোমাকে হেল্প করেছে, তখন তোমার মনটা চাইবে ওকে একটু ধন্যবাদ দিই। আমাদের সবচে উপকার করেছেন আল্লাহ তাআলা। কাজেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের সবচে আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত। তোমরা যারা নামায মাঝেমধ্যে কাযা করে ফেল, এটা অবশ্যই অবহেলা। অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কাযা হয়, অর্থাৎ তুমি সময়মতো ঘুমিয়েছ, নিয়ত আছে ঘুম থেকে উঠে নামায পড়ার, ঘুম ভাঙে নি। এটাতে সাওয়াব নষ্ট হলেও, বরকত নষ্ট হলেও, গুনাহ হবে না। আর ইচ্ছা করে নামায কাযা করা খুবই গুনাহের কাজ। এই গুনাহের অনুভূতি যত জোরালো হবে, তুমি নামায কাযা করতে পারবে না।

আমাদের অনেকেই কিন্তু ধূমপান করে। প্যাকেটে লেখা আছে, ধূমপানে

বিষপান। ধূমপানে মৃত্যু আনে। অথচ ওরা ওই প্যাকেটই খুলে ধূমপান করে। তার মানে, ওই কথাটা সে বিশ্বাস করে নি। ধূমপানে মৃত্যু আনে– কথাটা যখন বিশ্বাসে এসে যাবে, তখন কিন্তু সে আর ধূমপান করতে পারবে না। যার বিশ্বাস আছে আগুনে হাত পোড়ে, সে তো আর আগুনে হাত দিতে পারে না। আল্লাহর কাছে হাযিরা না দিলে যে আমি কী ক্ষতিগ্রস্ত হব, এটা যখন মনে গভীর হবে, দেখবে, ঘুমিয়ে থাকতে পারবে না। ঘুম এমনিই ভেঙে যাবে। যেমন, ঢাকা যাবার প্ল্যান আছে, গাড়ি ভোর চারটায়। ঘুম এমনিই ভেঙে যায়। কিন্তু নামায কাযা হলে ক্ষতি হবে, মুখেমুখে স্বীকার করি, কিন্তু ঘুম ভাঙে না। মানে, ওটা ঈমানে যায় নি এখনো।

জিজ্ঞাসা: ১৮

ঘুমের কারণে সালাত ছুটে গেলে কি ওই সালাত কাযা হিসাবে নিয়ত করতে হবে?

জবাব:

আমরা সালাত কাযা-আদায়– এই রকম বিভিন্ন কথা সমাজে শুনি। ইসলামে ঠিক এ রকম কিছু কুরআন-হাদীসে নেই। কথা হল, ঘুমের কারণে সালাত ছুটে যাওয়ার পরপরই যদি আমরা সঙ্গেসঙ্গে পড়ি, তবে রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا.

যদি কেউ সালাত ভুলে যায়, মনে নেই বেখেয়াল। হঠাৎ মনে পড়েছে...। অর্থাৎ ঘুমিয়ে গেছে। ইচ্ছা ছিল সময়মতো পড়ার, কিন্তু ঘুম ভাঙে নি। যখনই মনে পড়বে, ঘুম থেকে উঠে সঙ্গেসঙ্গে সালাত আদায় করবে। এটাই তার জন্য ওয়াক্ত।[৩] এটা আর কাযা হল না। তবে এটা অভ্যাসে পরিণত করলে গুনাহ হবে।

---

৩. ইবন হাজার, আত তালখীসুল হাবীর ১/৪৭৪।

জিজ্ঞাসা: ১৯

একই দিনে ঈদ হলে জুমুআর নামাজ পড়তে হবে না। এই বিষয়ে কোনো হাদীস আছে কি না?

জবাব:

জি, এই বিষয়ে হাদীস আছে এবং হাদীসটার অর্থ নিয়ে ফুকাহাদের ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। একাধিক হাদীস আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে একবার জুমুআর দিনে ঈদ হয়। তিনি সালাতুল ঈদের পরে বলেন:

إِنَّا مُجَمِّعُوْنَ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ.

যে চায় সে চলে যাক আর যে চায় সে আমাদের সাথে জুমুআ পড়তে পারে। তবে আমরা জুমা পড়ব। কিন্তু তোমরা যে চাও থেকে যাও, আর যে চাও চলে যেতে পার।[৪] এই হাদীসের আলোকে কোনো কোনো ফকীহ বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.র একটি বর্ণনা, জুমুআর দিনে যদি ঈদ হয়, ঈদ পড়লে আর জুমুআ লাগবে না। অপশনাল (ঐচ্ছিক) হয়ে যাবে।

কিন্তু অন্যান্য ফকীহরা বলেছেন, এই হাদীসের অর্থ হল, রাসূল (ﷺ) এর সময় বেদুইনরা, যাদের উপর জুমুআ ফরজ নয়, ঈদের আনন্দের জন্য মদীনায় চলে আসত, ঈদের দিন তারা ফজরের সময় চলে আসত, বেলা উঠার এক ঘণ্টার মধ্যে ঈদ হয়ে গেছে, এখন তারা কি জুমুআ পর্যন্ত থেকে যাবে, না চলে যাবে? তাদেরকে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা চলে যেতে পার, যেহেতু তোমাদের উপর জুমুআ ফরয না, ঈদ ফরয না। তোমরা আনন্দ করতে এসেছ তোমরা চলে যেতে পার। আমরা যারা মদীনাবাসী তারা জুমুআ পড়ব। এজন্য তারা বলেন, যারা গ্রামের, যাদের জুমুআ, ঈদ নেই, মরুভূমি থেকে এসেছে, ঈদের দিনে সেই জুমুআ পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করা ফরয নয়। তারা চলে যেতে পারে। কিন্তু শহরবাসীদের উপরে জুমুআ মূলত ফরয, তারা জুমুআ পড়বে না, এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না বলে তারা দাবি করেন এবং কিছু যুক্তি দেন।

---

৪. তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, হাদীস-১১৫৬।

জুমুআ তো কুরআন দ্বারা ফরয। এটা এ রকম একটা সম্ভাবনাময় দলীল দ্বারা বাতিল করা ঠিক হবে না। যাই হোক দুটো মত রয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যায় দুটো মত রয়েছে। অধিকাংশ আলিম জুমুআ পড়তে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

জিজ্ঞাসা: ২০

ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে ইমাম তাকবীর না দিয়েই রুকুতে চলে যান। মুসল্লিরা লুকমা দিলে তিনি তাকবীর দেন। এমতাবস্থায় সালাত শুদ্ধ হল কি না?

জবাব:

জি, নামায শুদ্ধ। ঈদের মাঠে সাহু সিজদা করা জটিল বলেও ফুকাহারা বলেছেন, সিজদা দেয়ার দরকার নেই। নামায হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা: ২১

আখিরি যুহর মানে কী?

জবাব:

আমার উপরে সর্বশেষ যে যুহরের নামায ফরয হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমার আদায় হয় নি। আল্লাহ আমি সেই যুহরের নামায পড়ার নিয়ত করলাম আল্লাহু আকবার। এটা হল আখিরি যুহরের অর্থ।

আমি যেই জুমুআটা পড়লাম। এই জুমুআ যদি না হয়, তাহলে তো যুহর আমার উপর ফরয থাকল। তাহলে যুহরটা পড়ে নিই। কেন? আমি জুমুআ পড়লাম তাহলে আবার না হওয়ার চিন্তা কেন? কারণ কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন জুমুআর নামায জায়িয হবার জন্য শর্ত হল, সেটা একটা শহর হতে হবে। আর শহর হবার শর্ত হল, সেখানে একজন ইসলামি বিচারক থাকবে। তিনি ইসলামি শরীআহ প্রতিষ্ঠা করবে। যেহেতু আমাদের দেশে ইসলামি শরীআহ প্রতিষ্ঠিত হয় না। সেহেতু আমাদের এখানে জুমুআর নামায জায়িয হবে না। কাজেই আমি যুহরটা পড়ে নিই, জুমুআটাও পড়ে নিই।

এটা হল থিওরি। এই থিওরিটা তোমার পছন্দ হল কি না? আমার তো পছন্দ হয় না। আমার যদি মনে হয় যে, জুমুআর নামায হবে না তাহলে যুহর পড়ব। যে কোনো একটা পড়ব। জুমুআ প্রতি সপ্তাহে আসছে, আমি একটা মাসআলা ফাইনাল করব– আমাদের দেশের জুমুআ বৈধ না অবৈধ? যদি অবৈধ হয় তাহলে পড়ব না, আর বৈধ হলে জুমুআ পড়ব। বরং যে ব্যাক্তি জুমুআ পড়ে তার যদি নিয়ত থাকে জুমুআ হল কি না– তাহলে তার জুমুআ হয় না। তার নিয়তই তো হয় নি। কাজেই এটা একদমই বাজে একটা মাসআলা। এটা আলিমরা একটা বিশেষ কারণে দিয়েছিলেন।

.কিছু মানুষ– পাক-ভারত উপমহাদেশে, অনেক দেশে ব্রিটিশরা আসার পরে, এটা দারুল হরব হয়ে গেছে, এখানে আর জুমুআ পড়া লাগবে না– জুমুআ বাদ দিয়ে দিয়েছিল। তাদেরকে বোঝানোর জন্য..., জুমুআটা পড়ো, এটা একটা বড় ইবাদত। সাথে যুহরটাও পড়ে নিই। কাজেই, এটা একটা তাৎক্ষণিক বা অস্থায়ী মাসআলা। আমার দেশের জুমুআ বৈধ আমি ১০০% নিশ্চিত। জুমুআ ফরয, না পড়লে গুনাহ হবে। আমাদের সন্দেহ নেই। আমাদের মুসলিম দেশে, যেমন ইয়াযীদের সময়ে, আকবরের দীনে ইলাহির সময়ে জুমুআ ফরয ছিল, আমাদের সকল মুসলিম দেশে জুমুআ ফরয। এমনকি অমুসলিম দেশে যেখানে মুসলিমদের ইবাদতের স্বাধীনতা আছে সেখানেও জুমুআ ফরয। কাজেই আমি আবার সন্দেহ করে যুহর পড়তে যাব কেন?

প্রত্যেক নামাযের শেষে সন্দেহজনক দুইটা করে সাহু সেজদা দেব। সিস্টেমটা কেমন হল? ভুলত্রুটি তো হতেই পারে! এটা কোনো সিস্টেম না। আল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা: ২২

মহিলাদের জন্য তারাবীহর নামায ঘরে পড়া উত্তম না কি মসজিদে গিয়ে পড়া উত্তম?

জবাব:

খুব মজার প্রশ্ন। আমরা অনেকেই তো একদিকে পর্দা লঙ্ঘন করছি।

আরেকদিকে পর্দার নামে অধিকাংশ মুসলিম সমাজে মেয়েদেরকে তারাবীহতে বা জামাআতে যেতে দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে প্রশ্নের প্রথম উত্তর হল যে, পুরুষদের এবং মেয়েদের সকলের জন্যই তারাবীহর জামাআতকে বৈধ করা হয়েছে কুরআন শোনার জন্য। দ্বিতীয় কথা হল, তারাবীহর জামাআত হয়েছে মূলত মেয়েদের জন্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তারাবীহর সালাত জামাআতে আদায় করতেন না। একাই করতেন। একবার রমাযানের ইতিকাফের সময় তাঁর চাটাই দিয়ে ঘেরা একটা ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে কিয়ামুল লাইলে দাঁড়ান। গভীর রাত্রে ১২টার দিকে বা ওইরকম সময়ে পেছনে সাড়া পেয়ে সাহাবিরা জামাআত করে নিলেন। নারী-পুরুষ সবাই এর ভেতরে ছিলেন। এরপরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আর জামাআত করেন নি। একবার তিনদিন জামাআত করেছিলেন। আমি একটু পরে বলব।

একজন সাহাবি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় মেয়েদের কারণে জামাআতে তারাবীহ পড়েন । উবাই ইবন কা'ব (রা.) এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে বলছেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে না বলে একটা কাজ করে ফেলেছি।" তো কী কাজ করেছ? "রাত্রে বাড়িতে গেলাম। আমার পরিজন স্ত্রী ছেলেমেয়েরা বলল, আপনি তো হাফিয, কারি। তৎকালীন পরিভাষায় কারি। আপনি তো হাফিয। আমরা তো হাফিয না। কুরআন তো আমরা বেশি পড়তে পারি না। আপনি ইমাম হয়ে আমাদেরকে মুক্তাদি বানিয়ে জামাআতে কিয়ামুল লাইল আদায় করেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তাদেরকে নিয়ে আট রাকআত কিয়ামুল লাইল আদায় করেছি।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপত্তি করলেন না। তাহলে আমরা দেখলাম তারাবীহর সালাতের জামাআত শুরু হয়েছে মেয়েদেরকে দিয়েই। আর এটাই তো বাস্তবতা। নফল সালাতে জামাআত নেই। তাহলে তারাবীহর সালাতে জামাআত কেন? তিলাওয়াত শোনার জন্য।

আমরা বলেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে তারাবীহর জামাআতের শুরুটা-ই অনেকটা মেয়েদের নিয়ে। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে তিনদিন সালাত জামাআতে আদায় করেছেন। কিয়ামুল লাইল, তারাবীহ। কিয়ামুল লাইল ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত যেকোনো সময় আমরা রাতে যে সালাত আদায় করি, এটা কিয়ামুল লাইল। যদি প্রথম রাতে আদায় করা

হয় তাহলে এটা শুধু কিয়ামুল লাইল। যদি ঘুমের পরে আদায় করা হয় তাহলে এটা তাহাজ্জুদ হয়। কিয়ামুল লাইল মুমিনের জীবনে গুরত্বপূর্ণ ইবাদত। সারা বছরই করতে হয়। রমাযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। রমাযানে যেহেতু বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, ঘুমিয়ে যাওয়ার ভয়ে সাহাবিরা অনেকে আগের রাত্রেই পড়ে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সবসময় শেষ রাতেই পড়তেন মূলত।

একবার তিনি প্রথম রাত থেকেই শুরু করেন। তিনরাত। আবু যার গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত, ইমাম তিরমিযি ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সঙ্কলন করেছেন। সহীহ সনদে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তেইশ রমাযানের রাত্রিতে কিয়ামুল লাইল করলেন। প্রায় রাতের তিন ভাগের একভাগ। ১১টা পর্যন্ত প্রায় বা বিভিন্ন দেশে যেমন হয়। অর্থাৎ প্রায় দুইঘণ্টা কিয়াম করলেন। ২৪ এর রাত্রে তিনি জামাআতে কোনো কিয়াম করলেন না। সবাই একা একা করলেন। ২৫ এর রাত্রিতে তিনি মধ্যরাত পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ৪ ঘণ্টা কিয়াম করলেন। ২৬ এর রাত্রে মোটেই কিয়াম করলেন না। ২৭ এর রাত্রে সাহরি পর্যন্ত কিয়াম করলেন। প্রায় ৬-৭ ঘণ্টা। এই তিনরাত্রে হাদীসের বিভিন্ন শব্দে এসেছে, তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদেরকে জামাআতে শরিক হতে বলেছেন।[৫]

তৃতীয় যে ব্যাপারটাতে আসি। জামাআতে যে তারাবীহ পড়ার ব্যাপক প্রচলন হল উমার (রা.) এর যুগে। উমার (রা.) বললেন:

إِنَّ النَّاسَ يَصُوْمُوْنَ النَّهَار وَلَا يُحْسِنُوْنَ أَنْ يَقْرَؤُا فَلَوْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ.

মানুষেরা রোযা রাখে দিনের বেলায়। যেটা সবাই পারে। কিন্ত সবাই তো আর হাফিয না। সেজন্য সবাই সুন্দর করে, বেশি করে কুরআন পড়তে পারে না। কাজেই আমি তাদেরকে একজন হাফিযের পেছনে সমাবেত করে দেব যেন কুরআনটা তারা শুনতে পারে। পুরো পড়তে পারে। একাধিক বার পড়তে পারে। তখন তিনি মুসলিমদের সবাইকে একটা জামাআত করে দিলেন।[৬] উনি সেই জামাআতে থাকতেন না।

৫. সুনান তিরমিযি, হাদীস-৮০৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৩৭৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৩২৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬০৫।

৬. মাকদিসি, আল আহাদীসুল মুখতারাহ, হাদীস-১১৬১।

ইশার সালাত পড়িয়ে চলে যেতেন। উবাই ইবন কা'ব (রা.) জামাআত পড়াতেন। এবং মেয়েদের জন্য পৃথক জামাআত করেছেন বলে সহীহ বর্ণনায় এসেছে। তামীম আদ-দারি (রা.) বা অন্য একজন সাহাবি মেয়েদের নিয়ে পৃথক জামাআত করতেন। কারণ কুরআন না পারার দূর্বলতা সব পুরুষের মতো নারীদেরও রয়েছে। বরং তাদের ভেতরে হাফিয, কারি কম। আর রমাযানে কুরআন শোনা তাদেরও একটা ইবাদত। তাহলে সাহাবিদের যুগে উমার (রা.) মেয়েদেরকে পৃথক বড় জামাআত করে দিলেন। পুরষদের মতোই। পরবর্তী যুগে, সম্ভবত উসমান (রা.) এর যুগে, মেয়েদের জন্য পুরুষদের জামাআতের সাথেই পৃথক জামাআতের ব্যবস্থা করা হয়। মেয়েদের মসজিদে যাওয়া নিয়ে যতটুকুই বিতর্ক থাক না কেন তারাবীহর জামাআতে যে মেয়েরা যাবে, এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত। কারণ তারাবীহর উদ্দেশ্য তো কুরআন শোনা। আর এই উদ্দেশ্যে মেয়েদের অধিকার তো পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম না। এজন্য মেয়েদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা দরকার। এটা তাদের একটা মুস্তাহাব আমল।

তারাবীহর যদি সুযোগ থাকে, ইমামের পেছনে খতম তারাবীহ আদায় করা। স্বভাবতই যে ইমাম সুন্দর করে কুরআন পড়েন, পড়া বোঝা যায় না, এই রকম নয়। ভালো করে, সুন্দর করে পড়েন এই রকম ইমামের পেছনে জামাআতে যদি পড়ার ব্যবস্থা থাকে পর্দাসহ। তারাবীহর নামায পড়তে গিয়ে পর্দা নষ্ট করলে তো মুস্তাহাব করতে গিয়ে হারাম হয়ে যাবে। এরকম না। অনেকে আবার পর্দার অজুহাত দিয়ে এটাকে বন্ধ করে দিই, যে, মেয়েরা পর্দা করে না অথবা পর্দার সমস্যা হতে পারে, মসজিদে যেতে পারবে না।

এক্ষেত্রে একটা মজার কথা মনে পড়ল। আমাদের দেশের উলামায়ে কিরাম ওয়ায মাহফিলে এখন মেয়েদেরকে অনুমতি দেন। তবে মসজিদে অনুমতি দেন না। আমি ওয়ায মাহফিলে গিয়ে দেখেছি। ফিতনাটা ওয়ায মাহফিলে বেশি হয়। মসজিদে হয় না। আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে ওয়ায মাহফিলের আগে একটা মেলা থাকে। দোকানপাট থাকে। এটাও একটা বড় মাহফিল। ওয়ায মাহফিলে শুনতে আসা মেয়েরা সেখানে বন্ধুদের নিয়ে গল্প করে। আমরা দেখেছি তারা মোবাইলে কথা বলে, দোকানে

কেনাকাটা করে। ওয়ায মাহফিল শুনতে গিয়ে যে পরিমাণ ফিতনা হয়, অর্থাৎ অশালীনতা হয়, মসজিদে সালাত আদায় করতে গিয়ে এর ১০০ ভাগের একভাগও হয় না। অথচ আমরা ফিতনার অজুহাতে মসজিদে যাওয়া বন্ধ করছি। কিন্তু ওয়ায মাহফিলে আমরা যেতে দিচ্ছি।

ফিতনা আপত্তিকর। ফিতনা বন্ধ করতে হবে। যেমন আঙুরের রস থেকে মদ হয়। আঙুরের চাষ, আঙুরের জুস বানানো বন্ধ করা যাবে না। মদ হওয়াটা পর্যন্ত বন্ধ করতে হবে। এজন্য পর্দা এবং দীনি প্রেরণা আসবে তো এই ধরণের সালাত আদায় করলে। পর্দাসহই এটা করতে হবে। আমাদের মেয়েরা মসজিদে গেলে কিছু দীনও শিখতে পারবে, জানতে পারবে।

একটা মজার কথা মনে পড়ল...। পর্দার অজুহাতের কারণে...। ইসলাম তো মেয়েদের ছেলেদের সবাইকে অধিকার দিয়েছে পর্দাসহ সমাজের সকল কাজে অংশগ্রহণ করতে। বিচ্ছিন্ন করে নি। হজ্জ তার একটি বড় জিনিস। আমরা ইচ্ছা করেও এখন পর্যন্ত মেয়েদের হজ্জ বন্ধ করতে পারি নি। উমাইয়া যুগে, ইমাম বুখারি বর্ণনা এনেছেন। উমাইয়া যুগে একজন আমীর বলছেন, আতা ইবন আবি রাবাহ নামক একজন প্রসিদ্ধ তাবিয়িকে, যে, মেয়েরা এই যে ছেলেদের সাথে পাড়াপাড়ি করে তাওয়াফ করে। আমরা মেয়েদের তাওয়াফটা বন্ধ করে দিই? সম্ভবত তিনি নফল তাওয়াফ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। হজ্জ বন্ধ করার মতো সাহস হয়ত ছিল না। তখন আতা ইবন আবি রাবাহ (রাহ.) বললেন, আপনি কীভাবে তাওয়াফ বন্ধ করবেন? আমি তো উম্মুল মুমিনীনদের তাওয়াফ করতে দেখেছি। তখন, আমাদের যে সাধারণ চেতনা, এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলেই আমরা বলি, ঘটনাটি কি পর্দায় আয়াত নাযিল হওয়ার আগে না পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরে? ওইভাবে ওই আমীর প্রশ্ন করছেন, আপনি উম্মুল মুমিনীনদের তাওয়াফ করতে দেখেছেন পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে না পরে? তখন আতা ইবন আবি রাবাহ বললেন, আমার জন্মই তো হয়েছে পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরে। আমি তো তাবিয়ি, আমি তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পরে জন্মগ্রহণ করেছি। তাহলে আপনি কীভাবে দেখলেন? আমি দেখেছি আয়িশা (রা.) মেয়েদের সাথে তাওয়াফ করছেন পুরুষদের থেকে সরে। পাড়াপাড়ি করে নয়। কিন্তু পুরুষদের

সাথেই। পুরুষদের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে। একটা মেয়ে বলল, হে উম্মুল মুমিনীন, চলেন আমরা হাজারে আসওয়াদে চুমু খাই। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও, আমি যাব না। ওই মেয়েটা পুরুষদের ভেতর দিয়ে চলে গেল। উনি দূর থেকে তাওয়াফ করতে লাগলেন।

তাহলে পর্দার ওজুহাতে মেয়েদেরকে বিচ্ছিন্ন করার একটা চিন্তা, এটা ভালো বা খারাপ চিন্তা, প্রাচীন যুগ থেকেই ছিল। কিন্তু ইসলাম এমন কিছু ব্যবস্থা দিয়েছে আমরা বন্ধ করতে পারছি না। এই যে হারামাইন শরীফে, মক্কা শরীফে, মদীনা শরীফে বিগত দেড়হাজার বছর হজ্জ হচ্ছে। মহিলারা প্রতি বছরেই হজ্জ করছেন। তারা সালাত কোথায় আদায় করছেন? ওই মসজিদাইনেই (দুই মসজিদে) করছেন। ইতিকাফ কোথায় করছেন? ওই মসজিদাইনেই করছেন। আমরা তো বলতে পারি না, এর কারণে পর্দা নষ্ট হয়। ইসলাম এমন একটা ব্যবস্থা দিয়েছে যে, পর্দা নষ্ট হওয়ার উপায় নেই। পর্দাসহই এইগুলো করতে হবে।

জিজ্ঞাসা: ২৩

সফর অবস্থায় কি অবশ্যই সালাত কসর করতে হবে?

জবাব:

জি, সফর অবস্থায় সালাত কসর করতে হবে, এটাই রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত। রাসূল কখনো সালাত কসর না করে পূর্ণ পড়েন নি। কখনো না। তিনি সাহাবিদের সাথে ছিলেন, তিনি নিজেই ইমাম ছিলেন। ইচ্ছা করলে সব পড়তে পারতেন। সফরে কখনোই, শান্তি-নিরাপত্তা, একেবারে কর্মহীনতা, কোনো সময়ই তিনি সালাত পূর্ণ পড়েন নি। এজন্য সাহাবায়ে কিরাম সালাত পূর্ণ পড়াকে আপত্তি করতেন। আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) বলেছেন:

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ كَفَرَ.

সফরের সালাত কসর করাটাই সুন্নাত। যে নবীর সুন্নাত ছেড়ে দিল সে কাফির হয়ে গেল।[৭] এটা অনেক কড়াকড়িভাবে বলেছেন। মূলকথা হল,

৭. তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৭৮৪৬; মুত্তাকি হিন্দি, কানযুল উম্মাল ৭/৫৪৬।

মূলত সফরে কসর করাটাই সুন্নাত। কেউ যদি ইমামের পেছনে নামায পড়েন অবশ্যই পূর্ণ করবেন। বাকি মুসাফির জামাআত করলে কসর করবেন। ফুকাহারা পূর্ণ করা জায়িয বলেছেন। তবে উত্তম নয়।

জিজ্ঞাসা: ২৪

অনেক পাইলট বা নাবিক যারা সবসময় বিমান চালান বা নাবিকেরা সমুদ্রে থাকেন। তারা তো সবসময় চলন্ত অবস্থায় থাকেন। এদের সালাতের অবস্থাটা কেমন হবে? মুকীম না মুসাফির?

জবাব:

এরা মুসাফির। যতক্ষণ না কোথাও তারা নির্ধারিত সময় অবস্থানের নিয়ত করছেন, কোনো শহরে বা যে যেকোনো দেশে গিয়ে। যখন তারা অবস্থানের নিয়ত করেন, এক্ষেত্রে ফুকাহাদের মতভেদ আছে। হাম্বলি ফুকাহারা বলেছেন, চারদিন বা মিনিমাম চারদিনের বেশি ইকামতের নিয়ত করলেই মুকীম হবেন। অন্যান্য অনেক ফকীহ, আবু হানীফা (রাহ.) এবং অন্যান্য ফকীহ বলেছেন, ন্যূনতম পনেরো দিন। পনেরো দিন বা চারদিন, যে মতই তিনি গ্রহণ করেন এবং কোথাও অবস্থানের নিয়ত করেন, যে কোনো শহরে, তাহলে তিনি মুকীম হবেন। আর এর বাইরে চলন্ত অবস্থায়, প্লেনে-বিমানে বা জাহাজে, যখন উনি চলন্ত থাকবেন, মুসাফির থাকবেন। তখন সালাত-সিয়াম মুসাফিরের হুকুমে করবেন।

যাকাত/সাদাকা/সিয়াম

ঈদ/কুরবানি

জিজ্ঞাসা: ২৫

ব্যবসায়ী পণ্যের ওপরে যাকাত কীভাবে দিতে হয়? কারো একটা দোকান আছে দোকানে অনেক মালামাল আছে। তিনি যাকাত কীভাবে দেবেন?

জবাব:

পাঠক, আপনি পণ্যগুলো হিসাব করবেন। অর্থাৎ যে বছরের যাকাত দেবেন ওই বছরে বাজারে পণ্যের বিক্রয়মূল্য কত। এই সকল পণ্যের বিক্রয় মূল্যের যে টাকা হয় তার আড়াই পার্সেন্ট তিনি যাকাত দেবেন। তবে যদি এমন হয়, তার কিছু ঋণ আছে আবার পাওনাও আছে, তাহলে তার পাওনাগুলো তিনি এই পণ্যের সাথে যোগ করবেন। দশলাখ টাকার পণ্য আছে। তিনলাখ টাকা তার পাওনা বিভিন্ন ক্রেতার কাছে। আর তার মহাজনদের কাছে হয়ত পাঁচলাখ টাকা বাকি আছে। এই বাকিটা বাদ যাবে ১০+৩=১৩ থেকে ৫ বাদ দিলে যা থাকে ওইটার তিনি ২.৫% যাকাত দেবেন।

[কোনো ব্যক্তির কাছে যদি হঠাৎ করে একলাখ টাকা চলে আসে। যেটা একবছর তার কাছে থাকল। ওই টাকাটা যাকাত দিতে হয় কিনা? -উপস্থাপক]

এক্ষেত্রে ফুকাহাদের দুটো মত আছে। একটা মত হল, প্রত্যেক টাকারই একবছর পুরো মেয়াদি হতে হবে। এটা একটা মত। এই মতে যাকাত

দেওয়া বড় কঠিন! আপনার প্রতিটি টাকা একবছর কবে পূর্ণ হল?... সারা বছরই আপনাকে যাকাত দিতে হবে। দ্বিতীয় যে মত, যেটা আরো সহজ এবং অধিকাংশ ফকীহের মত, সেটা হল, যে ব্যক্তি একবার যাকাত দিয়েছেন, সাহিবে নিসাব হয়ে গিয়েছেন, তিনি পরের বছর যাকাতের সময় যত টাকা আছে– কোনো টাকা ছয়মাস, কোনো টাকা দুইমাস, কোনো টাকা একমাস, কোনো টাকা একবছর– পুরো টাকাটারই যাকাত উনি একবারে দেবেন। আবার পরের বছর দেবেন। তাহলে প্রতি মাসে যাকাত দেওয়ার ঝামেলা তার থাকল না। যেমন, দশলাখ টাকা উনার কাছে আছে। চারলাখ টাকার বয়স একবছর, দুইলাখ টাকা মাত্র একমাস আগে এসেছে– দশলাখের যাকাত একবারে দিয়ে দেবেন।

জিজ্ঞাসা: ২৬

নন মুসলিমদেরকে আমরা কীভাবে দান দিতে পারি? অর্থাৎ নন মুসলিমদেরকে দেওয়ার জন্য শরীআতের কোনো মাসারিফ আছে কিনা যে, এই পরিমাণ দেওয়া যায়। নাকি আমার আত্মীয়-স্বজন সবাইকে দিয়ে দেওয়া যায়? নাকি অভাবী হলে তাকে দেওয়া যায়? এরকম নির্দিষ্ট করে কিছু বলা আছে কি না?

জবাব:

নন মুসলিমদের ব্যাপারে ইসলাম বলেছে, তাদেরকে তোমরা সামাজিক সাহায্য করবে। প্রতিবেশী হিসেবে এবং সহকর্মী হিসেবে। মানুষ হিসাবে সকল সাহায্য তাদেরকে করা হবে। এটার জন্য ধর্ম কোনো ব্যারিয়ার (বাঁধা) নয়। কিন্তু ইসলামের যে ফরয ইবাদতগুলো– যাকাত, ফিতরা। এগুলো শুধু মুসলিমরা পাবেন। আর বাকি যত সামাজিক দান, নফল দান, পরোপকার, প্রতিবেশীর দায়িত্ব, রোগী দেখতে যাওয়া... (বৈধ)।

কোনো ব্যাপারে অমুসলিমগণ, যারা আমাদের আশেপাশে আছেন, যারা ইসলামের সাথে শত্রুভাবাপন্ন, ক্ষতির জন্য চেষ্টা করছে, আল্লাহ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছেন।

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ.

যারা ইসলামের ধ্বংসের চেষ্টা করছেন না, ক্ষতির চেষ্টা করছেন না, সাধারণ অমুসলিম, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে, তাদের কল্যাণ করতে, তাদের উপকার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।[১]

এজন্য তারা যদি সমাজে থাকেন আমরা বিভিন্নভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে পারি। সামাজিক সাহায্য। প্রতিবেশী হিসেবে, সহকর্মী হিসেবে। উপকার করার জন্য। বিপদে পড়েছেন, দুর্ভিক্ষে পড়েছেন আমরা অবশ্যই তাকে সাহায্য করব।

[যাকাতের যে আটটা খাত আছে আটটা খাতের মধ্যে একটা বিষয় আছে, 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' এই ব্যাপারটা? -উপস্থাপক]

এটা হল, যারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান। ইসলাম গ্রহণ করতে চান। ইসলাম জানার ব্যাপারে আগ্রহ আছে তাদের সহযোগিতার জন্য যাকাত ব্যয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এটা যখন রাষ্ট্র যাকাত ব্যয় করে তখন। রাষ্ট্র ভালোভাবে বুঝতে পারে। আমরা তো এই বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারি না। যাকাত মূলত রাষ্ট্র নিয়ে ব্যয় করবে। এটা সমাজের দারিদ্র্য বিমোচনে সবচেয়ে ভালো সাহায্য করে। বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রে যাকাত নিচ্ছে না। এজন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি মনে হয়, কোনো ব্যক্তি ইসলামের দিকে এগিয়েছেন, তার সাহায্য দরকার। যাকাত দেওয়া যেতে পারে। না হলে এই ব্যাপারে সচেতনতা দরকার।

জিজ্ঞাসা: ২৭

রমাযান মাসে অনেক এলাকায় দেখা যায় সাহরির জন্যে ডাকার উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ একত্রিত হয়। কাসীদা (কবিতা) পড়ে ঘুম থেকে উঠানো হয়। শেষে, ঈদের আগেআগে ঠিক চাঁদরাতে ওই সমস্ত জায়গাতে গিয়ে, সেখান থেকে টাকা আনা হয়। দেখা যাচ্ছে ভালো কাজ আবার তারা টাকা নিচ্ছে। এটা কেমন দেখা গেল?

---

১. সূরা: [৬০] মুমতাহিনা, আয়াত: ৮।

জবাবঃ

প্রথম কথা হল, আগের যামানায় যখন আমাদের এই আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না তখন ডাকা হত। এটা ভালো কাজ। মানুষ ঘুমিয়ে পড়ত। এতে কারো ডিস্টার্ব হত না। বাড়ির কাছাকাছি ডাকাডাকি হত। ঘুম থেকে উঠত। বাকি সময় মানুষ ঘুমাত বা ইবাদত করত। আর এই সাউন্ডগুলো সবার কাছে যেত না। এখন বর্তমানে এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। এখন প্রায় সবার কাছে মোবাইল আছে। এলার্ম ঘড়ি আছে। বিভিন্নভাবে ডাকা যায়। বা মসজিদের মাইক আছে। দুই তিন মিনিট ডাকলে হয়ে গেল। কাজেই এ ধরনের ডাকাডাকি যুবকদের একটা আনন্দ-ফুর্তিতে পরিণত হয়েছে। আর এই জন্য টাকা নেওয়াটা মূলত বৈধ না। আর যুবকেরা এই ডাকাডাকির বিকল্প কিছু করলে ভালো হয়। যুবকদের ভেতরে কিছু করার ইচ্ছা জাগে। এর চেয়ে বরং কোনো ইফতার মাহফিল করা, কিছু ওয়াযের আয়োজন করা। এগুলো করলে ভালো হয়। গরীব মানুষদের জন্য সেবামূলক আয়োজন করা। যুবকেরা অনেক কিছু পারে। কিছু করতে হবে। সেই করাটা যদি ভালো হয়, তাহলে অবশ্যই ভালো।

জিজ্ঞাসা: ২৮

রমাযান মাসের জন্য একজন ইমামকে শুধু তারাবীহর নামাযের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে তাকে তারাবীহর নামাযের পরিবর্তে বা হাদিয়া হিসাবে কিছু টাকা পয়সা দেওয়া যাবে কি না?

জবাবঃ

জি, এটা আমাদের সমাজে, পূর্ব মুসলিম বিশ্বে এবং বিশেষ করে বাঙালি কমিউনিটিতে সকল দেশেই একটা জটিল প্রশ্ন। কারণ ইদানিং অনেক আলিম ফকীহ ফতোয়া দিয়েছেন তারাবীহর জামাআতের ইমামতির জন্য পয়সা দেওয়া বৈধ নয়। হারাম। চুক্তি করেও নয়। চুক্তি ছাড়াও নয়। তাদের এই ফতোয়ার যুক্তি আছে। দলীল আছে। একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কারণ কুরআন শোনানো কোনো মৌলিক ইবাদত নয়। আর কুরআন শুনিয়ে পয়সা নেওয়া, এটা কুরআনের অমর্যাদা করা হয়। এজন্য বিষয়টাতে আমাদের একটু পেছনে যেতে হবে।

প্রথম বিষয়, যে কর্ম মুমিনের উপর ফরয, এই কর্ম পালন করে মুমিন অন্য কারো থেকে বেতন নিতে পারেন না। কিন্তু যেটা আমার উপর ফরয নয়, আপনার কাজ, আমি আপনাকে সহযোগিতা করব। সেই কর্মের জন্য আমি বেতন নিতে পারব। যেমন, আপনি আমাকে যদি প্রশ্ন করেন যে, এই কথাটির উত্তর কি? আমি আপনাকে উত্তর বলে টাকা চাইতে পারব না। কিন্তু আপনি যদি বলেন আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার ছেলেকে এই মাসআলাটি শিখিয়ে দিয়ে আসতে হবে। তাহলে আমি বেতন চাইতে পারব। কারণ আপনার বাড়িতে গিয়ে শিখিয়ে দিয়ে আসাটা আমার দায়িত্ব নয়। আমার সামনে এসে প্রশ্ন করলে, এটা বলে দেওয়া আমার দায়িত্ব।

সালাত আদায় করা মুমিনের ফরয ইবাদত। সালাতে ইমামতি করা ফরয নয়। আবার ইমামতি যেখানে আমরা দশজন একত্রে আছি, একজনকে ইমাম বানিয়ে দিলাম। আমি ইমামতি করলাম। এটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু একটা নির্ধারিত মসজিদে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকব, জামাআত আদায় করব। এটা আমার কাজ নয়। এটা রাষ্ট্রের কাজ। সমাজের সকল মসজিদের জামাআত ঠিকমতো হওয়ার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্র-সমাজের দায়িত্ব।

আমি যখন সমাজের ওই কাজটা করে দিতে সাহায্য করব, আমি তার কাছ থেকে বেতন নিতে পারব। এজন্য ইমামতি করা বা রাষ্ট্রের যে কোনো দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে রাষ্ট্রের কাছ থেকে বেতন নেওয়া যাবে। রাষ্ট্র যখন বেতন দেয় না, ব্যবস্থা থাকে না তখন রাষ্ট্রের পরিবর্তে লোকাল মুসলিম কমিউনিটি এ বেতনটা দিতে পারবে।

এ ব্যাপারে মুসলিম উলামা মূলত একমত যে, ইমামতির বেতন নেওয়া যায়। কিন্তু তারাবীহর ইমামতির বেতন নেওয়া যাবে কি না? এজন্য, তারাবীহর ইমামতি ও অন্যান্য ওয়াক্তের ইমামতি মূলত বিধানে এক। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হলেও সালাতের জামাআতের ইমামতি কিন্তু ফরয নয়। জামাআতটা আমাদের দেশের অধিকাংশ আলিমের মতে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। সঠিক মতে এটা ওয়াজিব বা ফরযও বটে। কিন্তু সর্ববস্থায় এ জামাআত আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মতো ফরয নয়। আবার তারাবীহর জামাআতটাও ফরয নয়। ওয়াজিবও নয়। এটা সুন্নাত। এজন্য

যে ব্যক্তি তারাবীহর জামাআত করছেন, তিনিও একটা সুন্নাতের দায়িত্ব পালন করছেন। সুন্নাতের দায়িত্ব পালনে সমাজকে সাহায্য করছেন। যিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দায়িত্ব পালন করছেন তিনিও একটা সুন্নাত বা ওয়াজিব দায়িত্ব পালনে সমাজকে সাহায্য করছেন। এজন্য ইমাম হিসেবে তিনি বেতন নিতে পারবেন– এই মতটা যৌক্তিক। জোরালো।

আমরা আশা করি, যদি কোনো ইমাম তারাবীহর নামাযের জামাআতে ইমামতির বিনিময়ে পয়সা নেন, তাকে দেওয়া হয়, আশা করা যায় এটা বৈধ হতে পারে। তবে এটার আপত্তি একটা রয়ে যায়। এটা মূলত কুরআন শোনানো হয়ে যাচ্ছে। আর দুই নাম্বার, আমাদের উচিত প্রত্যেক মসজিদে নিয়মিত হাফিয ইমাম রাখা। যেন তিনি নিয়মিত ইমামতির পাশাপাশি তারাবীহর নামাযটা পড়াতে পারেন। তিনি তো নিয়মিতই ইমামতির বেতন পাচ্ছেন।

তারপরেও আমরা আশা করি, যেখানে হাফিয ইমাম নেই, তারাবীহর জন্য একজন হাফিয ইমাম নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারাবীহর নামাযের ইমামতির জন্য কিছু সম্মানী তাকে দেওয়া হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, বৈধ হবে।

জিজ্ঞাসা: ২৯

আরাফার দিবসের রোযার ফযীলতের কথা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। এই রোযাটি এই দেশে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে যেখানে থাকি, আমরা আসলে কোন দিনে পালন করব?

জবাব:

সাধারণভাবে আমরা ইবাদত করব প্রত্যেক দেশের সরকারের ঘোষিত চাঁদ দেখা অনুসারে। তবে ইয়াওমে আরাফা বলার কারণে– নয় তারিখ বলা হয় নি, ইয়াওমে আরাফা বলা হয়েছে– এজন্য অনেকে বলেন, যদি কোনো দেশের মানুষ জানতে পারে কবে আরাফা হচ্ছে। সেই দিনে তারা রোযা রাখতে পারে। আর আমাদের জন্য তো সহজ। আরাফাত যেদিন হয় সেদিন আমাদের দেশে সাধারণত আট তারিখ হয়। তার পরদিন

নয় হয়। এরপর দিন দশ হয়। কাজেই আমরা দুটো দিন রাখতে পারি। তবে সাধারণ নিয়ম হল, প্রত্যেক দেশের মানুষ সে দেশের সরকারের ঘোষিত চাঁদ দেখার তারিখ অনুসারে ইবাদত করবেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তিরমিযি শরীফের সহীহ হাদীসে বলেছেন:

اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ... عَرَفَةَ يَوْمَ يعرفُ الإِمَامُ.

যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান ঈদ করবেন সেই দিন ঈদ। যেদিন কুরবানি করবেন সেদিন কুরবানি। যেদিন আরাফাতে থাকবেন সেদিন আরাফাত।[২]

[হাজি সাহেবরা যারা ওখানে থাকেন তারা আরাফাতের দিন রোযা রাখবেন কিনা? -উপস্থাপক]

আরাফার দিনে হাজি সাহেবের জন্য রোযা না রাখাটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর চাচা আব্বাস (রা.)। তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফাযল বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফার দিনের রোযা আছেন কি নেই, এটাতো তাঁকে জিজ্ঞাসা করা কষ্ট। এইজন্য আমি একবাটি দুধ তাঁর কাছে পাঠালাম। তিনি তখন আরাফাতে উকূফ (অবস্থান) করছেন উটের পিঠে দাঁড়িয়ে। তিনি দুধটা নিয়ে সবার সামনে পান করলেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম তিনি রোযা ছিলেন না। যারা হাজি নন নয় তারিখে রোযা রাখা তাদের ক্ষেত্রে সুন্নাত। নফল সুন্নাত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, এই দিনে যদি কেউ রোযা রাখে আল্লাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুই বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।[৩] কিন্তু যিনি হজ্জে রয়েছেন তার জন্য আরো কঠিন ইবাদত রয়েছে। তার জন্য উকূফ করা, প্রচণ্ড গরমে, আল্লাহর যিকির, দুআ, ইবাদত করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফাতের দিন রোযা রাখেন নি। এজন্য হাজিদের জন্য না রাখাটা সুন্নাত।

জিজ্ঞাসা: ৩০

সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে ঈদ করা, সৌদি আরবের সাথে মিল

২. সুনান তিরমিযি, হাদীস-৮০২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৬৬০; ইবনুল মুলাক্কিন, আল বাদরুল মুনীর ৬/২৪৬।
৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১১৬২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৭৩০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৭৪৯।

রেখে রোযা রাখা– এটি পৃথিবীতে বর্তমানে আলোচিত বিষয়। আমরা কোনটা করব? নিজেদের দেশে চাঁদ দেখে করব না কি সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে ঈদ করব বা রোযা রাখব?

জবাব:

এটা বর্তমান বিশ্বে বেশ আলোচিত একটি ইস্যু। এটা শুনতেও ভালো শোনায়, সারাবিশ্বে একদিনে ঈদ। মুসলিম উম্মাহ্ একসাথে ঈদ করছে, কথাটা সুন্দর শোনায়। কিন্তু এই সুন্দর শোনার আবরণে প্রতিটি মুসলিম দেশে একাধিক দিনে ঈদ হয়ে যাচ্ছে, যেটা অনেক বেশি অসুন্দর। এক্ষেত্রে ইসলাম যে মূলনীতি দিয়েছে, অত্যন্ত সুন্দর, সহজ সাবলীল। আমরা একটা হাদীস আলোচনা করি:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ.

তোমরা চাঁদ দেখে (নব চাঁদ) দেখে রোযা রাখো, নব চাঁদ দেখে ঈদুল ফিতর করো।[৪]

এটা দ্বারা মনে করি, দুনিয়ার যেকোনো জায়গার নব চাঁদ দেখলেই আমরা হয়ত রোযা রাখব। অর্থাৎ সৌদি আরবের দেখলে রোযা রাখব। দেখা তো হয়েই গেল, কেউ না কেউ দেখল। এটা কিন্তু মূল কথা নয়। এর পাশাপাশি দুটো বিষয় রয়েছে। একটা হল ইসলামের যত সামাজিক ইবাদত রয়েছে, এগুলো, সামষ্টিক ইবাদতগুলো রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে। এটা ইসলাম বারবার বলেছে। যার যার মতো ইবাদত করে সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর অধিকার কারো নেই। এজন্য সিয়ামের চাঁদ বা ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার সঙ্গেসঙ্গে প্রশাসনকে জানাতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি, আঞ্চলিক গভর্নরকে জানাতে হবে। তিনি সাক্ষ্য নিয়ে যদি মনে করেন, এটা ঠিক। তিনি এটা ঘোষণা দেবেন। তখন চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। অপ্রমাণিত চাঁদ দেখা দিয়ে রোযা রাখা যায় না। যেমন একব্যক্তি নিজে চাঁদ দেখেছে ঈদুল ফিতরের বা রোযার। সাক্ষ্য দিয়েছে, গ্রহণ করা হয় নি। আর কেউ দেখে নি। তখন ওই ব্যক্তি নিজেও ঈদ করতে

৪. সহীহ বুখারি, হাদীস-১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৮১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৬৮৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২১১৭।

পারবে না। রোযা রাখতে পারবে না। উনি দেখেছেন তাই উনি করবেন– এটা হতে পারবে না। কাজেই, এটা এক্সেপ্টেড (গৃহিত) হয় নি। অন্য আরেকটা বিষয় এখানে আছে, যেটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

عَرَفَةُ يَوْمَ يُعَرِّفُ الْإِمَامُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي الْإِمَامُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ الْإِمَامُ.

যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান সিয়াম শুরু করবেন সেদিন সিয়াম। যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান, জনগণ ঈদুল ফিতর পালন করবেন সেদিন ঈদ। যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান বা জনগণ আরাফাতের মাঠে অবস্থান নেবেন সেদিন হজ্জ হবে; অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রধানের নেতৃত্বে।[৫] রাষ্ট্রীয় শৃংখলার বাইরে এটা পালন করা যাবে না। আর এই জন্য আয়িশা (রা.) এর কাছে মাসরুক নামে একজন তাবিয়ি এসেছেন। তিনি আয়িশা (রা.) এর কাছে ঢোকার পরে আয়িশা (রা.) জিজ্ঞাসা করেছেন রোযা আছে কি না? এটা ৯ জিলহজ্জ। জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে তিনি এসেছেন। যে দিনটা ছিল রোযা রাখার দিন। আমরা জানি, আরাফাতের দিনে রোযা রাখা সাওয়াবের। তিনি রোযা ছিলেন না। আয়িশা (রা.) বললেন, মাসরুককে ছাতু দাও। নাস্তা করুক। মাসরুক লজ্জা পেয়ে বললেন, আজকে তো আরাফাতের দিন। রোযা রাখা দরকার ছিল। কিন্তু উমাইয়া যুগে এই ফাসিক সরকার, যালিম তাগুতি সরকার, তারা কি চাঁদ দেখার ঘোষণা ঠিক দিয়েছে না ভুল দিয়েছে, আমি বুঝতে পারছি না। আজকে যদি ১০ হয় তাহলে রোযা হারাম। এই ভয়ে আমি রোযা রাখি নি। আয়িশা (রা.) রাগ করে বললেন, তুমি ঠিক করো নি। চাঁদ দেখার ঘোষণা দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র যদি ইচ্ছা করে ভুল করে তার পাপ হবে। কিন্তু জনগণের কোনো গুনাহ হবে না। তাদের হজ্জ ঈদ আদায় হয়ে যাবে। কাজেই যে দিনে রাষ্ট্র ঘোষণা দেবে, সকল মানুষ ঈদ পালন করবে, সেই দিনে ঈদ।[৬]

[প্রশ্ন আসতে পারে, এখানে যারা রাষ্ট্রের পরিচালনা করছেন তাদের কোনো কোয়ালিটি থাকা লাগে কি না– এই চাঁদের ঘোষণার জন্য? তারা যদি ঈমানদার না হয় অথবা মুসলিম, ঈমানের এই চেতনাগুলো না জানে, সে ক্ষেত্রে কি আমরা তাদের ঘোষণা গ্রহণ করব? -উপস্থাপক]

৫. বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৯৮২৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৮০২; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-২৪৪৭; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস-১৭২৫।

৬. বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৮২০৯।

এটা আমাদের একটা ভুল ধারণা। কখন রাষ্ট্রপ্রধান, শাসকরা বেশি ভালো ঈমানি চেতনার ছিল? কারণ এই জায়গাটাই খুলাফায়ে রাশিদীনের পরে ভালো মানুষ কম যায়। কারণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য অনেক অন্যায় কাজ করতে হয়। যেটা ভালো মানুষেরা করতে পারেন না। আর এইজন্য ক্ষমতায় সব সময়ই অল্প বা বেশি খারাপ মানুষ থাকে। ইয়াযীদের সময়ও সাহাবিরা এই বিধান পালন করেছেন। বাদশাহ মামুনের যুগে, মু'তাসিমের যুগে, যেখানে কুফুরি মতবাদ চাপানো ছিল, খালকুল কুরআনের মতবাদ, তখনো তারা এটাকে দারুল ইসলাম হিসেবে মেনেছেন। আকবরের দীনে ইলাহির যুগেও সেটাকে দারুল ইসলাম হিসেবে মানা হয়েছে। একজন রাষ্ট্র প্রধান শাসকের পাপের কারণে, কুফরের কারণে গোটা রাষ্ট্রটা কাফির হয়ে যায় না। রাষ্ট্র শৃঙ্খলা থাকবে। শাসকের পরিবর্তনের জন্য শান্তির ভেতরে যেটা সম্ভব তৎকালীন উলামারা সেটা করেছেন। এজন্য শাসক ভালো না মন্দ এটা বিষয় নয়। প্রশাসনকে মানতে হবে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত মানতে হবে, এটা হল ইসলামের নির্দেশ। শাসক, প্রশাসক অন্যায় করলে অন্যায়ের প্রতিবাদ হবে, পরিবর্তনের চেষ্টা হবে, এটা ভিন্ন জিনিস। এজন্য বিধিবিধান মানা যাবে না– এটা নয়।

দ্বিতীয়ত, যেমন অনেক অমুসলিম দেশ মুসলিমরা বাস করে। পাশ্চাত্যের দেশ, ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে সেখানেও উচিত হল, লোকাল অথরিটি যাদেরকে দায়িত্ব দেয়। অমুসলিম দেশ হিসেবে রাষ্ট্র দায়িত্ব নেয় না। তবে মুসলিম কমিউনিটি থাকে। এদের উচিত এটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া। সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেওয়া। এভাবে প্রত্যেক দেশের মানুষ অন্তত সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ঈদ করবে, এটা ইসলাম বলে।

এখানে আরেকটা জরুরি বিষয় আছে। সেটা হল, আমরা যে বলছি, সারাবিশ্বে একদিনে ঈদ করতে হবে! না হলে শবে কদর নষ্ট হবে। না হলে হারাম দিনে ঈদ হয়ে যাবে। এগুলো অত্যন্ত আপত্তিকর কথা। সাহাবিদের যুগে একাধিক দিনে ঈদ হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঠান নি যে, অমুক জায়গায় দেখা গেছে অমুক তারিখে ঈদ হবে। সাহাবিদের যুগে, এটা ৫৩-৫৫ হিজরির দিকে বা তারও আগে। মুআবিয়া (রা.) এর ক্ষমতার সময়। এটা হল ৪২-৪৫ হিজরির দিকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ওফাতের ৩০-৪০ বছর পরের কথা। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর

একজন খাদেম, তিনি সিরিয়ায় গিয়েছেন, রাজধানীতে। সেখান থেকে আসছেন রমাযানে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ওখানে রোযা কবে শুরু হয়েছে? বললেন বুধবারে সম্ভবত। যতদূর মনে পড়ে। তাঁরা বললেন, আমরা বৃহস্পতিবারে[৭] শুরু করেছি। তখন বুধবার অনুসারে ওখানে ঈদ হয়ে গেছে, তারা করলেন না। তারা বৃহস্পতিবার ৩০ রোযায় ঈদ করলেন। অনেকে বললেন, রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে ঈদ হবে না? বললেন, না। প্রত্যেক দেশে আমরা চাঁদ দেখে দেখে ঈদ করব।

هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের এইভাবে নির্দেশ করেছেন।[৮] কাজেই, সাহাবিরা এই বিষয়টাকে মোটেও খারাপ জানেন নি। এমনকি বলেন নি, পরের বছর থেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা দেবেন। সব জায়গায় দূত পাঠাবেন। কি জানি আমাদের শবে কদর নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের হারাম দিনে ঈদ হল। এ রকম বলেন নি। অতিরিক্ত আবেগ কাজ করছে। ইসলাম সহজ। যেকোনো দেশের মানুষ সহজে পালন করতে পারবে। কাজেই যে যে দেশে যে দিনে চাঁদ দেখা গিয়েছে সেই দেশে সেই দিনেই ঈদ হবে। সেই সময়-ই শবে কদর হবে। আল্লাহ সেই অনুযায়ী তাদেরকে সাওয়াব দেবেন।

জিজ্ঞাসা: ৩১

আমরা যে ঈদের সালাত আদায় করি– ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা। এটা সৌদি আরবের সাথে মিলিয়ে করব না কি আমাদের দেশের সাথে মিলিয়ে?

জবাব:

এটা বর্তমান আমাদের সমাজের মুসলিম উম্মাহর একটা বড় ব্যাধিতে

---

৭. সে বছর সিরিয়াবাসী চাঁদ দেখেছিল শুক্রবার আর মদীনাবাসী দেখেছিল শনিবার। বিস্তারিত জানার জন্য নিচের রেফারেন্স দেখুন। -সম্পাদক

৮. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৭৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৮৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৩৩২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৬৯৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২১১১; সহীহ ইবন খুযায়মা, হাদীস-১৯১৬; তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, হাদীস-৪৮০; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-২২১১; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৮২০৫; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস-১৭২৪।

পরিণত হয়েছে। সাধারণভাবে অনেক আবেগী যুবক বলেন, চাঁদ তো একটা। কাজেই চাঁদ দেখা গেলে রোযা রাখতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ.

চাঁদ দেখা গেলে রোযা রাখতে হবে। চাঁদ দেখা গেলে ঈদ করতে হবে।[৯] কাজেই আগেপিছে করা যাবে না। দুনিয়াতে যেখানেই দেখা যাক, আমরা সবাই করব। তাদের এই চিন্তাটা সুন্নাহ্ এবং সাহাবিগণের আচরণ-বিরোধী।

কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুধু চাঁদ দেখে রোযা রাখতে বলেন নি। এবং বাস্তব কথা হল, কেউ চাঁদ দেখে রোযা রাখতে পারবে না। আমি নিজেও যদি চাঁদ দেখি এবং সেটা সরকারের কাছে সাক্ষ্য দেই, সরকার গ্রহণ না করে আমি নিজেও রোযা রাখতে পারব না। চাঁদ দেখে রোযা রাখো, অর্থাৎ চাঁদ দেখে সরকারকে জানাও। সাক্ষ্যগ্রহণ হয়। সরকার ঘোষণা দিলেন তখন রোযা রাখো। তখন ঈদ করো। ইসলামের সামাজিক ইবাদতগুলো কিন্তু রাষ্ট্র সরকার নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিগত ইচ্ছামতো করবে সমাজে বিশৃঙ্খলা হবে। সামাজিক শৃঙ্খলা ইসলামের বড় ইবাদত। এজন্য তিরমিযি শরীফের অন্য সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ.

সেদিন সব মানুষ ঈদ করবে ওই দিনই ঈদ করবে।[১০] তুমি তোমার ইচ্ছামতো একাকী করতে পারবে না। বিচ্ছিন্ন হয়ে করতে পারবে না। এখন কথা হল, আমরা সৌদি আরবের মানুষের সাথে করব কি না!

সৌদি আরবের মানুষের সাথে করব?... কিন্তু আমি আমার সমাজের মানুষের বাদ দিয়ে সৌদি আরবের মানুষের সাথে করাটা আমার জন্য দুই কারণে হারাম। একটা হল আমি আমার সমাজের সামাজিক একতা নষ্ট করেছি। এটা হারাম। আরেকটা হল, আমার সরকার 'আল ফিতরু

---

৯. সহীহ বুখারি, হাদীস-১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৮১।
১০. সুনান তিরমিযি, হাদীস-৮০২।

ইয়াওমা আফতারাল ইমাম'। ইমাম, রাষ্ট্রপ্রধান যেদিন করবেন এইদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আমরা যখন সাহাবিদের যুগে যাব। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগেও দেখি, তিনি চাঁদ দেখে দূরে খবর দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করেন নি– মদীনায় চাঁদ দেখা গেছে অমুক তারিখে রমাযানের, কাজেই রোযার ঈদ কত তারিখে হতে হবে খেয়াল রাখবে। এমনকি জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার তো নয়দশ দিন পর ঈদ। তিনি ইচ্ছা করলে সারা আরব বলে দিতে পারতেন। তিনি কখনো দেন নি। সাহাবিদের যুগে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ওফাতের প্রায় ৪০ বছর পর। আমরা দেখছি মুসলিম শরীফের হাদীস। একজন তাবিয়ি, কুরাইব। তিনি সিরিয়ায় গিয়েছেন। সিরিয়ায় গিয়ে সেখান থেকে রমাযানে ফিরে এসেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন, "তোমরা ওখানে রোযা শুরু করেছ কবে?" "বৃহস্পতিবারে। বৃহস্পতিবারে চাঁদ দেখে শুক্রবারে রোযা রেখেছি।" তিনি বললেন, "আমরা মদীনায় শনিবারে রেখেছি। আমরা শনিবার হিসেবেই করব। সিরিয়ার দেখায় আমরা চলব না।"[১১] কাজেই সাহাবিগণ একদিনে ঈদ করার জন্য চেষ্টা করেন নি। তারা বলেন নি যে, বিরাট ভুল হয়ে গেল। আমাদের শবে কদর নষ্ট হয়ে গেল। আগামীতে যেন এরকম না হয়। কাজেই সিরিয়ায় চাঁদ দেখলে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই চিন্তা তারা করেন নি।

[যারা বলেন একদিনে ঈদ করা... এটা বর্তমান বিশ্বে একটা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে...। -উপস্থাপক]

সারাবিশ্বে একদিনে ঈদ করা কথাটা শুনতে খুবই সুন্দর। এর ভেতরে আরেকটা অসুন্দর আছে। এই অজুহাতে একই দেশে তিনদিনে ঈদ করা।

সারাবিশ্বে একদিনে ঈদ। এটা অসম্ভব-সম্ভব আলিমরা গবেষণা করবেন। কারণ সাহাবিদের, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সারাবিশ্বে প্রত্যেক দেশে যার যার মতো ঈদ হয়েছে। ইসলাম সহজ জীবনধর্ম। ইসলাম কিছু কঠিন করে নি। যে যে দেশে চাঁদ দেখেছেন সে দেশে ঈদ করেছেন। এখন নতুন ব্যবস্থা আমরা চালু করব কি না।

১১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৭৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৮৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৩৩২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৬৯৩।

পুরাতনটা, যার যার মতো দেখা, রোযা রাখা, এটা এই দেড়হাজার বছর, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগ থেকে চলে এসেছে। এখন আমরা যেহেতু প্রযুক্তির মাধ্যমে খবর পেতে পারছি। আমরা কি একসাথে করব– এটা নিয়ে গবেষণা হতে পারে। ইজতিহাদ হতে পারে। এটা যখন সরকার-আলিমরা মিলে একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা মানতে পারি। কিন্তু জনগণের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের বিপরীতে একই দেশে দুইদিনে ঈদ– ঐক্য বিনষ্ট করা। সরকার ঘোষণার আগে ঈদ করা, এটা নিঃসন্দেহে অবৈধ হারাম কাজ।

[এই উদ্যোগটা যদি আলিমরা নেন! এই বিষয়ে লেটেস্ট কোনো নিউজ আমাদের জানাবেন কি না? এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ পৃথিবীতে নেওয়া হচ্ছে কি না? -উপস্থাপক]

বিভিন্ন দেশে এটা আলিমদের ইজতিহাদের উপর। বিভিন্ন দেশের সরকার সৌদি চাঁদ দেখাকে মেনে নিয়ে ঘোষণা দেন। যদি কোনো দেশের সরকার সৌদির রাবেতায় তাদের প্রতিনিধি রাখেন, তাদের চাঁদ দেখা মেনে নেন, সরকার ঘোষণা দেন, সে দেশের আলিমরা মেনে নেন– এটা হতে পারে। কোনো কোনো দেশে এটা হচ্ছে। কিন্তু এটা সেই দেশের আলিম এবং সরকারের-জনগণের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করবে। আমরা আগেই বলেছি কোনো ব্যক্তি নিজে চাঁদ দেখে রোযা রাখতে পারবে না। সরকার যতক্ষণ না চাঁদ দেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঘোষণা দেবেন। কাজেই এই বিষয়টা ইজতিহাদ করা, সারা বিশ্বের আলিমরা সবাই বলেন। এ বিষয়ে উন্মুক্ততা আছে। যদি কোনো দেশের মানুষ নিজস্ব চাঁদ দেখে রোযা রাখে এটা ঠিক। এই হাজার বছর এভাবেই চলছে। এটাতে ইসলামের কোনো বিরোধিতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবিদের যুগে এভাবে চলেছে। কেউ এটাকে অপছন্দ করেন নি। বরং এটাই মূল নিয়ম হিসেবে চলে এসেছে। আবার দ্বিতীয় যেটা সবদেশে মানুষ একটা চাঁদ দেখাকে, রুইয়াতকে মেনে নিয়ে সেটা ঘোষণা দেবেন– এটা সুযোগ আছে। এটা নতুন বিষয় হিসাবে দ্বিমত থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ ইসলামে নতুন কোনো বিষয় ঢোকাতে আলিমরা স্বভাবতই আপত্তি করেন। কাজেই আলিমকে ছেড়ে দিতে হবে গবেষণা করার জন্য। এবং তাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকব। তার আগ পর্যন্ত সরকারি ঘোষণার আগেই করলে, এটা

কঠিন অন্যায়।

[এখানে যুবকদের মধ্যে ইমোশন কাজ করে। তারা দেখে সরকার কতটুকু তাকওয়াবান, কতটুকু মুত্তাকি, কতটুকু তারা ইসলাম মেনে চলে, সেই বিষয়টাকে অনেকে প্রশ্ন করেন। -উপস্থাপক]

একটা মজার ঘটনা আছে হাদীস শরীফে। তিরমিযিতে। আমাদের বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশগুলোর সরকারের যতটুকু যালিম বা যতোটুকু ফাসিক এর চেয়েও বড় যালিম ও ফাসিক ছিল উমাইয়া যুগের সরকার। আমরা জানি ইয়াযীদের সরকার। মারওয়ানের সরকার। এই সময়ের কথা বলছি। আয়িশা (রা.) তাঁর বাড়িতে বসে আছেন। এমন সময় তাবিয়ি মাসরুক এসেছেন। সেটা ছিল আরাফাতের দিন। মাসরুক রোযা ছিলেন না। আয়িশা (রা.) বললেন, মাসরুককে ছাতু খাওয়াও। মাসরুক লজ্জা পেলেন। তিনি বলেন আসলে চাঁদ দেখার যে ঘোষণা আসছে। সঠিক কি না। যালিম সরকার। আমার ভয় হচ্ছে আজকে দশ তারিখ কি না। দশ তারিখে রোযা রাখা হারাম। এজন্য আমি রোযা রাখি নি। তখন আয়িশা (রা.) ধমক দিয়ে বললেন, তোমার কি দরকার? যেদিন সরকার ঘোষণা দেবে সেই দিনই আরাফাত। যেদিন সরকার ঘোষণা দেবে সেই দিনই ঈদ।

ইমাম শাফিয়ি (রাহ.) লেখেছেন, এক্ষেত্রে যদি সরকার জেনে অন্যায় ঘোষণা দেন সরকার পাপী হবে। সবার ঈদ হয়ে যাবে। আর না জেনে দেয়, ইজতিহাদের সুযোগ সরকারের আছে। কাজেই সরকার যালিম সরকার, ফাসিক সরকার, ইসলাম বিরোধী– এটার সাথে ইসলামি রাষ্ট্র বিষয়ক নির্দেশনার সম্পর্ক নেই। দেশের যালিম, এমনকি মদ্যপায়ী সরকারের পেছনে তাঁরা জামাআত আদায় করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-সহ সাহাবি এবং তাবিয়ি (রা.) ফজর সালাত আদায়ের সময় ইমাম মদ পান করেছে। দুই রাকআত নামায চার রাকআত পড়িয়ে বলছে, রাকআত কি কম পড়ে গেল? তখন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বললেন, তুমি অনেক বেশি পড়িয়েছ আর লাগবে না। এখন তাঁরা যুলুমের প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করেন নি। এইজন্য সরকার যালিম হওয়ার কারণে বা ইসলামের কিছু অন্যায় করার কারণে; অর্থাৎ বাড়ির কর্তা

অনৈসলামি কাজ করে, কাজেই পুরো বাড়িটা কাফির হয়ে গেল, এই চিন্তা করার সুযোগ নেই। আমাদের মুসলিম সমাজের ঐক্য, যেটা শৃঙ্খলা, এটা উলামায়ে কিরাম এমনকি আকবারের দীনে ইলাহির সময়ও, এর চেয়ে খারাপ সময় তো আর কখনো ছিল না?! যেখানে ইসলাম ধর্মকে রহিত করা হয়েছিল। সেখানে উলামায়ে কিরাম দেশটাকে দারুল ইসলাম গণ্য করেছেন। এবং জুমুআ, জামাআত, ঈদের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। খলীফা মামুন কুফরি মু'তাযিলি মতবাদ ঘোষণা করেন। যা আহমাদ ইবন হাম্বল (রা.)-সহ সবাই কুফরি বলে ঘোষণা দেন। তারা কিন্তু একসাথে বলেছেন মতটা কুফুরি। কিন্তু তোমরা মামুনের পেছনে জুমুআ আদায় করবে। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। জুমুআ-জামাআত-খারাজসহ সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

জিজ্ঞাসা: ৩২

রাসূল (ﷺ) এর নামে কুরবানি করা যায় কি না? বা পক্ষ থেকে যায় কি না?

জবাব:

প্রথমে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা বাংলাভাষায় বলে থাকি অমুকের নামে। আব্বার নামে, দাদার নামে– এটা অত্যন্ত আপত্তিকর ব্যবহার। কারণ আমাদের সকল ইবাদত আল্লাহর নামে হবে। অমুকের পক্ষ থেকে অমুকের জন্য, এটা হতে পারে। তাহলে প্রথমেই আমাদের পরিভাষাটাকে শুদ্ধ করা দরকার যে, আমি আমার পক্ষ থেকে, আমার সন্তানের পক্ষ থেকে, পরিবারের পক্ষ থেকে, আব্বার পক্ষ থেকে কুরবানি দিচ্ছি আল্লাহর নামে। আল্লাহর জন্য।

اللهم لك ومنك

আল্লাহর জন্য, আল্লাহকে আমি দিচ্ছি। আল্লাহর তাওফীকেই দিচ্ছি। তবে অমুকের পক্ষ থেকে কুরবানি দিচ্ছি– আমাদের ভাষা এমন হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পক্ষ থেকে কুরবানি দেব কি না? এখানে দুটো পর্যায় রয়েছে। যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পক্ষ থেকে কুরবানি

করা যাবে কি না আদৌ! মৃত পিতামাতা, মৃত দাদাদাদি– এ ব্যাপারে ফুকাহাদের দুটো মত রয়েছে। কেউ বলেন, দেওয়া যাবে না। কেউ বলেন, দেওয়া যাবে। তাদের পক্ষের দলীলটা বেশ জোরালো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় প্রতি বছরই দুটো করে কুরবানি দিতেন। তিনি বলতেন:

مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

'এটা মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে।

আরেকটা বলতেন:

عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ

'উম্মাতি মুহাম্মাদ যারা কুরবানি দিতে পারে নি তাদের পক্ষ থেকে'। যারা দিতে পারে নি তাদের অনেকেরই মৃত্যুবরণ করেছেন। অনেকের আবার জন্মই হয় নি। তাহলে বোঝা গেল, জীবিত ব্যক্তি, যাদের এখনো জন্ম হয় নি অথবা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের পক্ষ থেকে কুরবানি দিতে পারেন। এই হাদীসটা সহীহ।[১২] আরেকটা হাদীস অত্যন্ত দুর্বল। সুনান তিরমিযিতে রয়েছে। আলী (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন, আলী, তুমি যখন কুরবানি দেবে আমার পক্ষ থেকেও একটা কুরবানি দিয়ো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ওফাতের পরেও তিনি এই কুরবানিটা অব্যহত রাখতেন। এই হাদীসটা খুবই দুর্বল।[১৩]

এজন্য বোঝা যায়, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়া যেতে পারে। জায়িয। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়া আমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয়। কারণ আমরা যত কর্ম করি, উম্মাতের সকল কর্মের সমান সাওয়াব তিনি পান। কারণ তাঁর কারণেই আমরা আমল শিখেছি। এইজন্য নতুন করে কোনো আমলের সাওয়াব তাঁকে দেওয়া লাগে না। আমরা প্রতিটি কর্ম তাঁরই কারণে, তাঁরই মাধ্যমে, তাঁরই ওসিলায় শিখেছি। যার কারণে যে কর্ম করে এই কর্মের সাওয়াব তিনি পান। এজন্য আমাদের সকল কর্মের সাওয়াব তিনি পাচ্ছেন। আলাদা করে

---

১২. সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩১২২।
১৩. সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৪৯৫।

দেওয়াটা...; এর চেয়ে আমার মৃত পিতামাতা-আত্মীয়স্বজন, তাদের জন্য দেওয়াটা জরুরি।

জিজ্ঞাসা: ৩৩

কুরবানি কয় ভাগে দেওয়া সুন্নাত?

জবাব:

কুরবানির সুন্নাহ্ বলতে অনুমোদিত। একজনে দেওয়া যায়। আর সর্বোচ্চ উট এবং গরুর ক্ষেত্রে সাতজনে দেওয়া যায়। তাহলে সুন্নাত বলতে যেটা সুন্নাত অনুমোদিত, একজন একটা উট বা গরু দিতে পারেন। ছাগল ভেড়া দুম্বার ক্ষেত্রে একজন। উট এবং গরুর ক্ষেত্রে এক থেকে সাতজন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত। আমরা অনেকেই মনে করি সাতই হতে হবে। আমরা মনে করি বেজোড় হতে হবে। এটা কোনটাই ঠিক নয়। অর্থাৎ এক থেকে সাত পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যায় ভাগ নেওয়া যেতে পারে। এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[১৪]

এ ব্যাপারে সাধারণত আলিমদের ইখতিলাফ নেই। দুই একজন আলিম বলেছেন, আমাদের ভারত উপমহাদেশের, এটা শুধু সফরের সময় হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুমতি দিয়েছিলেন বিদায় হজ্জের সময়। এ কারণে সাধারণভাবে এটা বৈধ হবে না। তবে ফুকাহা, সৌদি আরবের উলামায়ে কিরামসহ সব মাযহাবের ফকীহ বলেন, এই যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফরে অনুমতি দিয়েছেন, কাজেই অন্য সময় হবে না, এই মতটা ঠিক না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেটাকে নির্ধারণ করে দেন নি সেটাকে নির্ধারণ করা ঠিক নয়। এটা সকল ক্ষেত্রে। এক থেকে সাত পর্যন্ত ভাগে অংশ নেওয়া উট এবং গরুর ক্ষেত্রে বৈধ।

জিজ্ঞাসা: ৩৪

কুরবানির অংশীদার যে আমরা পাঁচজন সাতজন করে করতে পারি। এক্ষেত্রে কোনো অংশীদারের ইনকাম যদি হারাম হয় সেখানে সকলের কুরবানি কি বাতিল হবে?

১৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১২১৩, ১৩১৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৫০২।

জবাবঃ

এখানে দুইটা বিষয়, প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কুরবানি হতে হবে। কুরবানি হতে হবে, অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে আমি এ প্রাণিটা কুরবানি করে মানুষদের খাওয়াব। কেউ যদি হিসাব করে যে, বছরের একটা দিন গোশত তো কিনতেই হবে। বাজারে গোশতের দাম হিসাব করে দেখছি যে, ১০ কেজি গোশতের দাম যা হবে কুরবানির ভাগ নিলে কম পড়বে। এমন চিন্তা হলে কারোরই কুরবানি হবে না। তিনি তো ত্যাগের জন্য কুরবানি দেন নি। ভোগের জন্য, খাওয়ার জন্য কুরবানি দিয়েছেন। কাজেই খাওয়ার মানসিকতায় বা টাকা বাঁচানোর মানসিকতায়, কম টাকায় বেশি গোশত পাওয়ার মানসিকতায় যদি কেউ কুরবানি দেয়, ওই সাতজনের একজনের কারোরই কুরবানি হবে না।

দ্বিতীয়ত, অবশ্যই পুরো উপার্জন প্রত্যেকেরই হালাল হতে হবে। এজন্য পাঠকদের প্রতি অনুরোধ আপনারা মুত্তাকি পরহেযগার দীনদার সাথি খুঁজবেন। যাদের ভেতরে তাকওয়া আছে। আল্লাহকে বোঝেন। এই ধরনের সাথিদের সাথে কুরবানি দেবেন। আল্লাহ তৌফিক দেন।

জিজ্ঞাসা: ৩৫

আমরা যে কুরবানির জন্য পশু জবাই করি। সে ক্ষেত্রে পশুটা কেমন হওয়া উচিত? কোন জাতীয় পশু জবাই করা উচিত?

জবাবঃ

কুরবানির তত্ত্বটা কী, এটা আমরা অনেক সময় বুঝি না। অন্যান্য ধর্মে বোঝা যায় না। যে কোনো কারণে আমাদেরকে বাইবেল পড়তে হয়। বাইবেলের বিষয়ে কিছু কাজ করতে হয়। বাইবেল পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমরা যে কুরবানি দিই আর বাইবেলের কুরবানি, সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাইবেলের কুরবানি হল পশুটাকে মেরে পুড়িয়ে ফেলা। যখন পশুকে মেরে পোড়ানো হয়, চর্বি পোড়ে, এর ঘ্রাণে নাকি ঈশ্বর খুশি হন। নাকে খুব খুশবু লাগে। বাইবেলে অন্তত শতবার রিপিট করা হয়েছে। পোড়ানো কুরবানি, হোমোবলি যেটাকে বলা হয়। আর এ সময় বার্নট

অফারিংস (Burnt offerings), এটার খুশবুতে ঈশ্বর খুশি হন। এটার বড় কষ্টদায়ক বিষয় হল, ছোট পাখি, সাতদিনের প্রাণি তাদেরকে কুরবানি করতে হবে। এবং এটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কেউ খাবে না। খাওয়া যাবে না। যেটা খাওয়া যাবে সেটা পুরোহিতেরা খাবে। অর্থাৎ যারা পুরোহিত তারাই পাবে। আর বিশেষ কিছু জবাই আছে যেটা সবাই খাবে। সেটা ভিন্ন। কুরবানি নয়।

এই বিষয়টা অনেকে বুঝতে পারেন না। ইসলামি কুরবানির উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেছেন:

لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

এই পশুর রক্তও আল্লাহর কাছে যায় না। মাংস আল্লাহর কাছে যায় না। আল্লাহ তোমার অন্তরের তাকওয়া, ত্যাগের অনুভূতিটা দেখেন।[১৫] এটার উদ্দেশ্য হল সবাই খাবে। এটার উদ্দেশ্য মানুষকে দেয়া, আল্লাহকে খুশি করা। এজন্য কুরবানি পশুর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এমন একটা পশু হবে যার গোশত বেশি হয়। সুন্দর; যেটা তোমার প্রিয় লাগে। যেটাকে মানুষকে খাওয়ানো যায়। তুমি খাবে, সন্তানেরা খাবে, মানুষেরা খাবে। মানুষকে খাওয়াবে যত বেশি পরিমাণ গোশত হবে ততো তোমার দানটা পূর্ণ হবে। এজন্য সুস্থ-সবল, গোশতপূর্ণ আছে, ত্রুটিমুক্ত প্রাণি কুরবানি দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন।

কুরবানিতে আল্লাহ চার প্রকার প্রাণির কথা বলেছেন– একটা হল ছাগল, ভেড়া, দুম্বা জাতীয়। আরেকটা হল গরু, উট জাতীয়। মহিষও গরুর ভেতরে পড়ে অনেকের মতে। এই জাতীয় প্রাণিগুলো আমরা কুরবানি দেব। ছাগলের ক্ষেত্রে একবছর পূর্ণ হতে হবে। সুস্থ হবে। শরীরে তাজামোটা যতটুক সম্ভব হবে। কোনো বাহ্যিক ত্রুটি থাকবে না। কানা খোড়া বা শিংভাঙ্গা হবে না। গরুর ক্ষেত্রে অন্তত দুইবছর এবং সুস্থ-সবল। এ ক্ষেত্রে মূল থিমটা এটাই; এটার ঘ্রাণ আল্লাহ পাবে না। এটা পুরোহিতরা পাবে না। বরং ইসলামে কোনো কুরবানির অংশ যদি পুরোহিতকে দেওয়া হয়, অর্থাৎ হুযুর জবাই করে দিয়েছেন, তাকে দেওয়া হয়, তাহলে কুরবানি হবে না। অবৈধ হবে। এক্ষেত্রে নিজের কুরবানি নিজে করে বিতরণ করব।

১৫. সূরা: [২২] হজ্জ, আয়াত: ৩৭।

অথবা যদি কোনো আলিম বা কোনো কসাই জবাই করে দেয় তাকে টাকা দেওয়া যাবে। কিন্তু কুরবানির গোশত দেওয়া যাবে না।

জিজ্ঞাসা: ৩৬

একজন প্রশ্ন করেছেন, কুরবানি দেওয়ার পরে কুরবানির পশুর চামড়াটা আমরা কী করতে পারি?

জবাব:

কুরবানির পশুর চামড়াও কুরবানির অংশ। আর কুরবানির কোনো অংশ বিক্রি করা যায় না। নিজে খাওয়া যায়। অথবা দান করা যায়। এজন্য কুরবানির চামড়া বিক্রয় করা হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে।[১৬] তবে গরীবরা যদি নিয়ে বিক্রি করে, অর্থাৎ দান করে দিলাম সে মালিক হয়ে গেল, এরপরে বিক্রি করে, এটাতে কোনো সমস্যা নেই। অথবা বিক্রয় করে টাকাটা দান করে দেওয়া আলিমরা অনেকেই জায়িয বলেছেন। কিন্তু এই চামড়া নিজে আমরা খেতে পারি, ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু বিক্রয় করলে কুরবানি নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্যই তো গরীবদের পাওনা গরীবদের দিয়ে দিতে হবে।

জিজ্ঞাসা: ৩৭

জিলহজ্জ মাসে না কি নখ কাটা যায় না। বিষয়টা ঠিক কি না?

জবাব:

যে ব্যক্তি কুরবানির নিয়ত করবে সে ব্যক্তি জিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠা থেকে কুরবানি করা পর্যন্ত নখ চুল ইত্যাদি কাটবে না। যেমন হাজিরা হজ্জের ইহরাম থেকে শুরু করে দশ তারিখে কুরবানি করার আগ পর্যন্ত কাটতে পারেন না, ঠিক এটা হাজিদের অনুকরণে একটা সুন্দর ছোট্ট ইবাদত। কিন্তু যিনি কুরবানির নিয়ত করেন নি বা কুরবানি তার ওপর দায়িত্ব নয়, কুরবানি দিচ্ছেন না, তিনি কাটতে পারেন। তার সমস্যা নেই।

এটা ওই ব্যক্তির জন্য যিনি কুরবানির নিয়ত করেছেন। যার উপরে দায়িত্ব

১৬. মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৩৪৬৮।

এবং যিনি নিয়ত করেছেন কুরবানি দেবেন। এখন উনি যদি কাটেন তাহলে কি গুনাহ হবে? এ ব্যাপারে উলামাদের ইখতিলাফ আছে। কেউ এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিন্তু বলেছেন:

فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا.

সে যেন কখনোই তার নখ-চুল কিছুই গ্রহণ না করে। না কাটে।[১৭] কাজেই এটা ইখতিলাফ না করে এটাকে মান্য করাটাই দরকার। জিলহজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে শুরু করে কুরবানি দেওয়া পর্যন্ত। এমনকি তিনি সকালেও কাটবেন না। তিনি কুরবানি দেওয়ার পরে কাটবেন।

১৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯৭৭।

হজ্জ

জিজ্ঞাসা: ৩৮

অনেক লোকে ঘুষ খায়। এই ঘুষের টাকা দিয়ে আবার হজ্জ করতে যায়। এক্ষেত্রে তার এই হজ্জটা হবে কি না?

জবাব:

এখানে প্রথম বিষয় হল, হারাম উপার্জন করার চেয়ে বড় হারাম আর নেই। অর্থাৎ শুয়োরের গোশত খাওয়া, মদ খাওয়া, ব্যভিচার করা ইত্যাদির চেয়ে অনেক বেশি কঠিন গুনাহ হল হারাম উপার্জন করা। কারণ এই সকল হারামের সাথেই মানুষের হক জড়িত থাকে। ঘুষ মানে কী? একজন থেকে অবৈধভাবে কিছু টাকা নিয়েছি। এটা আমার পাওনা ছিল না। তার ওপর যুলুম করেছি, অবৈধভাবে অর্জন করেছি। সকল অবৈধ উপার্জন কোনো না কোনভাবে মানুষের হক নষ্ট করে। আর এর চেয়ে বড় গুনাহ নেই। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সুদ যে খায় সুদ যে দেয় এবং সুদের মধ্যে দালালি করে সবাইকে অভিশাপ দিয়েছেন।[১] এটা হল প্রথম পাপ।

দ্বিতীয় হল, হারাম উপার্জনের মাধ্যমে যে ইবাদত করা হয় আল্লাহ সেটা কবুল করেন না। কবুল করেন না দুটো অর্থ আছে। একটা হল যেটা দৈহিক ইবাদত। হারাম টাকা খেয়েছি, হারাম টাকার কাপড় পরেছি;- সালাত আদায় করেছি। সালাতের ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এর সাওয়াব, কবুলিয়াত, দুআ কবুল হবে না।

আর হজ্জ করতে গিয়েছি... এটা হাদীস শরীফে এসেছে, হারাম টাকা;

---

১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৩৫।

হজের জন্য টাকা দরকার, হারাম টাকায় যখন কেউ হজ্জ করতে যায়, 'লাব্বাইকা' বলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়, না, তোমার এই লাব্বাইকা গ্রহণ করা হল না। আর সম্পদ, টাকার ইবাদত যেটা, যেমন হজ্জের ফরয, যাকাত, দান-সাদাকা, মসজিদের বানানো– এগুলো যখন কেউ হারাম টাকায় করেন, এটাতে ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। কারণ আমরা তো টাকা আল্লাহকে দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বান্দা তুমি আমাকে একটা টাকা দিলে দাও। কিন্তু পাক টাকা দিও। নাপাক টাকা দিয়ো না। আর আমি বলছি, না, আমি তোমাকে নাপাক টাকা-ই দেব। তুমি নিতে বাধ্য। এটা আমাদের ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। তবে কারো যদি হালাল-হারাম মিশ্রিত টাকা থাকে; তিনি হজ্জ করে এসেছেন, আশা করা যায়, ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে তাতে হজ্জের সাওয়াব, কবুলিয়াত– এগুলোর কোনোটাই তিনি পাবেন না।

[কোনো ব্যক্তি চাকুরিরত অবস্থায় কোনো একদিন ঘুষের টাকা খেয়েছেন অথবা কোনো একটা সময় সুদের টাকা নিয়েছেন। তিনি এখন জেনেছেন। সেই টাকাটা তার কাছে আছে। কী করতে পারেন এক্ষেত্রে? - উপস্থাপক]

এক্ষেত্রে তাওবার অংশ হল...। তাওবার দরজা বান্দার জন্য খোলা। তবে অন্যান্য পাপ থেকে, যেমন ব্যভিচার, মদ, নামায আদায় করেন নি, রোযা করেন নি– এগুলোর তাওবা যত সহজ, হারাম উপার্জনের তাওবা এর চেয়ে একটু কঠিন। তাওবা অর্থ কী? তাওবা অর্থ অনুতপ্ত হওয়া। আর কখনো করব না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া। এবং যে হারাম টাকা আছে সেটার দায় থাকে মুক্ত হওয়া। তিনি যদি পাওনাদার চিনতে পারেন তাকে ফিরিয়ে দেবেন। যদি চিনতে না পারেন তাহলে তিনি হিসাব করবেন, বিশলক্ষ, পঞ্চাশলক্ষ, একলক্ষ, কোটি টাকার সম্পদ এর ভেতর ১০ লাখ ৫ লাখ ঘুষের টাকা বা সুদের টাকা আছে। এই টাকাটা আলাদা করে তিনি যদি মালিক না পান তাহলে মালিকদের উদ্দেশ্যে কোনো ভালো কাজে ব্যয় করবেন, যে আল্লাহ সাওয়াবটা মালিকদের দিয়ো, আমাকে দয়া করে মাফ করে দিয়ো। এর পাশাপাশি তাওবা করতে থাকবে। এটা বান্দার হক। বান্দার হক আদায় না হওয়া পর্যন্ত মাফ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।

জিজ্ঞাসা: ৩৯

আমাদের হাজি সাহেবেরা হজ্জে যান। সে ক্ষেত্রে ইহরামটা কোন জায়গা থেকে বাঁধা উচিত? এটা কি মীকাতে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁধতে হবে? নাকি আমরা এখান থেকে বাঁধতে পারি। অনেকেই এয়ারপোর্ট থেকে বেঁধে চলে যান।

জবাব:

ইহরামের জন্য সুন্নাত হল মীকাত থেকে করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

এটা হল মিকাতের স্থান। হজের ইহরামের স্থান।[২] এজন্য ইমাম বুখারি (রাহ.) একটা অধ্যায় এনেছেন, 'লা ইউহরিমু লা ইউলাব্বি কবলাল মীকাত' মীকাতের আগে দেবে না। অনেক আলিমই অপ্রয়োজনে মীকতের আগে হজ্জ শুরু করা তালবিয়া শুরু করাকে অপছন্দ করেছেন। অনেকে মনে করেন আগে তালবিয়া শুরু করলাম সাওয়াব বাড়তে লাগল। আমি তাদেরকে বলি, তাহলে পথে থেকে নামাযের তাকবীর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন সাওয়াব বাড়তে লাগল। তালবিয়া, এটা হল, তাকবীরে তাহরীমা। নির্ধারিত জায়গায় দিতে হবে। প্রয়োজনে ওজরে আগে থেকে দেওয়াতে দোষ নেই। কিন্তু সুন্নাত হল, নির্ধারিত স্থান থেকে দেওয়া।

এখন আমাদের হাজি সাহেবরা প্লেনে যান। সব দেশের হাজি। প্লেনে যেতে গেলে কাপড় চেঞ্জ করা যায় না। গোসল করা যায় না। ওযু করা যায় না। এজন্য আমাদের উচিত হল, প্লেনে উঠার আগেই আমরা ইহরামের পূর্ণ প্রস্তুতি নেব। ইহরামের পোশাক পরব। কিন্তু ইহরামের নিয়ত করে 'লাব্বাইক' বলব যখন প্লেন মীকাতের কাছে যাবে। প্লেনে ঘোষণা দেবে আমরা কিছুক্ষণ পরে মীকাত অতিক্রম করব। ওই সময় আমরা 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা...' নিয়তটা করে তালবিয়া শুরু করব। আর এ তালবিয়ার জন্য ওযু শর্ত নয়। কাজেই আমরা ওযু করে রেডি হয়ে প্লেনে উঠব এবং মীকাতের কাছে গিয়ে তালবিয়া দেব।

২. সহীহ বুখারি, হাদীস-১৫২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১১৮১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৭৩৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৬৫৮।

এটাই সুন্দর এবং সুন্নাতের নিকটবর্তী। এবং এটা নিরাপদ। আপনি ইয়ারপোর্টে ইহরাম করে বেরিয়েছেন। তিন ঘণ্টা প্লেন লেট হল। পরের দিন প্লেন যাবে। আপনাকে ইহরাম করে বসে থাকতে হবে। ইহরাম করে বসে থাকা মানেই... যেকোনো সময় নখ চুল কামড়ে ফেললেন, কেটে ফেললেন। চুলকালেন। আপনার জন্য কাফফারা জরুরি হয়ে যেতে পারে।

[ইহরাম তো মীকাতে গিয়ে করতে হয়। তাহলে বিভিন্ন দেশে প্লেনে ওঠার আগে করার নিয়ম হল কেন? - উপস্থাপক]

এটার প্রধান কারণ মীকাতে প্লেন থামে না। চলে যায়। আর প্লেনের ভেতর কাপড়চোপড় পাল্টানো যায় না। এজন্য বাধ্য হয়েই আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। এখানে দুটো বিষয়। মীকাতের আগে পোশাক পরা। আমরা সালাত আদায়ের জন্য পাঞ্জাবি পরে টুপি মাথায় দিই। এটা সালাত না। 'আল্লাহু আকবার' বলাটা সালাত শুরু। ঠিক ইহরামের কাপড় পরব, পূর্ণ প্রস্তুতি নেব। কিন্তু আল্লাহু আকবার বলব মীকাতের কাছে গিয়ে। এটা উত্তম, এটা নিরাপদ। আমাদের ইহরামের সময় কমে গেল। ইহরাম ভঙ্গ হওয়ার ভয় কমে গেল।

[অনেকেই বলে থাকে, ইহরাম বা তালবিয়াটা পড়ার পর দু'রাকআত শুকরিয়া সালাত আদায় করতে হয়। বিমানে তো সেটাও করা যায় না। - উপস্থাপক]

প্রথম কথা হল তালবিয়ার জন্য সালাত, এটা হাদীসে-সুন্নাতে পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইহরামের জন্য সালাত পড়েছেন ,এটা পাওয়া যায় না। তিনি ফরয সালাতের পরে ইহরাম করেছেন, এটা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেটা করেছেন– তিনি যুহর পড়ে যুলহুলাইফা গিয়েছেন। আসর পড়েছেন। মাগরিব পড়েছেন। ইশা পড়েছেন। ফজরের সালাত আদায় করে সালাতের পরে তিনি তালবিয়া করেছেন। কিন্তু তালবিয়ার জন্য স্পেশাল নামায পড়েছেন, এটা সুন্নাত পাওয়া যায় না। আর যদি কেউ পড়তে চান, একবারে ওযু করে, গোসল করে, এহারাম করে দুই রাকআত নামায পড়ে তিনি প্লেনে উঠে পড়লেন। কিন্তু তালবিয়া বলাটা, লাব্বাইক বলাটা শুরু করা উচিত মীকতের কাছে গিয়ে। এটা নিরাপদ

এবং সুন্নাতের নিকটবর্তী।

জিজ্ঞাসা: ৪০

আমি তো হজ্জ করতে যাচ্ছি। হজ্জের একটি বিষয়ে আমি জানতে চাই। সেটি হল, নয় জিলহজ্জ আরাফাত ময়দানে তো অবস্থান করা প্রত্যেক হাজির জন্য খুব জরুরি একটি কাজ। ফরয একটি কাজ। কোনো হাজি সাহেব যদি ওইদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন, যে, তিনি যেতে পারছেন না। হয়ত অনেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তার হজ্জটা কীভাবে হবে?

জবাব:

জি, আরাফাতের মাঠে থাকা হজ্জের মূল ফরয কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اَلْحَجُّ عَرَفَاتٌ.

আরাফাতে অবস্থান-ই হজ্জ।[৩] তবে এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সহজ করেছেন। সচেতন-অচেতন, ঘুমন্ত, হাসপাতলে, অ্যাম্বুলেন্সে যেকোনো অবস্থায় আরাফাতের দিন যুহরের পর থেকে আরাফাতের রাতে ফজরের আগ পর্যন্ত যেকোনো সময়ের ভেতরে যদি একজন অন্তত গাড়িতে করে, অ্যাম্বুলেন্সে করে হলেও অচেতন অবস্থায় হলেও আরাফাত থেকে ঘুরে আসেন তাহলে তার হজ্জ হয়ে যাবে। এজন্য যদি কোনো দর্শক হজ্জে গিয়ে এমন অসুস্থ হন তাহলে সাধারণত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটা ব্যবস্থা করে। তারা অসুস্থ হাজিদেরকে এম্বুলেন্সে অথবা যেকোনোভাবে আরাফাত ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। আর আমাদের তত্ত্বাবধানে থাকলে এটা করতে হবে। এটা নয় জিলহজ্জ তারিখের যুহরের পর থেকে শুরু করে ওই দিনগত রাত, অর্থাৎ দশই জিলহজ্জ রাতের ফজরের আগ পর্যন্ত। এর ভেতর অর্থাৎ দিনের বাকি অংশ, পুরো রাতের ভেতরে যেকোনো সময় আরাফাতের বাউন্ডারির ভেতরে এক সেকেন্ডের জন্য গেলেও হজ্জ হয়ে যাবে।

---

৩. সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯৭৫; সুনান দারিমি, হাদীস-১৯২৯; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৩৮৯২।

জিজ্ঞাসা: ৪১

অনেক হাজি সাহেবরা বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে মক্কাতে হজ্জ করতে যান। বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি হাজিদেরকে নিয়ে তারপরে তারা ছেড়ে দেয়। হয়ত কোথাও একটা উঠিয়ে দিল। এরপরে আর খোঁজখবর নিচ্ছে না। তারা টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই অবস্থাতেই এজেন্সিগুলো টাকা নিয়ে খাচ্ছে। এটা কোন ধরণের অপরাধ হচ্ছে?

জবাব:

এই অপরাধ বুঝতে তো আমাদের শরীআহ লাগে না, মাসআলা লাগে না। ফাঁকি দিয়ে খাওয়া যে অপরাধ আমরা সবাই জানি। এখানে মূল সমস্যা হাজি সাহেব নিজে। হাজি সাহেব নিজেই একটা সমস্যা। হাজি সাহেব হজ্জে যাবেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّمَا أَجْرُكِ فِيْ عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ ...وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ.

আয়িশা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমার হজ্জ এবং তোমার উমরাহয় সাওয়াব হবে তোমার কষ্ট ও তোমার ব্যয় অনুসারে।[৪] হজ্জ তো যাদের টাকা আছে তাদের জন্য। আপনার টাকা না থাকলে হজ্জ করবেন না। আপনার উপর ফরয নয়। যখনই হাজিরা কম টাকার প্যাকেজ খুঁজতে যান, যখন যত কম টাকা ততো অবিশ্বস্ততা। বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য বড় প্রতিষ্ঠানগুলো, যাদের বিশ্বস্ততা আছে, তাদের সাথে যোগাযোগ করা। দ্বিতীয়ত, যদি এই ধরনের কিছু হয়, তাদের আইনি আশ্রয় নেওয়া। এটা চেষ্টা করতে হবে।

এটা বড় অন্যায়। ভয়ঙ্করতম অন্যায়। আর এই অন্যায় যারা করে তাদের অন্যায়টা তো গা-সওয়া হয়ে গেছে। তারা কুরবানির টাকা মেরে দেন। হাজিদেরকে না খাইয়ে রেখে দেন। না খেয়ে থাকলে সাওয়াব বেশি থাকবে, এই ওয়ায করেন। নানাভাবে হাজিদের সাথে প্রতারণা করেন। আর এই জন্য হাজিদের নিজেদের অসচেতনতাও পেছনে দায়ি। তারা মক্কাতে গিয়েও কিন্তু এই অফিসে অভিযোগ করতে পারেন। মক্কা শরীফ,

৪. সহীহ বুখারি, হাদীস-১৭৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১২১১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৪১৫৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১৭৩৪; ইবনুল মুলাক্কিন, আল বাদরুল মুনীর ৯/৫০৭।

মদীনা শরীফে বাংলাদেশ সরকারের হজ্জ অফিস আছে। এবং সৌদিদের হজ্জ অফিস আছে। সেখানে গিয়ে অভিযোগ করলে এদের ধরা হবে।

জিজ্ঞাসা: ৪২

হাজি সাহেবরা মক্কা মদীনাতে যান। অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে, মদীনায় গিয়ে কমপক্ষে ৪০ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে বা ৮ দিন থাকতে হয়। এটা জরুরি কি না?

জবাব:

আসলে এই বিষয়ক হাদীসটা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে এটা যয়ীফ। যে, মদীনার মসজিদে নববিতে যদি কেউ তাকবীরে উলা'সহ ৪০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে মুনাফিকি থেকে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। হাদীসটি অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে যয়ীফ, অনির্ভরযোগ্য, অগ্রহণযোগ্য। কেউ কেউ হাসান বলেছেন।[৫] বাস্তব বিচারে বিষয়টা খুবই দুর্বল। প্রথমত মক্কা শরীফে সালাত আদায় করলে অনেক বেশি সাওয়াব। মদীনায় সে হিসাবে অনেক কম সাওয়াব।

দ্বিতীয়ত, সাহাবি তাবিয়ি তাবি-তাবিয়ীনের যুগে এভাবে আটদিন সেখানে থাকার কোনো নিয়ম পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, মদীনার মসজিদে নববি যিয়ারত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কবর শরীফে সালাম দেওয়া, ওহুদ ইত্যাদি জিয়ারত করা– এগুলো হল মূল ইবাদত। সেখানে আটদিন বসে থাকার ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই। হাদীসে নেই, এটাকে রীতিতে পরিণত করা ঠিক নয়। সর্ব অবস্থায়, যদি আমরা এটাকে মেনেও নিই যে, হাদীসটা গ্রহণযোগ্য, এটা একটা নফল ইবাদত। এটা জরুরি নয়। এবং না করলে হজ্জের কোনো ক্ষতি হবে না।

এই চিন্তাটা করা ঠিক নয়। তারপরও যেটা ঘটে আমরা দেখেছি। যেহেতু মদীনায় ৮ দিন থাকতে হবে, কাজেই শুধু সালাত আদায় করা। মানুষ সময় ব্যাপক নষ্ট করে। সালাতের পরে অন্যান্য ইবাদত না করে মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে বেড়ায়। এখানে কাজ তো শুধু সালাত আদায় করা। এর

---

৫. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১২৫৮৩; মাওলানা আবদুল মালেক, প্রচলিত ভুল, পৃ. ১৬৩।

বিপরীতে একটা সহীহ হাদীস এসেছে। হাদীসটা হল, যদি কেউ ৪০ দিন তাকবীর উলা'সহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতে আদায় করে। নিজের বাড়িতে অথবা যেকোনো জায়গায়। তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে মুনাফিকি এবং জাহান্নামি থেকে মুক্তি দান করেন।[৬] তাহলে পাঠক আমরা নিজের বাড়িতেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতে আদায়ের চেষ্টা করি। একটানা যদি আমরা ৪০ দিন করতে পারি বরকতটা পেয়ে যাব।

মদীনা শরীফে যাওয়া একটি পৃথক ইবাদত। অর্থাৎ মদীনার মসজিদে সালাত আদায় করা পৃথক ইবাদত। হজ্জের সাথে নয়। তবে দূরের মানুষেরা যেহেতু বারবার যেতে পারেন না, হজ্জের সময় যেতে হয়, এটাতো কোনো সমস্যা নয়। তবে সেখানকার ইবাদতগুলো সীমিত। মদীনার মসজিদে নববিতে সালাত আদায় করা, যতটুকু পারি। মদীনায় মসজিদে নববির সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কবর শরীফে সালাম দেওয়া। বাকি' গোরস্থান, ওহুদ যিয়ারত করা। কুবায় সালাত আদায় করা। এগুলো মদীনা শরীফের মাসনূন ইবাদত। এগুলো হওয়ার পরে সেখানে সুযোগ পেলে থাকব না হলে না থাকব। এটা কোনো ব্যাপার না।

৬. সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৪১।

হালাল/হারাম

জিজ্ঞাসা: ৪৩

আমেরিকাতে মেশিনের মাধ্যমে একটি সুইচ টিপে একই সাথে অনেকগুলো মুরগি জবাই করা হয় বা বিভিন্ন প্রাণি জবাই করা হয়। এটা বৈধ হবে কি না?

জবাব:

জি, আল্লাহ কুরআন কারীমে সূরা মায়িদার প্রথম দিকে বলেছেন:

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ.

যে সমস্ত শিকার প্রাণি– শিকারি বাজ, শিকারি কুকুর যদি আল্লাহর নামে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা যে শিকার ধরে নিয়ে চলে আসে। সে শিকার তারাই কামড় দিয়েছে। তাতেই রক্তপাত হয়ে মারা গিয়েছে। ওটা খাওয়া যাবে।[১] ওটা 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করার বিধানে থাকবে। তীর যদি মারা হয় 'বিসমিল্লাহ' বলে এবং সেটা প্রাণির রক্তপাত করে। যদি ওটা হাতে পাওয়ার আগেই মারা যায় তবে ওই রক্তপাতে ওটা বৈধ। খাওয়া যাবে। তো এইজন্য, এটারই একটা আধুনিক বিষয় হল একটা তীরের বদলে একটা সুইচের মাধ্যমে তীরের মতো একটা ছুরি গিয়ে অনেকগুলো প্রাণিকে জবাই করে। কাজেই যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে সুইচ টেপা হয় বা সুইটা ছেড়ে দেওয়া হয়, ছুরিটা চালিয়ে দেওয়া হয় মেশিনের মাধ্যমে, এবং সেটা একসাথে অনেকগুলো প্রাণিকে জবাই করে, এটা বৈধ হবে।

---

১. সূরা: [৫] মায়িদা, আয়াত: ৪।

জিজ্ঞাসা: ৪৪

বিভিন্ন জায়গায় আধুনিক দোকানগুলোতে দেখা যাচ্ছে গরুর গোশত অথবা মুরগির গোশত– ওটার উপরে হালাল লেখা থাকে। অন্যান্য পণ্যের উপরও হালাল লেখা থাকে। এ বস্তুগুলো যেখান থেকে এসেছে সেটা কতটুকু হালাল হবে, এ ব্যাপার আমরা জানি না। তো সেটা আমরা কীভাবে গ্রহণ করতে পারি?

জবাব:

এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, কোনো মুসলিম যদি জবাই করে তাহলে আমরা ধরে নেব এটা হালাল। যদি কোনো মুসলিম দেশ থেকে এ পণ্যগুলো আসে, আমরা ধরে নেব এটা হালাল। আমাদের আর সন্দেহ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অমুসলিম দেশগুলো থেকে হালাল লেখা যে পণ্যগুলো আসে, এই ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ থাকে। এজন্য কোনো নির্ভরযোগ্য কোম্পানি, সংস্থা, ইসলামি সংস্থা রিকমেন্ড (জায়েজ) না করলে, এগুলো এভোয়েড করাই উত্তম। কারণ বর্তমানে আধুনিক জবাই ব্যবস্থা;... ইলেকট্রিক শক দিয়ে হত্যা করা হয়। এটা বহুল প্রচলিত।

একমাত্র ইয়াহুদিরা জবাইয়ের ব্যাপারে সচেতন। তারা 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই ছাড়া খান না। খ্রিস্টানদের ভিতরে এই ব্যাপারে অনেক অবহেলা রয়েছে। অনেক দেশেই ইলেকট্রিক শক দিয়ে জবাই করা হচ্ছে। এরকম হালাল লেখা প্রাণি;... আমার এক আত্মীয় চিনে মেডিকেল সাইন্সে পড়ছেন, তিনি বললেন, হালাল দেখে মুরগি কিনে আনলাম। পুরো গলাটা-ই রয়েছে। গলায় কাটার কোনো দাগ নেই। গলাসহ-ই রয়েছে। তার মানে ইলেকট্রিক শক দিয়ে হত্যা করে ওপরে হালাল লেখে দিয়েছে। এজন্যই সবক্ষেত্রে মুসলিম দেশ থেকে আমদানি করা পণ্য হলে সমস্যা নেই। মুসলিম দেশের, বাংলাদেশের পণ্যে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অন্যান্য দেশ থেকে আসলে কোনো সংস্থার রিকমেন্ডেশন ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখা উচিত। ইলেকট্রিক শক দিয়ে যেটা জবাই করা হচ্ছে সেটাতে তো রক্তপাত হচ্ছে না। ওটাতো শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হচ্ছে। এটা দ্বারা বৈধ হবে না।

জিজ্ঞাসা: ৪৫

ইয়াহুদিদের দেশে অনেক জিনিসের উপরে হালাল লেখা থ. .ক। উনাদের দেশে আমদানি হয়। সে ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণ করতে পার । কি না?

জবাব:

ইহুদিরা শরীআত পালনে খুবই কঠোর। ধর্ম পালনে তাদের কোনো লিবীয়, অর্থাৎ হারুনের বংশধর ছাড়া কেউ জবাই করবে না। এবং ইয়াহুদিদের বাস্তবতা হল, আমরা হয়ত জানি না তাই, ৩২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপে আমেরিকায় ইয়াহুদিরা অত্যন্ত মযলুম ছিল। বর্তমানে মুসলিমদের যেভাবে বাঁকা চোখে দেখা হয়, যে, আমাদের জাতিরা মুসলিমদের সাথে থাকতে চায় না। মুসলিমদের ঢুকতে দিয়ো না। ঠিক একইভাবে ইউরোপ-আমেরিকার মানুষেরা ইয়াহুদিদেরকে অত্যন্ত ঘৃণা করেছে। এটার একটা বড় কারণ ছিল ইয়াহুদিরা ওই ইউরোপীয় সমাজের সবকিছু মেনে নেয় নি। তারা তাদের নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার, ধর্ম-শরীআত পালন করার চেষ্টা করেছে।

তার একটা হল জবাই। ইয়াহুদিরা কখনো কোনো খ্রিস্টানদের জবাই খাবে না। এমনকি তাদের নির্ধারিত স্লটার হাউজ (যবাইখানা) থেকে ছাড়া। ইয়াহুদিদের স্লটার হাউজ সবদেশেই আছে। এর বাইরে খাবে না। এজন্য যদি ইয়াহুদিদের জবাই করা নিশ্চিত হয় তাহলে এটা খাওয়া যেতে পারে, ইয়াহুদিদের দেশ থেকে আগত অথবা ইয়াহুদিদের জবাই করা। ইউরোপের সকল দেশেই আছে। ইয়াহুদিদের স্লটার হাউজ আলাদা আছে। ওরা আল্লাহর নামে জবাই করে। শরীআত পালনের ব্যাপারে এরা অনমনীয়। কিন্তু খ্রিস্টানরা আল্লাহর নামে জবাই করে না। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, যদি আহলে কিতাব– ইয়াহুদি-খ্রিস্টান, আল্লাহর নামে জবাই করেন, তাদের জবাই খাওয়া যায়।[২]

জিজ্ঞাসা: ৪৬

কুরবানির হাটে পশু বিক্রির সময় দালাল থাকে। এদের মাধ্যমে গরু

---

২. সূরা: [৫] মায়িদা, আয়াত: ৫।

কিনতে হয়। যারা এই দালালি করছেন, এদের যে ইনকামটা হয় এই টাকাটা বৈধ কি না?

জবাবঃ

দালালি দুই রকমের। একটা হল পরিশ্রম করে। তিনি পরিশ্রমের জন্য একটা কমিশন নিচ্ছেন। এটা বৈধ। আরেকটা হল দালালের মাধ্যমে দাম বাড়ান। এটা হাদীস শরীফে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ দালালি করে একজনকে দিয়ে দাম বাড়িয়ে দেওয়া। দাম বৃদ্ধির জন্য যে দালালি, এটা ইসলামে নিষিদ্ধ হারাম। আরেকটা হল দালালি নয় কমিশন। আপনি কিনতে পারছেন না। আপনি যেতে পারছেন না বাজারে। আপনার পক্ষ হয়ে তিনি কিনে দিলেন। তিনি কেনার দামটা সত্য বলবেন। আপনার পক্ষ থেকে তাকে একটা পারিশ্রমিক আপনি দেবেন। এটা, বর্তমান সমাজে বাড়িভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে, বাড়িভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে যে অফিসগুলো থাকে, অফিসগুলো কমিশন নিতে পারে।

জিজ্ঞাসা: ৪৭

কুরবানির হাটে অনেক সময় পশু ক্রয়-বিক্রয়ের একটা হাসিল (রশীদ) দিতে হয়। জমি বিক্রয় করেন অথবা অন্য কোনো জিনিস ক্রয় করেন তাতেও দিতে হয়। সেক্ষেত্রে যার কাছ থেকে কিনছেন তিনি হয়ত ৫০ হাজার টাকায় কিনছেন। কিন্তু বলছেন, আপনি একটু কম বলবেন যেন হাসিলটা কম দিতে হয়। উনি বলে দিচ্ছেন ৩০ হাজার টাকা। এভাবে করে কুরবানির হাট থেকে হাসিল ফাঁকি দেওয়া– এটা কতটুকু বৈধ?

জবাবঃ

প্রথমত মিথ্যা তো মিথ্যাই। কোনো অবস্থাতে মিথ্যা বৈধ না। সেখানে বললেন যে ৩০ হাজার টাকা, এটা তো মিথ্যা বললেন। এই মিথ্যা বলাটা বৈধ হল না। আর যারা হাসিল নেন তারা সাধারণত সরকার থেকে ইজারা নেন। বৈধভাবে এটা নেওয়া হয়। কাজেই তাদের পাওনাটা ফাঁকি দেওয়া হল। আর যদি যুলুম করেও নিয়ে থাকে তাহলেও মিথ্যা বলাটা এজন্য বৈধ নয়। ইজারাদার যদি কোনো অন্যায় করেও নিয়ে থাকেন, আমি

মিথ্যা বলতে পারি না। সত্য বলে কমানোর চেষ্টা করতে পারি। আর তার যে আইনগত... যিনি ইজারা নিচ্ছেন সরকার তাকে একটা আইন দিয়েছে, হাজারে এত টাকা, এটা তার বৈধ পাওনা। এভাবেই তিনি ব্যয় করছেন, হাটটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছেন। তার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে তাকে ফাঁকি দেওয়া অন্যায়। আর সর্বোপরি মিথ্যা বলা মিথ্যাই। মিথ্যাটাকে আমরা বৈধ বলতে পারব না।

দুআ/আমল

জিজ্ঞাসা: ৪৮

শিশুরা অসুস্থ হলে কী কী দুআ পড়তে হয়?

জবাব:

শিশুরা অসুস্থ হলে..., দর্শকের যদি সুযোগ থাকে আমাদের **রাহে বেলায়াত** বইটা পড়বেন। রাহে বেলায়াত বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় পুরোটাই দুআর উপরে– অসুস্থতার জন্য রাসূল (ﷺ) কী দুআ পড়তেন, সকাল-সন্ধ্যায় কী দুআ পড়বেন। তবে স্বাভাবিকভাবে কয়েকটি বিষয়, মাবাবা ছোটবেলায় দুআ পড়বেন। রাসূল (ﷺ) এর সাহাবায়ে কিরাম বাচ্চাদের শেখাতেন। রাসূল (ﷺ) হাসান হুসাইনকে বলতেন:

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

আমি তোমাদের দুজনকে আল্লাহর আশ্রয়ে রাখছি, আল্লাহর পরিপূর্ণ আশ্রয়ে রাখছি, শয়তান এবং বদ নযর থেকে এবং সকল কীটপতঙ্গ থেকে।[১] এই দুআটা সকালসন্ধ্যা পিতামাতা তার সন্তানদের জন্য পড়তে পারেন। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল (ﷺ) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) কে শিখিয়েছেন। দুআটি হল:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ.

---

১. সুনান তিরমিযি, হাদীস-২০৬০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৭৩৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৫২৫; সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৩৭১।

এই দুআটা তিনি পড়তেন। বাচ্চাদের শেখাতেন এবং বাচ্চারা পড়ত।[২] এজন্য আমরা নিজেরা পড়ব। এছাড়া ঘুমানোর সময় সকালে-সন্ধ্যায় যে আয়াতুল কুরসি, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাক, কুল আউযূ বি-রাব্বিন নাস– এগুলো পড়ে পড়ে তাদের আমরা ফুঁ দিতে পারি।

জিজ্ঞাসা: ৪৯

জিলহজ্জ মাসের ফযীলত কী বা এই মাসে আমরা কী করতে পারি? সে সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন!

জবাব:

আমাদের বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে অনেকগুলো ফযীলতের দিন সম্পর্কে সচেতনতা আছে। বাঙালি সমাজগুলোতে আমরা, যে দেশেই বাস করেন না কেন, রমাযান, শাবান, মুহাররম ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন। তবে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের বিষয়ে আমরা অনেকে অত সচেতন নই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ .

মানুষের জীবনের ৩৬৫ দিনে যতদিন আছে, যেদিনে ইবাদত করলে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন, সবচেয়ে বেশি সাওয়াব দেন, সেদিনগুলো হল জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন। এর চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, বেশি ভালো দিন আর নেই।[৩] এই দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে এবং সাহাবায়ে কিরামগণ বেশিবেশি ইবাদত করতেন। এর ভেতর একটা হল সিয়াম– নফল রোযা, এক তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে এসেছে, এই প্রতিটা দিন এক বছরের সমান ফযীলত। দিনের ভেতর এগুলো সর্বোত্তম। রাতের ভেতরে শবে কদর সর্বোত্তম। এছাড়াও অন্যান্য ইবাদাতের ভেতরে রয়েছে যিকির, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াত। এগুলো বেশিবেশি করে এই দিনগুলোতে করা। প্রথম দশদিনে করা। এটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার অনেকগুলো

২. সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৮৯৩।

৩. সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৪৩৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৭৫৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৭২৭।

হাদীসে বলেছেন, এই দশদিনে নেক আমল করলে আল্লাহ যত খুশি হন এবং যত বেশি সাওয়াব দেন অন্য কোনোদিনে তা দেন না।

হাজি সাহেবেরা এই দশদিন হজ্জে যান। তারা যতটুকু সম্ভব পালন করবেন। সম্ভব হলে রোযা রাখবেন। আর হাজি সাহেবরা তো এমনিতেই ইবাদতের ভেতরে থাকেন। তবে হাজি সাহেবদের যেটা সমস্যা হয়, সেটা হল, আমরা মানুষ, অবসর পেলে পাপ করে ফেলি। যারা হজ্জে যান তারা সাধারণত ব্যস্ত মানুষ। বিগত বিশ, ত্রিশ বছরে তারা অবসর পান নি। কর্ম-কর্ম-কর্ম। হজ্জে গিয়ে অবসর পেয়ে যায়। তারা হয়ত দুই তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা তাওয়াফ করেন। অথবা সাঈ করেন। অথবা ইবাদত-বন্দেগি করেন। বাকি সময় অবসর। তখন তারা অন্তত ১০ জনে বসে কথাবার্তা শুরু করেন। আর তখন শুরু হয় গীবত। পরের সমালোচনা। গালাগালি। অথবা টেলিভিশন দেখতে বসে। কারণ এখন মক্কায়ও প্রতি ঘরে টেলিভিশন। ওয়েটিং রুমে টেলিভিশন। ...ইত্যাদি দেখতে শুরু করে দেন। এটার মাধ্যমে তারা অনেক পাপ কামাই করে ফেলেন। এজন্য, যিলহজ্জ মাসের এই দশদিন হাজি সাহেবদের জন্য সবচেয়ে বরকতের সময়। তারা প্রতিটা মুহূর্ত ইবাদতে কাটানোর চেষ্টা করবেন।

জিজ্ঞাসা: ৫০

আমাদের অনেক কাছের কেউ যদি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তার জন্য আমাদের কী করণীয়? কোনো আমল আছে কি না?

জবাব:

আসলে আমল নিজে করতে হয়। যে ব্যাক্তি নেশাগ্রস্ত, তিনি যদি নেশাকে খারাপ জেনে মুক্ত হতে চান তার জন্য অনেক আমল আছে। আমরা যারা বাইরে তারা শুধু দুআ করতে পারি। এমনি আল্লাহর কাছে আম দুআ করব, আল্লাহ তাদেরকে ভালো করে দাও, নামাযের সিজদায়, নামাযের পরে আল্লাহ তাআলার ইসমে আ'যমগুলো পড়েপড়ে, বেশিবেশি দরুদ পড়ে, যে সমস্ত দুআ করলে দুআ কবুল হয়, ওই সমস্ত কর্মগুলো করে আমরা দুআ করতে পারি। এছাড়া খাস কোনো দুআ নেই।

বিবাহ/তালাক/দাম্পত্য

জিজ্ঞাসা: ৫১

আল্লাহ তাআলা বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো বয়স নির্ধারণ করেন নি। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানে ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং মেয়েদের জন্য ১৮ বছর নির্ধারণ করেছে। কেউ যদি এটা লঙ্ঘন করে সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করল। এটা থেকে বাঁচার জন্য কেউ যদি জন্ম নিবন্ধনে বয়স কমিয়ে দেয়, এটা ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন হবে?

জবাব:

জন্ম নিবন্ধনে বয়স কমানো, এটা মিথ্যা। আমরা কোনো মিথ্যাকে সত্য বলব না। ১৮/২০ বছর বয়সে বিবাহ আসলে সমস্যা না। বাস্তবে আমাদের দেশে বিবাহ অনেক পরে হচ্ছে। সরকার যে আইনটা করেছেন, খুব একটা ভালো করেন নি। সরকারের একটা প্রস্তাব উঠেছিল মেয়েদের বয়স ১৬ করা। এটা ছিল যৌক্তিক বয়স। তোমরা জান, মেডিসিনের ক্ষেত্রে যেটা ইউরোপে কাজ করে সেটা এশিয়ায় কাজ করে না। অর্থাৎ সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ইউরোপের জন্য যেটা ফিট করে আমাদের জন্য সেটা ফিট নাও করতে পারে। কিন্ত আমাদের দেশের সমাজ বিজ্ঞানী, রাষ্ট্র, রাজনৈতিকরা ইউরোপের ওষুধগুলো হুবহু আমাদের খাওয়াতে চায়। যাতে অনেক সময় রোগ বেড়ে যায়। ইউরোপে বিবাহের জন্য বিভিন্ন রকম নিয়মকানুন করেছে। ইউরোপ কিন্তু অনেক বিষয়ে উন্নত। একটাতেই শেষ হয়ে গেছে। যেটা মৌলিক। ক্রনিক ক্যান্সার। সেটা হল পরিবার নষ্ট হয়ে যায়। আগামী ১০০ বছরের মধ্যে ইউরোপ ধ্বংস হবেই। কারণ ইউরোপে মানুষই থাকবে না।

আমি অনেক আগে এন্ড অফ ইউরোপ নামে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম। ফ্রেন্ডস অফ ইউরোপ নামে একটি এনজিও লেখেছিল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রকাশ করেছিল। তারা বলছে, ইউরোপের দেশগুলো ওয়েলফেয়ার স্টেট। তারা নাগরিকদের যে সেবা দেয়, আমেরিকা কিন্তু সেই সেবা দেয় না। ৫৫ বছর বয়সেই এরা রিটায়ার করে। রিটারমেন্ট থেকে মরণ পর্যন্ত সকল খরচ সরকার দেয়। এখন রিটায়ারমেন্টের বয়স কমানো হয়েছে। রিটার্ড জীবিতদের আয়ু বাড়ছে। রিটায়ার করা মানে সে জামাই হয়ে গেল। মরণ পর্যন্ত তাকে জামাই আদর করতে হয়। জামাইয়ের খরচ কে চালাবে। ছেলে চালাবে। নতুন চাকরিতে যারা যাবে। প্রায়ই ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স নেয়া হয়। ট্যাক্সের টাকা দিয়ে জনগণের কল্যাণ করা হয়। জামাইয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ছেলের সংখ্যা দ্রুত কমছে। এতে অর্থনীতি আহত হচ্ছে। শিল্প কলকারখানায় লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরে থেকে লোক নিতে হচ্ছে। এভাবে চললে অর্থনীতি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এভাবে ইউরোপ মানুষের অভাবে জনশূন্য হয়ে যাবে। এইতো, কমা যখন অব্যাহত থাকবে, তখন দেখা যাচ্ছে ১০ লাখ ৫০ বছরের মাথায় ১০০০০ হয়ে যাবে। যে কারণে, পাশ্চাত্য সভ্যতা সব ভালোর পাশাপাশি খারাপ হয়েছে, সেই অশ্লীলতা বেহায়াপনা পারিবারিক বন্ধন নষ্ট করার সেই বিষয়গুলো আমাদের সমাজে ঢুকানো হচ্ছে।

বাল্যবিবাহ খারাপ, এটা যেমন ঠিক, আর 'বাল্যবিবাহ বলতে ১৮ বছর পর্যন্ত বিয়ে বন্ধ রাখা এটা ভুল' এটাও ঠিক। ভালো বলতে আমাদের সমাজে কী বোঝানো হয়? রবীন্দ্রনাথ, লিও টলস্টয়, বিশ্বের যত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, আইনস্টাইন, তাদের মায়েরা কি আঠারোর পরে বিয়ে করেছেন, না আগে বিয়ে করেছেন? সবাই বাল্যবিবাহের সন্তান। আঠারোর আগে বিয়ে হলে সন্তান অসুস্থ হয়! তার মানে অসুস্থরা এইসব হয়েছে। নোবেল প্রাইজ সব অসুস্থরা পায়। সুস্থরা পায় না। বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিক জন্মাচ্ছে না, লিও টলস্টয়ের মতো সাহিত্যিক জন্মাচ্ছে না, আইনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিক জন্মাচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক কবি দার্শনিক সাহিত্যিক অসুস্থদের সন্তান হতে হবে!

তোমাদের দাদিরা অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন। যাদের বয়স ৭০, ৮০, ৮৫, ৯০। এরা এখনো মোটামুটি ভালো সুস্থ আছেন। বিশেষ করে

তাদের এনার্জি অনেক বেশি। বাসায় মেহমান আসলে তারা রান্নাবান্না করার জন্য অস্থির হয়ে যান। পাশের বাড়ি লোক আসলেও খোঁজ নেয়। তোমাদের চেয়ে একটু উঁচু প্রজন্মের যারা, বিয়ে-শাদি করেছে, দেখবে একটা বা দুইটা বাচ্চা, অসুস্থতার শেষ নেই। মাথাব্যথা, শরীর মোটা হয়ে গেছে। বাড়িতে মেহমান তো দূরের কথা, নিজের স্বামীর জন্য রান্না করতে মন চায় না। রান্না করতে পারব না, কিনে আনেন। তাহলে তারা যে বলে, আঠারোর আগে বিয়ে হলে মা অসুস্থ হয়, সন্তান অসুস্থ হয়...। বিজ্ঞান কী বলে, তা আমরা জানি না। আমরা খোলা চোখে দেখছি, কথাটা মিথ্যা।

আমাদের সমাজে মেয়েরা ২৫ এ বিয়ে করে। আর ছেলেরা ৩০। আমাদের দেশের থিওরি হল, বিবাহ কে 'না' বলুন, ব্যভিচারকে 'হাঁ' বলুন। বিভিন্নভাবে ব্যভিচারকে সহজ করে দেয়া হচ্ছে। আর বিভিন্নভাবে বিবাহকে কঠিন করে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে বিবাহের আগেই ছেলেমেয়েরা ব্যভিচার করছে। এরপরে যখন বিবাহ করে আর ভালো লাগে না। কারণ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কেউ কারোর দায় নেয় না। আর বিবাহের ক্ষেত্রে একজন আরেকজনের রাগ শুনতে হয়। তখন মনে করে সেই তো ছিল ভালো। পরিবার জমে না। মারামারি কাটাকাটি হয়। তালাক হয়ে যায়। এভাবে ঠিক ইউরোপের মতোই এবং তার চেয়ে অনেক দ্রুত চলে যাব। আমাদের সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ধরনের নিয়ম কানুনও হুবহু চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এজন্য ভালো হত ১৬ বছর, মেয়েদের জন্য ভালো। ছেলেদের জন্য ২০ বছর খারাপ না, এই ধরনের কোনো আইন করলে। শরীআত অনুযায়ী এর আগে যদি কেউ বিবাহ করে তা বৈধ। যদি রাষ্ট্রীয় সুযোগ থাকে, এটাকে বলে মাসালেহ মুরসালা। যে ক্ষেত্রে জনগণের ব্যবস্থাপনা দরকার, সে ক্ষেত্রে আইন করতে পারে। আইন করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো তাদের বিবেচনা করার দরকার ছিল। এক্সেপশন (ব্যতিক্রম) রাখার দরকার ছিল। কারণ এর আগে বিয়ে করার দরকার হতে পারে। এর জন্য আমরা মিথ্যা বলাকে বৈধ বলব না। মিথ্যা মিথ্যাই।

জিজ্ঞাসা: ৫২

আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার তিন নাম্বার আয়াতে বলেছেন:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...

তোমরা তোমাদের পছন্দমতো ২/৩ অথবা ৪ জন নারীকে বিবাহ করো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এখানে নির্দেশ দিয়েছেন, ২/৩ অথবা ৪ জন নারীকে বিবাহ করার জন্য। যদি কোনো ব্যক্তি একটা বিবাহ করেন তাহলে এই আয়াতের উপর আমল করা হবে কি?

জবাব:

যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি অনুবাদ পড়ার কারণেই প্রশ্নটা করেছেন। আরবি বাক্যশৈলী জানলে তোমরা বুঝতে, কোনো শর্তের পর যখন আমর [আদেশসূচক ক্রিয়া] আসে, এটা ইবাহাতের [বৈধতার] জন্য, আমরের [নির্দেশ] জন্য না। কুরআনে অনেক জায়গায় আমর আছে। যেমন আল্লাহ তাআলা আমর করেছেন, তোমরা যখন ইহরাম থেকে হালাল হবে তোমরা শিকার করো। শিকার করা ফরয? সুন্নাত? ওয়াজিব? কিছুই না। এই রকম নির্দেশ কুরআনে অগণিত আছে। যখন কোনো একটা শর্তের পরে আদেশ করা হয় তখন এটা মূলত ইবাহাতের জন্য। 'তোমাদের জন্য বৈধ করা হল'। এখানে আমর বলতে ইবাহাত। যেটা শরীআতের পরিভাষা। যেমন আমাকে কাপটা দিন। এটা আদেশ হতে পারে, অনুরোধ হতে পারে, অনুমতিও হতে পারে। তুমি এটা শুনেই বলতে পার না যে এটা আদেশ। এটা অনুমতিও হতে পারে। এখানে এটা হল অনুমতি। কেউ যদি এক বিবাহ করে তাহলে সে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করল। কারণ এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

কাজেই যিনি এক বিয়ে করেন, তিনি জানেন যে, একাধিক বিয়ে সামলানোর আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আর একাধিক বিয়ে আল্লাহ তাআলা বৈধ করেছেন, [আবশ্যক করেন নি]। বিভিন্ন জায়গায় বারবার এসেছে।

জিজ্ঞাসা: ৫৩

পৃথিবীর কোনো নারী তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নিতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে নারী কিংবা নারী জাতি এই আয়াতকে অবমাননা করার, আয়াতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে কোনো শাস্তির সম্মুখীন হবেন কি না?

জবাব:

মোটেও গুনাহ হবে না। বরং এটা মহিলাদের ফিতরাত। কিন্তু প্রয়োজনে মেনে নিতে হবে। যেমন ফাতিমা (রা.) এর জীবদ্দশায় আলী রা. বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। স্বয়ং রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন। আমার ফাতিমার সতীন এনো না। তাহলে কি এটা বলবে যে, রাসূল (ﷺ) খারাপ কাজ করেছেন? নাউযুবিল্লাহ। এটাতো মানবীয় ফিতরাত। মানবীয় ফিতরাতে যেটা অপছন্দ হয়– মানবীয় ফিতরাতে, মানবীয় প্রকৃতিতে, সহজাত অনুভূতিতে কেউ যদি অপছন্দ করে তাহলে এর মধ্যে কোনো পাপ নেই। কিন্তু এটা একটা বৈধ ব্যাপার। তুমি মনে কর 'দব' খাবে। গুইসাপের মতো একটা জিনিস। তুমি খেতে পারছ না তাই বলে গুনাহ হবে নাকি? এটাতো মানবীয় প্রকৃতির ব্যাপার। এটাতে কোনো গুনাহ হবে না।

জিজ্ঞাসা: ৫৪

আমার একবন্ধু একটি মেয়ের সাথে এভাবে বিয়ে করেছিল যে, মোবাইলে ছেলে মেয়েকে বলেছিল, আমি তোমাকে এত টাকা মোহর ধার্য করে বিবাহ করলাম। রাযি থাকলে বলো, কবুল? তখন মেয়ে ফোনে কবুল বলেছিল। পরে ছেলেও কবুল বলেছিল। বিবাহের সময় ছেলের সাথে আরো দুজন পুরুষ ছিল। উভয়ই লাউড স্পিকারের মাধ্যমে মেয়ের কবুল বলা শুনতে পেয়েছিল। আর ছেলেটারটা সরাসরি শুনেছে। এখন জানতে ইচ্ছুক, এই মোবাইলের মাধ্যমে বিয়েটা ইসলামের দৃষ্টিতে সহীহ হয়েছে কি না?

জবাব:

বিবাহের জন্য মিনিমাম দুজন সাক্ষী, ইজাব এবং কবুলকে দেখতে হবে।

বিবাহ একটা সামাজিক এগ্রিমেন্ট (চুক্তি)। নারী এবং পুরুষ যেন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। কারণ বিবাহের এই এগ্রিমেন্টের কারণে স্ত্রী তার অনেক কিছু হারাচ্ছে। স্বামীর অনেক দায়ভার পড়ছে। কাজেই সাক্ষী লাগবে। অন্তত দুজন সাক্ষী নিজের কানে শুনতে হবে। দেখতে হবে। মোবাইলের সমস্যা হল, আমরা কানে শুনলাম। কিন্তু কে বলল, ওই মানুষটা কি না বা অন্য কেউ কি না– সেটাতে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ তাকে তো আমরা দেখছি না। এজন্য বিবাহের মাধ্যম ইজাব কবুল... একজনের কাছে যারা আছে তারা কিন্তু ইজাবটা শুনল বা কবুলটা শুনল এবং দেখল কে বলল। সে বলতে পারল, অমুক ব্যক্তি আমাদের সামনে 'হ্যাঁ' বিবাহের সম্মতি দিল। কিন্তু ফোনে যে সাউন্ডটা শুনল। যে সাউন্ডটা শুনেছে সে ব্যক্তির নাম-পরিচয়, তারা তার চেহারা দেখে বলতে পারবে না। এটাই স্বাভাবিক। এজন্য তাদের সাক্ষীর দুর্বলতা রয়ে যায়।

অনেক আলিমই মোবাইলের বিয়েটাকে বৈধ বলছেন না। কেউ কেউ বলছেন, সাক্ষীরা যদি নিশ্চিত হয় গলার স্বর শুনে এবং পরিচয় জানে, তাদের আগে থেকে চেনে। তারা নিশ্চিত যে অমুক-ই ইজাব বলেছে, কবুল বলেছে। তাহলে হবে। এটাও একই পর্যায়ের। যদি মেয়ে কবুল বলে, ছেলে ইজাব বলে এবং সাক্ষীরা নিশ্চিত হয় যে, অমুক মেয়েটাই বলেছে, কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে আশা করা যায়, বিবাহ হতে পারে।

জিজ্ঞাসা: ৫৫

আমি জানি, যৌতুক নেয়া হারাম। এরপরও বাবার জোর-জবরদস্তির কারণে যৌতুক নিই। পরে যদি আমি মনে করি, সাবালক হবার পরে বা আমার কাছে অর্থসম্পদ আসার পরে, টাকা আমি তার কাছে ফেরত দিয়ে দেব, এ রকম হেকমত যদি অবলম্বন করি, এতে বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো সম্ভাবনা আছে কি না?

জবাব:

যৌতুক হারাম, কিন্তু বিবাহ হারাম না। যৌতুকের জন্য গুনাহ হবে। যদি ফিরিয়ে দেয়, কিংবা শ্বশুর মাফ করে দেয়– ওই গুনাহটা মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু বিবাহ ঠিক আছে।

জিজ্ঞাসা: ৫৬

'ইনশাআল্লাহ' বলে তালাক দিলে কি তালাক হবে? না হলে এর কারণ কী?

জবাব:

'ইনশাআল্লাহ' ভবিষ্যতের জন্য। যদি আল্লাহ চান তবে দেব। এভাবে কোনো কিছু এগ্রিমেন্ট পূর্ণ হয় না। একজন বলল, আমি তোমার কাছে জমি বিক্রি করব, ইনশাআল্লাহ। এর দ্বারা কিন্তু বিক্রি হয় না। আমি তোমাকে চাকরি দেব, ইনশাআল্লাহ। এটা বললেও চাকরি হয় না। যে কোনো এগ্রিমেন্ট... বিবাহ একটা এগ্রিমেন্ট। এটা আরবিতে আক্‌দ। এটা কিন্তু শুধু কথা, ওয়াদা নয়। ইনশাআল্লাহ বললে ওয়াদা হয়। এগ্রিমেন্ট হয় না। এজন্য তালাকের ক্ষেত্রেও এটা হবে না। তালাকও একটা এগ্রিমেন্ট। এজন্য তালাক ইনশাআল্লাহ দ্বারা হবে না।

জিজ্ঞাসা: ৫৭

ফেসবুকে এক বোন প্রশ্ন করেছেন, শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিধান কী? ছয় মাসের শিশু যেহেতু মায়ের দুধ খায়, এমন শিশু তার পিতার সাথে একই প্লেটে খানা খেলে কোনো সমস্যা হবে কি? অথচ শিশুর লালায় মায়ের দুধ লেগে থাকতে পারে।

জবাব:

এটা বোনের তাকওয়ার কারণে। বোন মনে করছেন তার দুধ যদি তার স্বামীর পেটে কোনোভাবে চলে যায়, তার জন্য হারাম হয়ে যাবেন কি না? প্রথমত এটা ভুল ধারণা। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলছেন:

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

যখন শিশু আর কিছু খেতে পারে না, দুধ ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারে না। ওই সময় যে দুধ খাওয়া হয়, ওই খাওয়ার মাধ্যমে দুধ সম্পর্ক তৈরি

হয়।[১] দুই বছর, কারো কারো মতে আড়াই বছরের ভেতরে সে যখন দুধ খায়, যে মায়ের দুধ খাবে সে তার দুধ মা হবে। এর পরে বড় বয়সে যদি কেউ কারো দুধ খেয়ে ফেলে, কোনো নারীর দুধ কোনোভাবে কোনো পুরুষের পেটে চলে যায়, যেকোনো ভাবে, এটা হারাম হতে পারে, হালাল হতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা কোনো রক্ত সম্পর্ক, দুধ সম্পর্ক, বৈবাহিক নিষিদ্ধতা আসে না। কোনো স্ত্রীর দুধ যদি তার হাজবেন্ডের পেটে চলে যায়, এর দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হবে না। এটা হল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হল, সন্তানের দুধ দেবার নিয়ম হল, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .

মায়েরা সন্তানকে দুইবছর পূর্ণ দুধ খাওয়াবেন।[২] কাজেই আপনি দুইবছর পূর্ণ দুধ খাওয়াবেন। এর ভেতরে সন্তানকে ক্রমান্বয়ে অন্য খাবার খেতে দেবেন। এটা আল্লাহর হুকুম। সন্তানের অধিকার এবং একটা ইবাদত।

জিজ্ঞাসা: ৫৮

'হিলা বিয়ে' সম্পর্কে শরীআতের হুকুম কী?

জবাব:

হিলা বিয়ের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর হুকুম হল, যে ব্যক্তি হিলা বিবাহ করবে এবং যে ব্যক্তির জন্য তা করা হবে, উভয় মালাউন। আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা মালাউন শব্দটা বলি। মালাউন শব্দের অর্থ অভিশপ্ত। আল্লাহ যাকে অভিশাপ করেন। গযব দেন। তাকে বলা হয় মালাউন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

যে ব্যক্তি হিলা বিবাহ করে এবং যার জন্য এই হিলা বিবাহ করানো

১. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫১০২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৪৫৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২০৫৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৯৪৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩৩১২।

২. সূরা: [২] বাকারাহ, আয়াত: ২৩৩।

হয়, উভয়কেই আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন। অভিশপ্ত করেছেন।[৩] কাজেই যারা বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ যারা এই বিয়ে দিয়েছেন, সাক্ষী হয়েছেন, বিয়ে করেছেন, যার জন্য বিয়ে করেছেন, সবাই আল্লাহ তাআলার এই ভয়ঙ্কর অভিশাপের অধীনে। আমরা সবাইকে অনুরোধ করব, দয়া করে আমরা এই অভিশাপের কাছ থেকে দূরে থাকব।

জিজ্ঞাসা: ৫৯

কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, এক পর্যায়ে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তিন তালাকের পরে যদি ওই স্বামী স্ত্রীকে আবার ফেরত নিতে চায়, তখন আমাদের ইসলামি শরীআতে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাকে অন্য জায়গায় বিবাহ করতে হবে। তারপর তাকে নিলে নিতে পারবে।

জবাব:

কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেবার অর্থ হল, সে কখনো আর ওই স্ত্রীকে চায় না– এটা সে কনফার্ম। তোমার প্রশ্নটাই ভুল। তিন তালাক দেওয়ার পর স্বামী ফিরিয়ে নিতে চায়– এই চিন্তাটা সমাজে আছে, এটা সম্পূর্ণ ভুল। তিন তালাক দেবার অর্থ, সে আর ওকে চায় না। আমরা সমাজে একটা বিভ্রান্তিকর ধারণা তৈরি করেছি যে, তালাক তিন দিয়ে শুরু হয়। তালাক যে ১ দিয়ে শুরু হয়, এটা বাংলাদেশের মুসলিমরা জানে না। এই না জানার জন্য শুধু মুসলিমরা দায়ি নয়, দীনের দায়িরাও দায়ি। কারণ আমরা তাদেরকে এটা বুঝতে দিই নি।

প্রথম বিষয় হল, কোনো স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দেবার পরে ফিরে চায়, এটা মিথ্যাকথা। তিন তালাক দেবার অর্থ, সে আর তাকে চায় না। এজন্য ইসলামে তিন তালাক দেবার পর তাকে ফিরিয়ে নেবার আর কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নি।

দ্বিতীয় কথা হল, তিন তালাক দেওয়ার পরে ফিরিয়ে আনার সুযোগ কেন দেয়া হয় নি, যেটাকে আমরা এখন হিলা বানিয়েছি? এটা হল নারীর অধিকার রক্ষার জন্য একটা 'রক্ষাকবয'। মেয়েরা সাধারণত ইমোশনালি দুর্বল হয়। স্বামী বারবার মারে, আবার যখন কান্নাকাটি করে তখন আবার

৩. মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৮০৪, ২৮০৫।

চলে যায়। মেয়েদের আবেগ বেশি। এটা ডাক্তাররাও বলে। নারী প্রকৃতিতে ইমোশন বেশি থাকে। সেনসিটিভিটি বেশি থাকে। খুব কষ্ট দিয়েছে, আর কখনো যাব না। আবার কান্নাকাটি করলে আবার চলে আসে। একটা স্বামী তাকে তালাক দেয়, সে খারাপ স্বামী। যে দুইবার দেয় আরো খারাপ স্বামী। যে তিনবার তালাক দেয় সে সবচেয়ে খারাপ স্বামী। এই স্বামীকে যদি আবার চান্স দেয়া হয়, তিনি আবার চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারেন, তাহলে ও আবার এসে বলবে, আমি অন্যায় করেছি, তুমি আবার চলো। আজীবন শুধু তালাক দেবে, নিয়ে যাবে। ওই মেয়েটার জীবন স্থিতিশীল করতে দেবে না।

আল্লাহ তাআলা বললেন, যে স্বামী তিনবার তালাক দিয়েছে ওটা একটা বদমাইশ স্বামী। ওর জন্য সকল সুযোগ কেটে দাও। ওই স্ত্রীকে এপ্রোচ (ধারেকাছে আসার) করার সুযোগ দিও না। তোমার জন্য এটা চিরতরে হারাম। আর কোনো পথ নেই। ওই মেয়েকে ফুল (সম্পূর্ণ) সুযোগ দাও, ও যেন অন্য আরেকটা সংসার করতে পারে। এই সুযোগ দেবার জন্যই ওই ব্যবস্থা। এখন সে অন্য জায়গায় বিবাহ করেছে। যেকোনো কারণে দশ বছর কিংবা পাঁচ বছর পর কোনো কারণে ওই বিবাহ টেকে নি। তখন ওই স্ত্রী কিন্তু আগের স্বামী পরের স্বামীর মধ্যে কম্পেয়ার করার সুযোগ পাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে, ওই স্বামীকে তালাক দিয়েছিল তার পজেটিভ নেগেটিভ কী। এই পর্যায়ে এসে যদি চায় তাহলে আগের স্বামীর কথা বিবেচনা করতে পারে। স্ত্রীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার পরে। সেকেন্ড কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে এই সুযোগটা দেয়া হয়েছে।

এই নারীকে যে অধিকার বা সুযোগ দেয়া হল, এই বদমাইশ দুষ্ট সন্ত্রাসী স্বামীর দরজা বন্ধ করে দেয়া হল, দুর্ভাগ্যবশত এই স্বামীর জন্য দরজা খুলতে গিয়ে এই নারীটাকে আমরা অপমানিত করেছি। 'হিলা বিয়ে' নামে প্রতারণামূলক একটা বিয়ে আমরা চালু করেছি। যেখানে রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

যে ব্যক্তি হিলা বিয়েতে বিয়ে করে আর যার জন্য করা হয় দুইজনই

মালাউন (অভিশপ্ত)।[৪] এজন্য তোমরা যেটা বলছ, ফিরিয়ে নিতে চাইলে তার জন্য ব্যবস্থা। না, ফিরে চাওয়ারই কোনো সুযোগ নেই। তিন তালাক দেওয়ার অর্থ সে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আমাদের সমাজের মানুষের ধারণা, তালাক যতই দাও হুযুররা ফিরিয়ে দিতে পারে। যুগযুগ ধরে আলিমদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে এই ভুল ধারণাটা তৈরি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক জায়গায় যাওয়ার তাওফীক দান করুন।

জিজ্ঞাসা: ৬০

আপনি আপনার কথায় পুরুষদেরকে বদমাইশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অনেক সময় ভালো স্বামীও মহিলাদেরকে তালাক দিয়ে থাকে, সংশোধনের চেষ্টা করে থাকে। সে ক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন? আমাদের সমাজের কথিত 'হিলা বিবাহ' নামে একটা সংস্কার চালু আছে। সেটার ব্যাপারে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

জবাব:

দুটো বিষয়। স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রীর খারাপ আচরণের কারণে তালাক দিতে বাধ্য হন। তাকে ভয় দেখানোর জন্য। এক্ষেত্রেও যিনি তিন তালাক দিয়েছেন, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে দিয়েছেন বলেই ইসলাম মনে করে। কারণ স্ত্রী যদি খারাপ হয়, স্বামীর সাথে খারাপ আচরণ করে, কথা শোনে না, ঝগড়াঝাটি হয়, তার জন্য ইসলাম কিছু স্টেপ দিয়েছে কুরআনে। একে সাইকোলজিক্যালি (মানসিকভাবে) ট্রিট করতে হবে। যেমন বিছানা আলাদা করে দিতে হবে। তার সাথে সম্পর্ক কমিয়ে দেবে। বকাঝকা করবে, হালকা চড়চাপড় দেবে। এগুলোতে যদি কোনো কাজ না হয়, তাহলে দুই পরিবার থেকে লোক আসবে, যে, তোমরা কী চাচ্ছ?। তোমরা কেন মিল করছ না?। এটাও ব্যর্থ হলে তখন তালাকের স্টেপ। একটা দিয়ে দেখবে। এরপরে দুই, এরপর যখন ৩ দিয়েছে, আর ওই স্ত্রীকে সে নিতে পারবে না। যে স্ত্রী এই সবগুলো স্টেপ সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট, ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট, পারিবারিক ট্রিটমেন্ট, সোশ্যাল ট্রিটমেন্ট, এক, দুই, তিন তালাক– এতে ভালো হয় নি, সে আর পরে ভালো হবে, এই ধরনের

৪. সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৩৬১৮; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৮০৪, ২৮০৫।

আশা করার কোনো সুযোগ নেই– স্বামী-স্ত্রী যার কারণে তালাক তিন পর্যন্ত যাবে।

সমাজের ভুল ধারনাটা হল, তালাক তিন থেকে শুরু হয়। তালাকের আগে অনেক কাজ আছে। তারপরে তালাক ১ থেকে শুরু হবে, তারপর দুইয়ে যাবে, ৩ অর্থ সে শেষ। আর হিলা যেটা আছে। হিলা লানতের বিষয়। হিলা বন্ধ করার অনেক স্টেপ করছে। আমাদের দেশের মানুষ তালাক ব্যবস্থা বোঝে না। তালাক যে কত ভয়ঙ্কর জিনিস! তালাক কখন দিতে হবে, কেন দিতে হবে? দুইটা ভুল ধারণা আছে মানুষের মধ্যে। এক, তালাক তিন থেকে শুরু হয়। তালাক যতই দেওয়া হোক, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ঠিক করে দিতে পারে। এই দুটো ভুল ধারণা ঠিক করতে হবে।

আমি মাঝেমাঝে প্রস্তাবনা করেছি, অনেক আগেও করেছি। একটা আইন যদি বাংলাদেশে হয়। কেউ যদি একবারে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, বা কোনো কাজে যদি তিন তালাক একবারে লেখে, অথবা কোনো ম্যাজিস্ট্রেট তিন তালাক লেখে, বাংলাদেশের আইনে নারী নির্যাতন অন্যায়ের কারণে, ইসলামবিরোধী তালাক দেওয়ার কারণে তার ১০/২০/৫০ হাজার টাকা জরিমানা হবে, ৬ মাসের জেল হবে। বাংলাদেশ থেকে তিন তালাক উঠে যাবে। হিলা বিবাহ উঠে যাবে। আমরা সেটা না করে, কখনো এনজিওরা বলছে, মুখের তালাকে তালাক হবে না, লিখিত হতে হবে। কেউ বলছে, তিন তালাক কোনো তালাক না। শরীআতে যেখানে তিন তালাককে তিন ধরা হয়েছে, মুখের তালাক যথেষ্ট ধরা হয়েছে, এখন আমরা এইসব আইন করে দীনকে তো পরিবর্তন করতে পারব না। এতে আরো জটিলতা বাড়ছে।

একবারে তিন তালাক দেয়া যে শরীআতে গুনাহের কাজ এই ব্যাপারে কিন্তু সবাই একমত। এ গুনাহের জন্য কোনো তা'যির (অনির্ধারিত শাস্তি) সরকার ইচ্ছা করলে করতে পারে। একবারে তিন তালাকের শাস্তি দেয়া হবে, ২০ হাজার টাকা জরিমানা হবে। এটাও যদি করা হয়, তবে দেখবে, আর কেউ তিন তালাক দেচ্ছে না। একবারে তিন তালাক যখন দেবে না তখন হিলা বিবাহ উঠে যাবে।

জিজ্ঞাসা: ৬১

আগে আমি নামায-রোযা করতাম না। দাড়িও রাখতাম না। ইদানিং সবকিছু ঠিকঠাক মতো হবার চেষ্টা করি। এটা আমার স্ত্রীর অপছন্দ এবং এ কারণে সে আমার কাছে তালাক চেয়েছে। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

জবাব:

জি, খুবই দুঃখজনক। আমাদের স্বামীরা চান স্ত্রীরা বিশ্বস্ত থাক, আবার তারা চান স্ত্রীরা পর্দা না করুক। কিন্তু বেপর্দা সুন্দরী স্ত্রীকে যখন তার কোনো বন্ধু, তার কোনো আত্মীয় তার সৌন্দর্য অ্যাপ্রিশিয়েট করার জন্য একটু ঘনিষ্ঠ হয় তখন তিনি মাইন্ড করেন। স্ত্রীও চায় স্বামী স্মার্ট হোক দাড়ি না রাখুক। কিন্তু সেই স্মার্ট স্বামী যখন তার কোনো বান্ধবী, তার কোনো আত্মীয়াকে অ্যাপ্রিশিয়েট করে, তাকে সুন্দর বলে একটু ঘনিষ্ঠ হয় তখন স্ত্রী কষ্ট পায়। কিন্তু এর মাঝখানে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। কাজেই স্বামীর মুখের দাড়ি, স্ত্রীর পর্দা পারিবারিক জীবনের জন্য অত্যন্ত বড় একটা নিআমত। কারণ যে স্বামী দাড়ি রেখেছে, সে আর যাই করুক স্ত্রীর প্রতি সহজে অবিশ্বস্ত হতে পারে না। যে স্ত্রী বোরকা পরেছে সে স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ত তো হতে পারে না। এটা হল আমাদের দুনিয়ার অর্জন।

আর আল্লাহর দীন পালনের প্রশান্তি আপনার স্ত্রীকে বোঝান। আপনার স্ত্রী যদি তালাক চান তাহলে তাকে অপশন দেন, এটা তোমার ইচ্ছা। আমার দীন পালন করলে তোমার যদি কষ্ট লাগে, তাহলে তুমি দেখো। আমার চেয়ে ভালো কাউকে পাও কি না। কাজেই, আমার মনে হয়, কিছুদিন সবরের সাথে, ভালোবাসার সাথে এটা ডিল করলে এই সমস্যা আর থাকবে না। আপনার স্ত্রী এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

জিজ্ঞাসা: ৬২

একজন বোন প্রশ্ন করেছেন, উনার স্বামী মোবাইলে অন্য একটি মহিলার সাথে কথা বলেন। তার সাথে খারাপ আচরণ করেন, আকর্ষণের নজর

নেই। এই ক্ষেত্রে তিনি কী করতে পারেন?

জবাবঃ

এটা যুগে যুগেই সমস্যা। এটার দীর্ঘ আলোচনা আমদের করা দরকার। প্রথম বিষয় হল যে, আমাদের সন্দেহ থেকে দূরে থাকতে হবে। সন্দেহ আল্লাহ হারাম করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ.

হে মুমিনগণ, তোমরা ধারণা-সন্দেহকে বর্জন করো। কারণ অধিকাংশ সন্দেহই পাপ। অনেক সন্দেহ পাপ।[৫] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

ধারণা-সন্দেহ হল সবচেয়ে বড় মিথ্যা।[৬]

আমাদের সন্দেহ বর্জন করতে হবে। এটা অন্য মুমিনের ক্ষেত্রে যেমন, স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তেমন। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও অহেতুক সন্দেহ করা যাবে না। একে অপরকে সন্দেহ করা যাবে না। কাজেই উনি যদি মোবাইলে-ফোনে করেন, আমি হয়ত ভালো ধারণা করব, উনি হয়ত প্রয়োজনে ফোন করছেন। আমরা সন্দেহ বর্জন করব। পাশাপাশি স্বামী স্ত্রীর অধিকারের ক্ষেত্রে আমাদের উভয়েরই দায়িত্ব সচেতন হতে হবে, অধিকার সচেতন নয়। আমার দায়িত্বটা পালন করব। অধিকারের ক্ষেত্রে চেষ্টা করব। বাকি কিছু সবর করব। আমাদের সম্পর্ক সুন্দর করার চেষ্টা করব। তৃতীয়ত, স্বামীর জন্য দীনি পরিবেশ তৈরি করতে হবে। স্বামী যখন বুঝবেন, স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণটা আমার আখিরাতের জন্যও সবচেয়ে প্রয়োজন, কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ.

---

৫. সূরা: [৪৯] হুজুরাত, আয়াত: ১২।

৬. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫১৪৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৫৬৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৯১৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৯৮৮।

ভালো মুসলিম সেই যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।[৭]

স্ত্রীর কাছে ভালো না হলে ভালো মুসলিম হওয়া যায় না, এটা যখন আলিমদের মুখ থেকে ওই স্বামীর কানে যাবে তার ইয়াকিন হবে। তখন তিনি একটু তাকাল্লুফ (লৌকিকতা) করে হলেও, একটু ভান করে হলেও স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করার চেষ্টা করবেন, জান্নাতের লোভে। এটা আমাদের সবাইকে চেষ্টা করতে হবে– স্বামীর জন্য ভালো দীনি পরিবেশ, স্ত্রীর জন্য ভালো দীনি পরিবেশ। স্ত্রীর ভেতরে দীনিচেতনা, আখিরাতমুখিতা, স্বামীর ভেতরে আখিরাতমুখিতা। এগুলো আমাদের পারিবারিক সম্পর্ককে সুন্দর করবে।

জিজ্ঞাসা: ৬৩

একবোন প্রশ্ন করেছেন, তার বিয়ে হওয়ার পরে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন খুবই সুখময় ছিল। ভালোভাবেই চলছিল। হটাৎ করে তার স্বামী কিছুদিন ধরে খুব ফেসবুক ইউজ করেন। মোবাইলে হয়ত কারো সাথে কথা বলছেন। এই ধরণের একটা অবস্থা তিনি দেখতে পারছেন। এবং তার সাথে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এখন বোনের প্রশ্ন হচ্ছে, এক্ষেত্রে তিনি কী করতে পারেন?

জবাব:

এই জাতীয় সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। আধুনিক প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, আমরা কেমন জানি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি। আমাদের আগের প্রজন্ম, তার আগের প্রজন্মের আমাদের মায়েরা, আমাদের দাদিরা তাদের জাগতিক সুবিধা কম ছিল, কিন্তু হৃদয়ের যে আন্তরিকতা; স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পাড়াপ্রতিবেশী নিয়ে যে একটা সৌহার্দ্যময় সুন্দর জীবন, এটা যেন আমরা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছি। এটার সর্বশেষ পর্যায় পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়া।

বোন যে প্রশ্ন করেছেন, এক্ষেত্রে পরস্পরের দায়িত্ব আছে। যদি তার স্বামী পড়তেন অথবা প্রশ্ন করতেন তাহলে তাকে আমরা তাকে কিছু কথা বলতাম। সেই কথা হল, আল্লাহ তাআলা আমাদের দীন দিয়েছেন। এই

৭. সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৮৯৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৯৭৭।

দীনের অন্যতম মৌলিক বিষয় হল, আমরা যেন দুনিয়াতে শান্তি পাই। দীন অর্থ, অর্থহীন কোনো আনুষ্ঠানিক কাজ নয়। যেটা আমরা কিছু পাচ্ছি না। এজন্য সালাত আদায় করা দীন। কারণ সালাতের মাধ্যমে আমাদের আত্মা সুস্থ শক্তিশালী হবে। ঠিক তেমনি স্বামী এবং স্ত্রী হাসি-আনন্দ-ফুর্তি এগুলো ইবাদত। কখনো ফরয, কখনো নফল। কারণ এর মাধ্যমে আমরা নগদ শান্তি পাব। আল্লাহ খুশি হবেন এবং আমাদের জন্য অফুরন্ত সাওয়াবের ব্যবস্থা করবেন।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর অতিরিক্ত সময়ের প্রায় সবটুকুই স্ত্রীকে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। সাহাবায়ে কিরাম এসে প্রশ্ন করেছেন তাঁর স্ত্রীর কাছে। তিনি ঘরে কী করেন? আয়িশা (রা.) বলেছেন:

كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِيْ فِيْ خِدْمَةِ أَهْلِهِ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘরে থাকলে তাঁর স্ত্রীর খেদমত করেন। স্ত্রীর সেবা, সার্ভিস।[৮] ঘর পরিষ্কার করা, পেঁয়াজ কাটা। আপনি কল্পনা করেন, একজন পুরুষ, স্ত্রী যখন রান্না ঘরে রান্না করে পাশে পনেরো মিনিট পেঁয়াজ কেটে দেয়, একটু কাজে সহযোগিতা করলে স্ত্রীর মনটায় কত ভালো লাগে! এটা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ। তিনি নিজের কাজ নিজে করতেন, উপরন্তু স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করতেন। স্ত্রীর সাথে একসাথে খেতেন, খেলাধুলো, বিনোদন একসাথেই ছিল। সুতরাং আমাদের পাঠক ভাইদের বলি, আমরা যদি এটা করি রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত হিসেবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আমরা শুধু আখিরাতে সাওয়াব পাব না দুনিয়াতেও যেটা পাব সেটা অফুরন্ত আনন্দ, অপার আনন্দ।

যেহেতু বোনের স্বামী প্রশ্নটা করছেন না বা পড়ছেন না, সেখানে বোনের জন্য কিছু বলার আছে। সেটার প্রথম কথা হল, আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্দেহ করি। সন্দেহকে বর্জন করতে হবে। সন্দেহ আল্লাহ হারাম করেছেন। আপনার স্বামী ফেসবুক ব্যবহার করেন, ফোন করেন। আমরা ধরে নেব, তিনি কোনো ভালো কাজই করেন। আমরা খোঁজ নিতে যাব না তুমি কাকে কর, কেন কর? কারণ, এই সন্দেহ আমাদের ভেতরে আরো দূরত্ব তৈরি করবে। দ্বিতীয়ত, আমরা দায়িত্বের চেতনায় সম্পর্ক সুন্দর

৮. বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩১৭০; আল আদাব, হাদীস-৬৭০।

করব। অর্থাৎ আমি আল্লাহ তাআলার কাছে বলব, আল্লাহ, আমি আমার দায়িত্ব পালন করি, আমার স্বামী যদি প্রতিদান না দেয়, তুমি দিয়ো। যখন আমি দায়িত্ববোধ নিয়ে স্বামীর প্রতি দায়িত্বগুলো সুন্দরভাবে পালন করব, ইবাদতের চেতনায়, স্বামীকে ফিরতে হবেই। এটা এমন একটা আচরণ, স্বামীর ভেতরে আসর করবেই।

তৃতীয়ত, আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করব। আল্লাহ কুরআন কারীমে দুআ শিখিয়েছেন:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

আয় আল্লাহ, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে এবং সন্তান-সন্ততির ভেতরে এত প্রীতিময় সম্পর্ক দাও, যেন একে অপরের চোখের শান্তিতে পরিণত হই। এবং আমাদেরকে মুত্তাকি মানুষদের ইমাম বানিয়ে দাও।[৯] এ থেকে বোঝা যায়, মুত্তাকিদের ইমাম হতে গেলে শান্তিময় পরিবার লাগবে। আর মুত্তাকিদের বড় বৈশিষ্ট্য হল, শান্তিময় পরিবার। আপনি এই দুআটা সিজদাতে গিয়ে করবেন, সালাতের ভেতরে করবেন, সালাতের পরে করবেন, তাহাজ্জুদের সময় করবেন। এইভাবে আমার দায়িত্ব পালন, আমার দুআ এবং সন্দেহ মুক্তভাবে স্বামীর সাথে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা– এগুলো আমাদেরকে সাহায্য করবে। পাশাপাশি স্বামীকে দীনি পরিবেশের দিকে ধাবিত করতে হবে। স্বামীর সাথে স্ত্রী দীনি কোনো পরিবেশে যাবে, দীনি প্রোগ্রাম দেখবে। যখন তাকওয়া অন্তরে তৈরি হবে, আল্লাহর ভয় তৈরি হবে, তখন আমাদের পারিবারিক সম্পর্কও গভীর হবে।

এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এক্ষেত্রে ভাইদের জন্য কী বলব? এক্ষেত্রে ভাইদের সমস্যা দুই ধরণের। অনেক ভাই স্ত্রীর উপর যুলুম করছেন। অনেক ভাই স্ত্রীর দ্বারা যুলুমকৃত হচ্ছেন। এটাও বাস্তব। বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ, বিভিন্ন রকমের, নানাবিধ স্লোগান, অধিকার চেতনা অনেক সময় স্ত্রীদেরকেও সন্দিহান করে তোলে। স্ত্রী স্বামীকে অনেক সময় রাগবাগ করেন, স্বামীর সাথে খারাপ আচরণ করেন, এটারও অভাব নেই। ভাইদের এই বিবিধ সমস্যার কারণে আমরা দুই ধরণের পরামর্শ শরীআতের আলোকে দিতে পারি। প্রথম কথা হল, আল্লাহ তাআলা স্বামীদেরকে

৯. সূরা: [২৫] ফুরকান, আয়াত: ৭৪।

দুইটা দায়িত্ব দিয়েছেন। স্ত্রীদেরকেও দুটো দায়িত্ব দিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে খুব সংক্ষেপে বলা যায়। স্বামীদের দায়িত্ব হল দুটো। একটা হল স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ করা। রাসূল (ﷺ) যেটা বারবার বলছেন:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ.

তোমাদের ভেতর সেই সবচেয়ে ভালো, সেই সবচেয়ে ভালো মুসলিম যে স্ত্রীর সাথে, পরিবারের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে।[১০] সর্বোত্তম আচরণের অর্থ, স্ত্রী যতই আমাকে বিরক্ত করুক, রাগাক, আমি অন্তত ধৈর্য ধরে শালীনতার সাথে আচরণ করব। যেটার মডেল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তাঁর স্ত্রীরা তাঁর সাথে অশোভন আচরণ করছেন, কষ্ট দিয়েছেন। তিনি কষ্ট পেয়ে একবার চারমাস মসজিদে পড়ে থেকেছেন– এত কষ্ট পেয়েছেন মনে! কিন্তু তাৎক্ষণিক কখনো রাগ করেন নি। অর্থাৎ রাগের মাথায় হাত চালানো তো দূরের কথা, রাগ করা, গালি দেওয়া, কড়া কথা বলা, এটা কখনো করেন নি। সবর করেছেন। সবর করে পরবর্তিতে কোনো কথা বলেছেন। ভালো অথবা একটু কষ্ট পেয়ে দূরে সরে থেকেছেন। এই রকম ঘটেছে। কাজেই প্রথম বিষয় হল, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব, স্ত্রীর সাথে সর্বোচ্চ উত্তম আচরণ করা। তার আচরণে ক্রোধান্বিত না হয়ে তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা। তার সাথে ভালো আচরণ করা। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

এটা ইমাম সুয়ুতি, শাইখ আলবানি হাসান বলেছেন, জামি' সাগীরে এসেছে। যদি কেউ রেগে যায় কারো উপরে। যেখানে সে রাগ ঝেড়ে দিতে পারে। এমন মানুষ যাকে রাগের কারণে মা'র দেওয়া যায়, গাল দেওয়া যায়, কথা বলা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, সে নিজেকে কন্ট্রোল করে ক্ষমা করে দেয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার অন্তরটাকে শান্তি ও তৃপ্তি দিয়ে ভরে দেবেন।[১১] কাজেই, স্বামী ও স্ত্রীর

১০. সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৮৯৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৯৭৭।

১১. তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৬০২৬; আলবানি, সহীহুল জামি' ১/৯৭।

ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। স্বামীকে স্ত্রী রাগ করতে পারে, স্ত্রীকে স্বামী রাগ করতে পারে। তারপরেও রাগের মাথায়... যখন নিজেকে দমন করবে, ভালো কথা বলবে। তখন এই সাওয়াবটা তিনি পাবেন। এটা হল প্রথম কাজ।

দ্বিতীয় বিষয় হল, স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে সময় দেওয়া এবং তাকে সাধ্যের ভেতরে ভালো রাখা। এই দুটো কাজ স্বামীরা করবেন। সাধ্যের ভেতরে সর্বোত্তম ভালো আচরণ এবং তাদেরকে সময় দিতে হবে যতটা সম্ভব। আমার আনন্দ-বিনোদন স্ত্রীকে নিয়ে হবে, পরিবারকে নিয়ে হবে এবং তাদেরকে যথাসম্ভব ভালো রাখা। আমার সম্পদ আছে, অথচ তাদের খারাপ রাখব, এরকম যেন না হয়। এই দুটো কাজই আল্লাহর কাছে সাওয়াবের চিন্তায় করতে হবে। স্ত্রী প্রতিদানে কী দিল, এই চিন্তা করা যাবে না। তাহলে সাওয়াবও পাওয়া যাবে এবং পারিবারিক সম্পর্কটাও সুন্দর হবে। আমরা এটা ভাবি, আমার স্ত্রী ১০০% আমার মনের মতোই হবেন। আবার স্ত্রী ভাবেন, আমার স্বামী ১০০% আমার মনের মতোই হবেন। এটা ভাবা ঠিক নয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঠিক এই কথাটাই বলেছেন। আমাদের যেখান থেকে ভুলের শুরু হয়। স্ত্রী স্ত্রীর প্রকৃতি দিয়ে চিন্তা করেন, স্ত্রীর প্রকৃতি দিয়ে স্বামীকে ঠিক সোজা করে ফেলবেন। আর স্বামী পুরুষ প্রকৃতি দিয়ে চিন্তা করেন, স্ত্রীকে ঠিক পুরুষ প্রকৃতিতে সোজা করবেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

তোমাদেরকে নসিহত করছি, ওসিয়ত করছি, আদেশ দিচ্ছি, স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ করবে।

فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ...

নারীদেরকে বক্রতা, আবেগ, ইমোশন বেশি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এজন্য অল্পতেই তারা আবেগী হবে। যার ভেতরে নারিত্ব যত বেশি তার ভেতরে আবেগ-ইমোশন তত বেশি। তুমি যদি তাকে পুরো সোজা করতে

যাও ভেঙে যাবে। আর একেবারে ছেড়ে দাও তাহলে তার ক্রেজিনেস (পাগলামী) বাড়তে থাকবে। কাজেই তার সাথে ভালো আচরণ করো, তাকে ভালো বলো। কিন্তু তাকে পুরুষের মতো পুরো সোজা করতে যেয়ো না।[১২] এটা পুরুষের বড় ভুল। এমনকি আমার সন্তান/ভাই কেউই পুরো আমার মতো হবেন না। কাজেই তাকে তার ব্যক্তিত্ব, তার অবস্থায় এবং বিশেষ করে নারী প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখেই আমাদেরকে এগিয়ে নিতে হবে। আমরা দুজনেই অসম্পূর্ণ। ঠিক পুরুষের ক্ষেত্রেও তাই। স্বামীকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে যাওয়া যাবে না যে, তাকে আমার নারী প্রকৃতির অধীনে নিয়ে আসব।

এজন্য আমরা যেটা বলছিলাম, স্ত্রীর জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুটি দায়িত্বের কথা বিভিন্নভাবে বলেছেন। একটা হল আনুগত্য। আনুগত্য বলতে, স্বামী স্ত্রীর ভেতরে কয়েকটা সম্পর্ক। একটা হল একান্ত দাম্পত্য সম্পর্ক। যে সেবা স্বামী স্ত্রী ছাড়া শরীআতের দৃষ্টিতে অন্য কারো থেকে নিতে পারেন না সেখানে আনুগত্যটা ওয়াজিব। বাকি অন্যান্য ক্ষেত্রে, ঘর থেকে বাইরে যেতে, ঘরে কাউকে আনতে, স্বামীর সম্পদ প্রয়োজন ছাড়া অন্য কাউকে দিতে, এটা আনুগত্য লাগে। আর সংসারে রান্নাবাড়া, এটাতে আনুগত্য করা জরুরি নয়। সহযোগিতা করা ভালো। সাওয়াব আছে। না পারলে স্বামীর দায়িত্ব রান্নাবাড়ার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয় হল, স্বমীর প্রতি কৃতজ্ঞতা। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

لَا يَنْظُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِيْ عَنْهُ.

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনেক খেদমত থাকে। স্বামী স্ত্রীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেন। সামাজিক দায়িত্ব নেন, প্রোটেকশন-সংরক্ষণের দায়িত্ব নেন। স্ত্রীকে কেউ কোনো কিছু বললে তিনি তা প্রতিরোধ করেন। এই যে স্বামী স্ত্রীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক সংরক্ষণের চেষ্টা করছেন। যে কোনো অবস্থাতেই থাক না কেন। মজুর থেকে শ্রমিক থেকে যেকোনো পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীর জন্য কষ্ট করেন। আর এই কষ্ট না হলে স্ত্রী বিপদে পড়েন। কিন্তু যদি কোনো স্ত্রীর স্বামীর এই কষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি না লালন করে। তার ভেতরে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি না থাকে, তাহলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। ওই

১২. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫১৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৪৬৮।

স্ত্রীর দিকে আল্লাহ তাকান না।[১৩]

তাহলে স্ত্রীর জন্য দুটো দায়িত্ব, স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি থাকা যে, তিনি আমার জন্য কষ্ট করেন। তিনি আমার জন্য অনেক কিছু করতে পারেন নি, আবার অনেক কিছু করেছেন। কাজেই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, ধন্যবাদ দেওয়া এবং তার সাথে মিলেমিশে সংসার করা স্ত্রীর দায়িত্ব। আর স্বামীর দায়িত্ব হল, স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করা এবং তাকে সব থেকে ভালো রাখার চেষ্টা করা, সময় দেওয়া। এই দুইটা বিষয় যদি আমরা পরস্পর করতে পারি, তাহলে, ইনশাআল্লাহ, দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে।

জিজ্ঞাসা: ৬৪

একবোনের স্বামী ফেসবুকে চ্যাট করেন। বিভিন্ন নারীদের সাথে যুক্ত। যোগাযোগ করেন, কথাবার্তা বলেন বা সম্পর্ক রাখেন। যখন এই বিষয়টি জানতে চেয়েছেন তখন অস্বীকার করছেন। একপর্যায়ে তার স্বামী অফিসে চলে গেছেন। অফিসে বসে সেটা করছেন। উনি জানতে চাইলে সেটাও তিনি অস্বীকার করেন। একপর্যায়ে তাদের দাম্পত্য জীবনে কিছুটা অশান্তি চলছে। এখন তার জানার বিষয় হল, এই মুহূর্তে তিনি কী আমল করতে পারেন বা কী করণীয় আছে তার?

জবাব:

জি, আধুনিক প্রযুক্তির সাথেসাথে দাম্পত্য জীবনের অসহনীয়তা বাড়ছে। এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, মুসলিম কমিউনিটিতে তালাক, বিবাহবিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের দূরত্ব কম ছিল। কিন্তু ইদানিং তা বাড়ছে। তার বড় একটা অংশ হল ইন্টারনেটের কারণে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে চ্যাট, ফেসবুকে বন্ধুত্ব বা এসবের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে স্ত্রী-স্বামী পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্রথম করণীয়– সবার কাছে অনুরোধ যে, আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হই, যে, আমাদেরকে আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে

১৩. মুসনাদ বাযযার, হাদীস-২৩৪৯; নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৯০৮৬; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১৪১৮৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৭৭১।

হবে। আর স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব কী, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব কী, এটা যেন আমরা বুঝতে পারি। এটা খেয়াল রাখার চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সন্দেহ থেকে মুক্ত হাওয়া লাগবে। আমরা স্বামীরা যদি মনে করি স্ত্রী শতভাগ আমার সাথে জুড়ে থাকবে, একেবারে হুবহু যেভাবে আমি বলি। অথবা স্ত্রী যদি মনে করেন, স্বামী শতভাগ আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। আমি যেভাবে বলি সেভাবে চলবে। এটা কিন্তু আসলে ঠিক নয়। এটা মানবীয় প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা প্রতিটি মানুষ অপূর্ণ। আর দুইজন অপূর্ণতা মিলে পূর্ণতা বাড়ে না, অপূর্ণতা-ই বাড়ে। অথচ একসাথে হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। হতেই হবে। না হওয়াটা সবচেয়ে বড় অপূর্ণতা। আজীবন একা থাকব...। জীবনের যে মৌলিক চাহিদা সেটাতো পূর্ণ হল না। এটা আল্লাহর দেওয়া ফিতরাত। জন্মগতভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সন্তানের সাথে একটা সম্পর্ক। এটা বিহীন যে মরে যায় সে অপূর্ণ মানুষ হিসেবেই মরে যায়। যেটা বর্তমানে অনেকেই চিরকুমার থেকে মরে যাচ্ছে।

এটা করতে হবে। পাশাপাশি আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, এখানে কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। অপূর্ণতা জন্য প্রথমত সন্দেহ ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের সঙ্গীকে আমার মতো করার চেষ্টা বাদ দিতে হবে। তাকে তার মতো রেখে আমাকে যত সম্ভব আনন্দ উপভোগ করতে হবে।

তৃতীয়ত, আল্লাহ কুরআন কারীমে যেটা বলেছেন:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

স্বামী বা স্ত্রীর ভেতরে একটা খারাপ জিনিস দেখলে খারাপটাকে এমনভাবে মনে করতে হবে, এটার ভেতরে হয়ত কোনো ভালো, অনেক ভালো থ াকতে পারে।[১৪] চতুর্থত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে যদি কোনো একটা জিনিস খারাপ দেখা যায় অন্য ভালো জিনিসগুলো মনে করতে হবে। এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে আমাদের এই কাঠিন্য সহজ হয়ে যাবে।

---

১৪. সূরা: [৪] নিসা, আয়াত: ১৯।

দ্বিতীয় বিষয় হল, আমরা বোনকে বলব, আপনি স্বামীকে আপনার মতো করার চেষ্টা করবেন না। আপনার স্বামী যদি আমাদের কাছে শুনতেন তাহলে আমরা আরো ভালো কিছু বলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু স্বামীকে যেহেতু পাচ্ছি না, আপনাকে আমরা বলব, আশা করি, স্বামী অনেক ভালো। তার ভালো দিক আছে। তিনি যদি কিছু ভুল করেন, ভুলটাকে মেনে নিয়ে আপনি দায়িত্ব পালনের অনুভূতি নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন– আপনি যেটা সহ্য করতে পারছেন না বলে আপনার কষ্ট হচ্ছে। স্বামী যদি আরো খারাপ হয় পরবর্তী বিকল্পগুলো চিন্তা করেন। আপনি যতটুকু পেয়েছেন এতটুকু সুখ নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকেন। স্বামীকে আরো প্রেম, মায়া, মমতা, মহব্বত দিয়ে কাছে রাখার চেষ্টা করেন। এটা ভালো। বেশি শাসন করার চেষ্টা করলে সাধারণত backfire (হিতে বিপরীত) হয় বেশিরভাগ সময়।

আর সবচেয়ে বড় যেটা, আমলের কথা বলেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

সূরা ফুরকানের ৭৪ নম্বর আয়াত, আল্লাহ যে দুআটা শিখিয়েছেন সে দুআটা সবসময় পড়ব। সিজদায় গিয়ে পড়ব। আল্লাহর কাছে দুআ করব। এছাড়া বাংলায় মাতৃভাষায় আমরা দুআ করব, আল্লাহ আমাদের স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে সুখ বাড়িয়ে দেন। স্বামীর ভুল ত্রুটি দূর করে দেন। আমাদের দায়িত্ব পালনের তাওফীক দেন। ইনশাআল্লাহ, ভালো হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা: ৬৫

আমাদের এক ডাক্তার বোন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। তার স্বামী একটি সাধারণ চাকরি করেন, আর উনি একজন ডাক্তার। তার ভালো ইনকাম আছে। এই পূর্ণ ইনকাম তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেচ্ছেন না বলে তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব, মনোমালিন্য সৃষ্টি হচ্ছে। এইক্ষেত্রে শরীআত কী বলে? স্ত্রীর ইনকাম কি সবই স্বামীর হাতে দিতে হবে?

জবাবঃ

আসলে স্ত্রীর অর্থ সম্পূর্ণ স্ত্রীর। ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীর যদি বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন ডলারও থাকে তার স্বামী যদি অসহায়ও হন। স্বামী জোর করে, দাবি করে স্ত্রীর কাছ থেকে একটাকাও নিতে পারবেন না। এমনকি স্বামী এটা বলতে পারেন না যে, তোমার নিজের খরচটা তুমি চালাও, তোমার টাকা দিয়ে। যদি ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা থাকে, স্বামী যদি স্ত্রীকে তার শাড়িটা কিনে না দেন, তার চুড়িটা কিনে না দেন, তাহলে আইন আদালতে তাকে হাযির হতে হবে। বাধ্য হবে। কারণ পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা হল, স্বামী স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয় বহন করবে। স্ত্রী কারোরই ব্যয় বহন করবে না। এমনকি নিজের ব্যয়ও না। তার সম্পত্তির মালিকানা তার নিজের। তার ইচ্ছামতো তিনি ব্যয় করতে পারবেন।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় থাকে। স্ত্রী যখন ফুলটাইম কোনো চাকরি করেন। তখন স্বামী থেকে অনুমতি নিতে হয়। স্বামীর পরিবারের বাইরে তাকে যেতে হয়। আর যেহেতু তিনি পূর্ণকালীন আয় করছেন পরিবারের বাইরে গিয়ে। পরিবারের দায়িত্ব কিছুটা হলেও ব্যাহত হচ্ছে সন্তানদের বিষয়ে। স্ত্রীর উচিত স্বামীকে সহযোগিতা করা। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বামী যে লোভ করছেন, এটা একান্তই শরীআত বিরুদ্ধ। আপনি আপনার সংসার চালাতে পারছেন না। আপনি আপনার আয় বাড়াতে চেষ্টা করুন। স্ত্রী যদি কিছু দেন, এটা স্ত্রীর দিক থেকে অবশ্যই ভালো। না দিলে তার প্রতি খারাপ ধারণা রাখা– এটা খুবই অন্যায়।

আর স্ত্রীরও বুঝতে হবে যে, আপনার টাকা আপনি ব্যয় করবেন। আপনি যদি সাওয়াবের নিয়তে স্বামীকে দেন তাহলে আপনার সাওয়াব বাড়বে। আমরা অনেক সময় এক্ষেত্রে ভুল করি। স্বামীকে না দিয়ে দরিদ্র ফকীর অসহায়কে দিই। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) দরিদ্র ছিলেন। মুহাজির। হিজরত করে গেছেন শুধু কাপড় নিয়ে। আর তো কিছু নিয়ে যান নি। ফকীর বলা চলে। আর তাঁর স্ত্রী সচ্ছল ছিলেন। এটা কিন্তু আমাদের জন্য মডেল। সাহাবিদের যুগে মেয়েরা কর্ম করতেন। নিজে ঘরে বসে কর্ম করে, বিভিন্ন কাজ করে বেশ ভালো টাকা জমিয়েছিলেন। যেহেতু তাঁর

ব্যয় ছিল না। তিনি এমন একটা সচ্ছলতা পেয়েছিলেন, যাকাত ফরয ছিল তাঁর উপরে। তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন ওয়ায করেন, বিশেষ করে মেয়েদেরকে, যে, তোমরা দান করো। বেশিবেশি দান করো। তখন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এর স্ত্রী বাড়িতে এসে তাঁর স্বামী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) কে বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে নসিহত করলেন দান করতে। সাদাকা করতে, যাকাত দিতে। আমার তো টাকা আছে অনেক। সোনাদানা আছে। আমি যদি তোমাকে এবং তোমার সন্তানদেরকে দান করি, সাদাকা করি এতে কি আমার সাদাকার সাওয়াব পাব? যদি পাই তাহলে কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেব। না হলে কিন্তু আমি গরীবদের দেব। তুমি একটু রাসূল (ﷺ) এর কাছ থেকে শুনে এসো। তখন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বললেন:

اِذْهَبِيْ أَنْتِ فَاسْأَلِيْهِ.

তুমি নিজে গিয়ে শুনে আস না কেন? এখানে আমাদের জন্য একটা শিক্ষা আছে। আমরা মনে করি যে, পরিবারের স্ত্রীদের মাসআলা স্বামী গিয়ে জেনে এসে দেবে। আমরা অনেক সময় বলি, মেয়েরা কেন হুযুরদের কাছে যাবে? মেয়েরা কেন আলিমদের কাছে যাবে? মসজিদে যাবে? স্বামীরা তাদেরকে দীন শেখাবে। এটা কিন্তু নবীর সুন্নাত না। স্ত্রীরাও ক্লাসে যাবে। আলিমের মুখ থেকে শুনলে, তাদের নিজের কথাটা ভালোভাবে বলতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বললেন, তুমি গিয়ে শোনো। তখন তিনি চলে গেলেন।

তিনি আসলে আয়িশা[১৫] (রা.) বললেন, যয়নাব [আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এর স্ত্রীর নাম] দেখা করতে চায়। রাসূল (ﷺ) বললেন, কোন যয়নাব? তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এর স্ত্রী। বললেন, আসতে বলো। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো দান করতে বলেছেন। আমি যদি আমার স্বামী ও সন্তানদেরকে দান করি তাহলে কি দানের সাওয়াব পাব? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি

---

১৫. যয়নাব (রা.) নবীজি (ﷺ) এর দরজায় গিয়ে বিলাল (রা.) কে বের হতে দেখে তাঁকে নবীজি (ﷺ) এর নিকট তাঁর বিষয়টি জিজ্ঞাসা করতে পাঠান। বিলালই নবীজির কাছে প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। -সম্পাদক

ডাবল সাওয়াব পাবে।[১৬] কারণ একদিকে তুমি দান করছ। আরেক দিকে তুমি তোমার আপনজনকে রক্ষা করছ।

এইজন্য যে স্ত্রী সম্পদ অর্জন করেছেন– স্বামীর অনুমতিতে চাকরি নিয়ে বা পিতার সম্পত্তি পেয়ে অথবা কুটির শিল্পের মাধ্যমে। তার সম্পদ তার। তবে তাকে যদি দান করতে হয়, তাকে দিতে হয়, তাহলে অবশ্যই পরিপূর্ণ, দীর্ঘ সাওয়াবের জন্য তার টাকাটা স্বামী-সন্তানদের পেছনে ব্যয় করা উচিত।

জিজ্ঞাসা: ৬৬

কিছু কিছু মিডিয়ার অনুষ্ঠানগুলো এমনভাবে সাজানো যে তাতে আমাদের দাম্পত্য কলহ বা সাংসারিক জীবনের অশান্তি বেড়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি?

জবাব:

এটা দুর্ভাগ্যজনক। কারণ মিডিয়াতে আমরা যেই সিরিয়ালগুলো দেখি। ড্রামা, নাটক-সিনেমা দেখি, এটার অধিকাংশরই থিংকিংটা হল স্বামীর সাথে সংসার করতে চাচ্ছে কিন্তু পরকীয়া। বিভিন্নভাবে এটার মানবিক দিক তুলে ধরা হয়। আমি চাই স্বামীর সাথে বিশ্বস্ত হতে কিন্তু পারছি না। ওর প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে। এটার একটা যৌক্তিক মানবিক ব্যাকগ্রাউন্ড (প্রেক্ষাপট) খুঁজে বের করা হয়। এভাবে আমাদের দাম্পত্য জীবনে যে বিশ্বস্থতা, এটার অবমূল্যায়ন হয়। এটা হল একটা দিক। এইড্রামা-নাটকগুলো এক ধরনের বিষ। স্লো পয়জন। এটা আমাদের ভেতরে যেমন একদিকে সংসার বিমুখ করে তোলে। এটা দেখতে চাচ্ছি দেখতে চাচ্ছি।

আর আরেক দিকে এটা আমাদের হাসি, আনন্দ, কান্নার আবরণে যে মেসেজগুলো দিচ্ছে আমাদের অবচেতন মনে পাপগুলো সহজ হয়ে যাচ্ছে। সে পাপ করছে আমি দেখছি। সে অবৈধ সম্পর্ক করছে তারপরও তার প্রতি মমতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সে আসলে বাধ্য হয়েই এই পাপটা করছে। আসলে এই পরিস্থিতিতে বোধহয় তার পাপ হচ্ছে না। আমাদের

১৬. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৭০৪৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৪২৪৮।

জীবনে পাপগুলো সহজ হয়ে যাচ্ছে। দাম্পত্য জীবনকে সহজ করার জন্য স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশ্বস্ততা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশ্বস্ততা, স্বামীর জন্য স্যাক্রিফাইসের (ছাড় দেবার) চেতনা। স্ত্রীর জন্য স্যাক্রিফাইস করার চেতনা আমাদের ভেতরে গড়ে উঠছে না। এজন্য আমাদের অবস্থাটা এমন হয়েছে- হোটেলে, প্লেনে একশো জন যাত্রী, একশো জন কাস্টমারকে সেবা করতে হয়। আমরা এটাকে স্বাধীনতা মনে করি। ঘরে স্বামীর জন্য বা পরিবারের জন্য রান্না করাটাকে আমরা পরাধীনতা মনে করি।

জিজ্ঞাসা: ৬৭

মাঝেমাঝে যদি আমার জৈবিক শক্তিকে বাড়ানোর জন্য দুয়েকটা ইয়াবা গ্রহণ করি, সেটা অপরাধ হবে কি না?

জবাব:

প্রথম কথা হল, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর জন্য সৌন্দর্য এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য সৌন্দর্য করবেন। আল্লাহ তাআলা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক যেমন হারাম করেছেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ইবাদত করেছেন। এটা শুধু বৈধ নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ইবাদত। তাদের হাসি, তাদের তামাশা, তাদের সম্পর্ক, দাম্পত্য সম্পর্ক সবকিছু ইবাদত। সাওয়াবের কাজ। আর এই ইবাদতের উন্নতির জন্য যদি কেউ বৈধ কোনো কিছু ব্যবহার করে, স্বাস্থ্যসম্মত, তবে এটা অবৈধ নয়। তবে এর বাইরেও কেউ যদি এটা করেন। প্রথমত, বাইরে সবকিছুই অবৈধ। আর যিনি বিবাহিত নন, দাম্পত্য জীবনে প্রয়োজন নেই, তিনি যদি এই ধরনের কিছু করে থাকেন তাকে পাপের পথে আরো টেনে নিয়ে যাবে। বরং রাসূল (ﷺ) যুবকদের বলেছেন, তোমরা রোযা রাখো। যারা বিবাহ করতে পার নি তোমাদের জৈবিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করো রোযার মাধ্যমে।[১৭] এটাই আমাদের দায়িত্ব।

[মাদকতার ক্ষেত্রেই আবার কথা বলা হয়েছে। ইয়াবাটা নেশার মতো। দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতরেও যদি এটা গ্রহণ করতে চাই...? -উপস্থাপক]

---

১৭. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৪০০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৮৪৫।

ইয়াবা তো নেশা। নেশা তো হারাম। সকল নেশাই হারাম। এমনকি দাম্পত্য জীবনের জন্য...। সালাতের জন্য নেশা করা...। কেউ যদি মনে করে দুই ঢোক ব্র্যান্ডি খেয়ে আমি একটু তাহাজ্জুদ পড়ব। ঘুম কেটে যাবে। এটাও হারাম। ইয়াবা তো নেশা। এবং এটা মরণ নেশা। জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এর মাধ্যমে কোনো শক্তি আসে না। শক্তি ক্ষয় হয়। মানুষ ক্রমান্বয়ে শক্তি হারিয়ে ফেলে।

[এটা এখন আমাদের সমাজে মারাত্মক ব্যাধি। তরুণ সমাজকে গ্রাস করেছে। কীভাবে বেরিয়ে আসতে পারি? -উপস্থাপক]

বেরিয়ে আসতে পারব না। কারণ যারা গ্রাস তারাই টাকার মালিক। তারাই মিডিয়ার মালিক। যদি আমাদের সকল মিডিয়ায় নৈতিকতার প্রচার হত। এগুলো সম্পর্কে ভালো কথা হত। উলামায়ে কিরাম দুনিয়ার এবং আখিরাতে এর খারাপ পরিণতির কথা বলতেন। আমাদের একজন জেলা প্রশাসক ছিলেন। যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা চলছিল। তখন তিনি মশকরা করে বলতেন, স্যার, আসলে আমরা জেলা প্রশাসকরা, বড়বড় টিভিতে, বড়বড় মন্ত্রী, তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপদেষ্টারা যা-ই বলে, ওরা গ্রহণ করে না। জনগণ বোঝে ওরা দুই নাম্বার। কিন্তু ইমাম সাহেব যখন মসজিদে গিয়ে কথা বলে। ওযু করে গিয়ে বসে মানুষ ভক্তি ভরে শোনে। এটাতে তা'সীর হয়।

আজকে যদি মিডিয়ায় যুবসমাজের জন্য নৈতিকতার কথা বলার অধিকার, সুযোগ আলিমদের থাকত! কিন্তু মিডিয়ার মালিকও তো পয়সাওয়ালা। কাজেই তারা যে ছবিগুলো দেখাচ্ছেন, হয়ত ইয়াবার প্রচার তারা করছেন না, কিন্তু যে কাজগুলো প্রচার করছেন, ইয়াবার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা বড় কঠিন। এর হাত থেকে বের হওয়া কঠিন।

পোশাক/পর্দা/সাজসজ্জা

জিজ্ঞাসা: ৬৮

একবোন প্রশ্ন করেছেন, আমি পর্দা করি। আমার হাত এবং মুখ কি ঢাকতে হবে?

জবাব:

আসলে এই বিষয়ে মতভেদ সুপরিচিত। তবে কুরআনের আলোকে মুখ ঢাকাটা জোরালো। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কন্যাগণ, স্ত্রীগণ, মুমিন নারীগণ; আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তারা যেন তাদের মাথার বড় কাপড়টা নামিয়ে দেয়।[১] মাথার কাপড় যদি নামানো হয় তাহলে স্বভাবতই মুখটা ঢাকা যায়। তা নাহলে মাথার কাপড় নামালে আর কী ঢাকা যাবে? মুখ-ই তো ঢাকা যাবে? এজন্য এটা খুব সুস্পষ্ট।

জিলবাব হল বাইরে যাওয়ার সময় যে কাপড়টা পরা হয় এবং পুরো দেহ ঢেকে যায়। এই জিলবাব যদি আমার মাথার উপর থেকে নামিয়ে দিই তাহলে স্বভাবতই এটা মুখ ঢেকে যাবে। আর হাদীস শরীফে এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত সাহাবিদের থেকে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেন মুখ ঢাকা ফরয। কেউ বলেছেন ফরয নয়। তবে মুখ ঢাকা উত্তম– এই ব্যাপারে কারোরই কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিমত নেই। যারা বলেছেন ফরয নয়। সুন্নাত বলেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবিয়া বৃদ্ধ অবস্থায়ও মুখ

১. সূরা: [৩৩] আহযাব, আয়াত: ৫৯।

ঢেকে রাখতেন। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। হাতের বিষয়টা কব্জি পর্যন্ত হাত খোলা রাখার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে। আর কর্মের জন্য খোলা যেতে পারে। প্রয়োজন না হলে ঢেকে রাখা ভালো।

জিজ্ঞাসা: ৬৯

একবোন প্রশ্ন করেছেন, মহিলাদের মুখ, হাতের কবজি, পা ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় ঢেকে রাখার বিধান কী?

জবাব:

মহিলাদের হাত কবজি পর্যন্ত খুলে রাখার ব্যাপারে সহীহ হাদীস আছে। পায়ের ব্যাপারে কোনো হাদীস নেই। স্বাভাবিকভাবে হাদীস থেকে বোঝা যায়, পা ঢেকে রাখতে হবে বাইরে গেলে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বললেন, পুরুষদের টাখনুর উপরে কাপড় পড়তে হবে তখন মহিলারা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কী করব? তিনি বললেন, এক বিঘত নামিয়ে দেবে। তখন তারা বললেন, এক বিঘত নামালে তো পায়ের পাতা বেরিয়ে যাবে। তখন তিনি বললেন, আরো এক বিঘত নামিয়ে দেবে। যদি কাপড় নাপাক হয়ে যায়, পরবর্তিতে মাটিতে চললে ওইটা পাক হয়ে যাবে। এতে বোঝা যায়, পা আবৃত থাকবে।

কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, পায়ের উপরে খোলা যেতে পারে। কিন্তু হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, পা আবৃত থাকবে। এজন্য মহিলারা বাইরে গেলে, ঘরের বাইরে বা গায়ের মাহরাম পুরুষের সামনে পা পুরো আবৃত রাখবেন। এটাই বোঝা যায় হাদীসের আলোকে। মোজা পরবেন, ভালো মোজা। আর কবজি পর্যন্ত হাত খোলার ব্যাপারে হাদীস আছে। মুখ খোলা রাখার ব্যাপারে ফুকাহাদের মতভেদ আছে। হাদীসের আলোকে মুখ খোলার বিষয়ে পাওয়া যায়, ঢাকার বিষয়ে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে বিভিন্ন মিডিয়ায় এগুলো নিয়ে অনেক কথা হয়, আমরা লম্বা করব না। তবে কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

তারা যেন তাদের মাথার কাপড়টা নামিয়ে নেয়।[২] জিলবাব যেটা বাইরের কাপড় মাথা ঢাকা হয়। বোরখা জাতীয়। মাথার কাপড় যদি নামিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো মুখটাই ঢাকা হয়। তাহলে কুরআনের এই আয়াত প্রমাণ করছে যে, বাইরে গেলে মুখটা আবৃত করতে হবে। এটাই বোঝা যায়। এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও এটা বোঝা যায়। মুসলিম উম্মাহর সকল ফকীহ কুরআন-সুন্নাহর নস অনুসারে একমত যে, শুধুমাত্র মুখমণ্ডল এবং এই হাতের কবজির ব্যাপারে মতভেদ ছাড়া পুরো শরীর ঢাকতে হবে। এই ব্যাপারে সবাই একমত। মাথার চুল, কান, ঘাড়, গলা বাইরে রাখা যাবে না। বাইরে যেতে বা গায়ের মাহরাম পুরুষের সামনে– এই ব্যাপারে সবাই একমত। হাদীস এই ব্যাপারে স্পষ্ট, কুরআন স্পষ্ট। তবে মুখের ব্যাপারে মতভেদ আছে। মতভেদটা খুব সামান্য। সবাই একমত। কিন্তু মুখটা ঢেকে রাখা উত্তম। ফরয না নফল, এটা নিয়ে মতভেদ।

আবার সবাই একমত, প্রয়োজনে, পেশাগত প্রয়োজনে, সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজনে, চিকিৎসার প্রয়োজনে, নিরাপত্তার প্রয়োজনে মুখটা খোলা যাবে। এটাও সবাই একমত। শুধুমাত্র যখন প্রয়োজনীয়তা নেই খোলার, সাধারণ সময়ে খোলা রাখব না ঢেকে রাখব? সবাই মোটামুটি একমত ঢেকে রাখা উত্তম। রাসূল (ﷺ) এর বিবিরা, অনেক সাহাবিয়া বৃদ্ধ বয়সেও ঢেকে রাখতেন। কেউ কেউ বলেছেন, ঢেকে রাখাটা উত্তম তবে ফরয নয়। আবার কেউ কেউ বলছেন, ঢেকে রাখাটা ফরয, প্রয়োজন ছাড়া খোলা যাবে না। আমাদের চেষ্টা করা উচিত ঢেকে রাখার। একান্ত পেশাগত প্রয়োজনে, নিরাপত্তার প্রয়োজনে বা যেকোনো প্রয়োজনে আমরা খুলতে পারি। তবে খোলার শর্ত হল, কোনো অলংকার থাকবে না, কোনো মেকাপ থাকবে না। এরকম অবস্থায় মুখটা খোলা যেতে পারে। বাকি সকল অবস্থায় মুখটা ঢেকে রাখাটাই নিরাপদ। এটা তাকওয়ার জন্যও এবং মাসআলার জন্যও নিরাপদ।

জিজ্ঞাসা: ৭০

হিজাব বলতে আসলে কী বোঝায়? এরকম অনেক মুসলিম বোনকে দেখা যায়, হয়তো নিচে একটা প্যান্ট পরেছেন, খুব আঁটোসাঁটো, টাইট। একটা

---

২. সূরা: [৩৩] আহযাব, আয়াত: ৫৯।

গেঞ্জি পরেছেন। ঠিক উপর দিয়ে মাথাটা ঢাকা আছে। এটাতে হিজাব হয় কি না?

জবাব:

ইসলামি হিজাবের বেশ কয়েকটা পর্যায় আছে। আমরা সংক্ষেপে যেটা বলতে পারি, হিজাব শুধু পোশাক নয়। হিজাবের প্রথম বিষয় হল, নারী পুরুষের মিশ্রণ যেটা, এটা হারাম। অর্থাৎ এমন হবে না, ছেলে-মেয়ে অবাধ মেলামেশা করবে। এমনকি পোশাক সহ-ই একটা ছেলে, একটা মেয়ে একা থাকবে অথবা অবাধ মেলামেশা হবে। এটাকেও কিন্তু ইসলাম নিষেধ করে। এটা হিজাবের-ই একটা অংশ। আরো অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। পারিবারিক বিষয়। কারো বাড়িতে ঢুকতে অনুমতি নেওয়া ইত্যাদি।

হিজাবের একটা বিষয় হল পোশাক। ইসলামি হিজাবের অনেকগুলো দিক রয়েছে। তার একটা হল পোশাকটা সারা শরীর ঢাকবে। শুধু মুখের ব্যাপারে কিছু মতভেদ আছে। এটা আমরা সবাই জানি। আর এটার আরেকটা বিষয় হল, পোশাকটা ঢিলেঢালা হবে। শরীরের অঙ্গটা পোশাকের বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। যদি বোঝা যায়, তাহলে কাপড় খুলে থাকা একই বিষয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

رُبَّ كَاسِيَاتٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَاتٍ فِي الْآخِرَةِ.

অনেক কাপড়পরিধানকারী আমার উম্মাতের মেয়ে যারা কিয়ামতের দিন উলঙ্গ বলে গণ্য হবে।[৩] এজন্য যদি কেউ এমন পোশাক পরে যেটা এত আঁটো, শরীরের আকৃতিটা পোশাকের বাইরে থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তাহলে এটা পোশাক হল না। দ্বিতীয়ত, এত বেশি পাতলা হবে না যে, গায়ের চামড়াটা প্রকাশ পায়। সেজন্য যে দেশের মেয়েরা যে পোশাক পরে– কোনো দেশের মেয়েরা যদি প্যান্ট পরে থাকেন প্যান্টটা ঢিলাঢালা হতে হবে। গায়ের পোশাকটা ঢিলেঢালা হতে হবে। এবং আল্লাহ কোরআন কারীমে বলেছেন:

---

৩. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৬৫৪৫; সহীহ বুখারি, হাদীস-১১২৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২১৯৬।

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ.

[তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়।][৪]

'জিলবাব' মানে গায়ের পোশাকের ওপরে ভিন্ন একটা পোশাক। যেটা শরীরের আকৃতিকে ঢেকে রাখবে। মাথাটাকে ঢেকে রাখবে। এজন্য যে মেয়ে মাথায় কাপড় দিয়েছেন তিনি আলহামদু লিল্লাহ, মাথা খোলা রাখা মেয়ের চেয়ে অবশ্যই ভালো। তবে শরীরের অন্য পোশাক যদি টাইট হয় তাহলে তার পর্দাটা পুরো আদায় হবে না।

[আগের মা-বোনদের দেখা যেত খুব ভালোভাবে পর্দা করতে। কিন্তু ইদানিং স্টাইলিশ হিজাব আসার কারণে কিছুটা...। -উপস্থাপক]

এটার পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই আছে। আগে অনেকে মোটেও পর্দা করতেন না। তাদের তুলনায় অন্তত নিজেদের ম্যাচিং করে স্টাইলিশ কিছু পর্দা তারা করছেন। এটা একটু ভালো।

জিজ্ঞাসা: ৭১

আমি আমার বোনকে ১২/১৩ বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছি। ক্লাস সেভেন অথবা এইটে পড়ে। বোন এবং বোন জামাইয়ের সম্মতিতেই তারা যদি খাস পর্দা করে, এতে তার অধিকারের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করা হল কি না?

জবাব:

তারা নিজেরা সম্মতিতে বিয়ে করেছে। ১৩/১৪ মানে তো তারা শরীআতের মুকাল্লাফ হয়ে গেছে। সাবালক হয়ে গেছে। কাজেই তাদের উপর পর্দা করা ফরয। তারা যদি শরীআহ মতে পর্দা করে... এটা তো খুবই দরকার।

জিজ্ঞাসা: ৭২

আমাদের এলাকাতে কলেজ আছে। সেই কলেজের একছাত্রী হিজাব পরে যান। তাকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের

৪. সূরা: [৩৩] আহযাব, আয়াত: ৫৯।

সেই বোন কী করবেন? পর্দা ছেড়ে দেবেন না কি রাখবেন?

জবাবঃ

প্রথমত, এটা একটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। সাধারণত বিশ্বের কোথাও মুসলিম উম্মাহ..., মুসলিম কোনো দেশে মানুষের ন্যূনতম অধিকারকে হরণ করা হয় না। কারণ আমি কোন ধর্ম পালন করব, কী পোশাক পরব এটা, আমার ন্যূনতম মানবাধিকার। কী খাব, এখানে কেউ হস্তক্ষেপ করবে, এটা মানবাধিকারের সাথে সর্বোচ্চ সাংঘর্ষিক। আমরা জানি, ইংল্যান্ডে মামলা করে মেয়েরা হিজাব পরে ক্লাস করার অধিকার পেয়েছে। আমেরিকাতেও একই কথা।

যদি কোথাও এটা হয়ে থাকে, এটা অত্যন্ত অন্যায়। বর্বরতা। মানবতাবিরোধী কাজ। আমাদের বোনের দায়িত্ব হল আইনের আশ্রয় নেওয়া। মানবাধিকার কর্মীদের আশ্রয় নেওয়া। এবং আইন তার এই অধিকার ফিরিয়ে দেবে। কারণ তিনি কী পোশাক পরবেন, এটা নির্বাচন করার অধিকার তার আছে। এখানে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো নেই। তাকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার এই অজুহাতে তিনি পর্দা বর্জন করতে পারেন না। তিনি হারাম করতে পারেন না। তিনি তার পর্দাসহ লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য আইনত লড়াই করবেন। প্রয়োজনের কলেজ পরিবর্তন করবেন। আইন তার পক্ষে থাকবে বলে আমরা মনে করি বা আশা করি।

[আমাদের দেশে নারীদের উপরে যে নির্যাতনগুলো হয়, এসিড নিক্ষেপ জাতীয়। পর্দার কারণে এগুলো কিন্তু হচ্ছে না। সেটা কিন্তু আমরা চাই না, এদিকে আবার হিজাবকেও চাচ্ছে না। -উপস্থাপক]

আসলে এখানে বিষয় হল, আমরা সবাই চাচ্ছি একটা শালীন সমাজ। সবাই চাচ্ছি এই ধরনের যে সমস্যাগুলো– গণধর্ষণ অথবা ইত্যাদি বড় অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে, এটা বন্ধ হয়ে যাক। কিন্তু চাওয়ার জন্য আমাদের পদ্ধতি... ধর্ম বলছে, উপকরণগুলো বন্ধ করো। আমরা বলছি, উপকরণগুলো চালু রেখে কর্মটা বন্ধ করো। এটা সাধারণত হচ্ছে না। হচ্ছে না এটার প্রমাণ, অনেকে বলতে চাচ্ছেন আস্তে আস্তে হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনি ইউরোপে দেখেন। আমেরিকায় দেখেন। সেখানে ধর্ষণের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। কমছে না! সেখানে সকল প্রকার অবৈধ সম্পর্ক বৈধ। সেখানে সকল প্রকার অশালীনতা বৈধ। তারপরেও জোর করে ধর্ষণ প্রবণতা, এগুলো ব্যাপক হারে বাড়ছে।

তার মানে মানুষের ভেতরে যে পুরুষত্ব রয়েছে, এই পুরুষত্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে নারীদেরকে শালীন পোশাক পরার কোনো বিকল্প নেই। এখন অনেক দেশেই নারীদেরকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে ধর্মের নামে নয়, আত্মরক্ষার জন্যই শালীন পোশাক পরতে। কাজেই আমাদের ধর্ম যেহেতু শালীন পোশাক পরতে নির্দেশ দিয়েছে, আমাদের উচিত সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে মেয়েদেরকে শালীন পোশাক পরতে উদ্বুদ্ধ করা। এবং সমাজকে এই ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দেন।

জিজ্ঞাসা: ৭৩

মেয়েরা যে বাইরে লেখাপড়া করতে যায়। এক্ষেত্রে তাদের বিষয়টা কতটুকু বৈধ হবে? এখানে তো অনেকেরই মাহরাম থাকছে না। সেক্ষেত্রে?

জবাব:

সফরের জন্য মাহরাম ওয়াজিব। ফরজ। অর্থাৎ সফরটা মাহরাম-সহ হতে হবে। সফরের পরে সেখানে অবস্থানের জন্য দীনি পরিবেশ লাগবে। প্রথমত, আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন প্রশ্নের অনেক সম্মুখীন হই। মেয়েরা অনেকে নিজেরা ভালো রেজাল্ট করেছেন। প্রযুক্তিবিষয়ক বিষয়ে। এখন বিদেশে যাবেন। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা। আমার প্রশ্ন হল, আপনি অস্ট্রেলিয়া-কানাডা না গেলে আপনার জীবন কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হবে? আপনি দেশের ডিগ্রিসহ যে চাকরি পাবেন, আপনার বাকি যে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বছরের জীবন, এই চাকরিতে কতটুকু খারাপ থাকবে? আমি যে রিস্ক নিয়ে যাচ্ছি... বিষয়টা যদি এমন হত, বিদেশের ডিগ্রি না হলে দুনিয়াতে আমার চলবে না। এটা একটা কথা ছিল। যে রিস্ক নিয়ে আমি যাচ্ছি, আমার ভেতরে ঈমান আছে। কিন্তু আমি শরীআহ লঙ্ঘন করে হারাম করে একটা পরিবেশে যাচ্ছি।

মানুষকে আল্লাহ দুর্বল করে বানিয়েছেন। আমরা মাঝেমাঝে বলি, গরু, ছাগল, শুয়োর, কুকুর কত ভাগ্যবান! স্কুলে যাওয়া লাগে না। মুখস্থ করা লাগে না। লেসনও (শিক্ষা) নেওয়া লাগে না। কারণ ওদের লেসন ওদের সাথেই। আল্লাহ ওদের ব্রেনে কম্পিউটারের মতো সেভ করে দিয়েছেন। এজন্য মায়ের পেট থেকে পড়েই দুধ খাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। মায়ের পেট থেকে পড়েই পিরপির করে পানিতে চলে যায় হাঁসের বাচ্চাটা। কোনো ট্রেনিং লাগে না। একটা হল আমরা একেবারে জিরো। বেরিয়ে আসি। মূল বিষয়গুলো প্রোগ্রামাইসড করা আছে। বাকি আমাদের মানবীয় মূল্যবোধ, অনুভূতি সবকিছু নিতে হয়। আবার নিলে হয় না। এটা আবার বারবার চর্চা করে মনে রাখতে হয়। কিছুদিন পরে ভুল হয়ে যায়।

আমার এখন ঈমান আছে, চেতনা আছে। আমি ওই ঈমানহীন পরিবেশে গিয়ে রাখতে পারব কি না, এই নিশ্চয়তা কোথায়? পরিবেশ, বারবার বিভিন্ন বন্ধুর কথাবার্তায়, চালচলনে আমার ঈমান হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এজন্য শরীআতের দৃষ্টিতে সফরের জন্য মাহরাম লাগবে। আর যেখানে আমি থাকব সেখানে থাকার জন্য ইসলামিক পরিবেশ লাগবে। এই দুটো যদি থাকে তাহলে, ইনশাআল্লাহ, বৈধ হবে। তবে এক্ষেত্রেও রিস্ক রয়ে যাবে। কারণ একজন মেয়ে তার মাহরাম, আপনজন বা পরিবেশ ছাড়া, স্বামী ছাড়া যেকোনো মুহূর্তে সে নিজে বিপদে পড়তে পারে অথবা কেউ তার উপর বিপদ চাপিয়ে দিতে পারে।

জিজ্ঞাসা: ৭৪

মেয়েরা যে চুল কাটে। বব করে। বিভিন্ন কাটিং করে। এটা আসলে সৌন্দর্যের জন্য করা যায় কি না?

জবাব:

মেয়েরা চুল কাটবে। প্রথম যে শর্ত ইসলামে এসেছে– পুরুষালি চুল কাটতে পারবে না। হাদীস শরীফে এসেছে: –

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

যে সমস্ত পুরুষ নারীদের অনুকরণ করে মেয়েলি চলতে চায়। আর যে

সকল নারী পুরুষালি ভঙ্গিতে– পুরুষালি জুতা, পুরুষালি পোশাক, পুরুষের চুল– এদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লানত করেছেন।[৫] নারী পুরুষকে আল্লাহ পৃথক করে সৃষ্টি করেছেন। আর এই পার্থক্যের উপরে বিশ্ব টিকে আছে। নারীকে নারী প্রকৃতি, নারিত্ব রক্ষা করতে, পুরুষকে পুরুষ প্রকৃতি রক্ষা করতে হবে। এটা বৈষম্য নয়, ভারসাম্য। এজন্যই ইসলাম নারীদের জন্য সকল সৌন্দর্য বৈধ করেছে। কিন্তু পুরুষালি ছাট অবৈধ করেছে। এরপরে যদি এমন ছাট হয়, যেটা নারী বলে বোঝা যায়, এটা অবৈধ বলা যায় না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর স্ত্রীগণ কেউ কেউ চুল ছেটেছেন। যে পরিমাণ ছাটলে মেয়েলি ছাট থাকে, এই পরিমাণ ছাটা যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা: ৭৫

মেয়েরা হাতে এবং পায়ের নখে যে নেলপলিশ দেয়, এটা কতটুকু বৈধ?

জবাব:

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মেয়েদেরকে সৌন্দর্য চর্চা করতে উৎসাহ দিতেন। এর অংশ হিসেবে মেয়েদের হাতে পায়ে মেহেদি পরতে উৎসাহ দিতেন। যদি দেখতেন কোনো মহিলার হাতে মেহেদি নেই, রাগ করতেন। তুমি বেটাছেলে না কি? পুরুষালি হাত কেন! হাতে মেহেদি পরো। তিনি উৎসাহ দিতেন। কাজেই মেহেদি পরা এবং এ জাতীয় ন্যাচারাল সৌন্দর্য বর্ধন করা, মেহেদির রং দেওয়ার ব্যাপারে ইসলাম মেয়েদেরকে উৎসাহ দেয়।

নেলপালিশ পরাটা মূলত অবৈধ নয়। কিন্তু নেল পালিশ নখের উপরে একটা আস্তরণ তৈরি করে। এটা থাকলে ওযু হবে না। কাজেই ওযু করতে হলে এটাকে আবার তুলে ফেলতে হবে। রিমুভার দিয়ে। এটা অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য এগুলো বর্জন করা উচিত। কেউ যদি পরেন তাহলে অবশ্যই ওযুর আগে তুলে ফেলতে হবে।

জিজ্ঞাসা: ৭৬

অনেকে দাড়ি বা চুলে খেযাব (কলপ) ব্যবহার করেন। কালো খেযাব। এটা ব্যবহার করা যায় কি না?

৫. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৮৮৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৯৩০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৭৮৫।

জবাব:

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মেহেদি বা মেন্দির সাথে নীলচে, কালচে খেযাব ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু কালো লাগাতে নিষেধ করেছেন। কালোর ভেতরে অনেকগুলো সমস্যা থাকে। একটা হল নিজেকে গোপন করা। নিজের প্রকৃতিকে পরিবর্তন করা। ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা, যে, আমি এখনো কালো আছি! এটা ইসলাম সমর্থন করে না। কৃত্রিমতা। তবে সৌন্দর্য সমর্থন করে। আপনি নীল লাগান অথবা মেন্দির সাথে আরো কিছু, যেটাকে কাতম বলা হয়। নীলচে বা কালচে হয়ে যায়। কিন্তু বোঝা যায় এটা মেহেদি। এটা সাদা চুলকে রঙিন করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আরো জরুরি বিষয় হল, মেন্দি প্রাকৃতিক। আর কেমিক্যাল বিষয়গুলো আমাদের ত্বকের অনেক ক্ষতিও করে। এমনকি ক্যামিক্যাল মেন্দিগুলো আমাদের অনেক ক্ষতি করে। কাজেই আমাদের প্রকৃতির কাছে থাকা দরকার। আর কালোর ব্যাপারে হাদীসে বারবার নিষেধ আসছে। আবু বাকর (রা.) এর আব্বাকে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তার দাড়ি-চুলে খেযাব দাও। কালো দিয়ো না।[৬] অন্য হাদীসে, আবু দাউদের সহীহ হাদীসে এসেছে, শেষ জামানায় কিছু মানুষ দাড়িচুল কালো করবে। এরা জাহান্নামে যাবে।[৭] কাজেই দাড়িচুলে কালো খেযাব দেওয়া, কালো কলপ দেওয়া আমাদের মোটেও ঠিক নয়।

কোনো কোনো ফকীহ জায়িয বলেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীসের বিপরীতে। কারো মতকে এনে হাদীসটাকে লঙ্ঘন করার প্রবণতা ভালো নয়। এই দুর্বল মতটাকে আলিমরাও ব্যবহার করতে চান, এটা মোটেও ঠিক নয়। এটা আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা। প্রবৃত্তির অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে দু একজন অমুক সাহাবি বা অমুক তাবিয়ি করেছেন, এই অজুহাতে যদি আমরা সুন্নাতকে ছেড়ে দিই তাহলে ইসলাম থাকে না।

আপনি মুসান্নাফাত বইগুলো পড়েন। দেখবেন সাহাবিগণ অনেক কাজ করেছেন, যেটা আমরা করি না। তারা হয়ত হাদীসটা জানতেন না অথবা

---

৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস-২১০২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪২০৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫০৭৬।
৭. সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪২১২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫০৭৫।

ব্যক্তিগত ইজতিহাদে করেছেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কোনো হাদীস-সুন্নাত জানার পরে, কোনো নিষেধাজ্ঞা জানান পরে এর বিপরীতে কোনো মানুষের আমল দিয়ে দলীল দিয়ে সুন্নাতকে অমান্য করা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিষেধাজ্ঞাকে ভায়োলেট (অমান্য) করার প্রবণতা, এটা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক।

পিতামাতা ও সন্তানের অধিকার

জিজ্ঞাসা: ৭৭

একভাই প্রশ্ন করেছেন, পিতা পুত্রকে ত্যাজ্য করে দেওয়ার পরে ছেলের পক্ষের হুকুম কী? অর্থাৎ ছেলে কী করতে পারে এই ক্ষেত্রে?

জবাব:

প্রথম কথা হল, ত্যাজ্যপুত্র করাটাই শরীআতে বৈধ নয়। আর পিতারা ত্যাজ্যপুত্র করেন অধিকাংশ সময়ে নিজেদের অন্যায়ের কারণে। এরকম যথেষ্ট ঘটে, সন্তান পিতার অবাধ্য। অবাধ্য কেন? সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে অবাধ্য হয় নি। পিতা তাকে সঠিকভাবে লালন করেন নি তাই। উমার ইবন খাত্তাব (রা.) এর কাছে একপিতা সন্তানকে ধরে নিয়ে এসেছে যে, এই ছেলেটা আমার খুব অবাধ্য। একে একটু শাস্তি দেন। উনি শাস্তি দিতে গিয়েছেন। ছেলেটা বলছে, হুযুর আমার একটা কথা আছে। শুধু কী সন্তানেরই দায়িত্ব পিতার খেদমত করা না পিতারও কিছু দায়িত্ব আছে? তখন উমার ইবন খাত্তাব (রা.) বললেন, হ্যাঁ, পিতার দায়িত্ব আছে তো। সন্তানের জন্য একটা ভালো মা চয়েজ করা। সন্তানের ভালো নাম রাখা। সন্তানের ভালো শিক্ষা দেওয়া। তাকে ভালো মানুষ হতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা– এগুলো পিতার দায়িত্ব। তখন ওই সন্তান বলেছে, আমার পিতা এই তিনটি ব্যাপারেই অবহেলা করেছে। আমার জন্য ভালো মা চয়েজ করে নি। ভালো দ্বীনদার ধার্মিক মা আমার জন্য চয়েজ করে নি। আমার নামটা বড্ড খারাপ রেখেছে। আর আমাকে কোনো শিক্ষা দেয় নি। তখন উমার (রা.) লাঠি দিয়ে পিতাকে মারতে গেলেন যে, তুমি নিজে করেছ অন্যায় আর এখন দোষ সন্তানের ঘাড়ে চাপাচ্ছ কেন?

আমরা অনেক সময় দোষ দিই, সন্তান খুব অবাধ্য। কিন্তু সে কেন অবাধ্য?

ওর বয়স যখন চার ছিল, পাঁচ ছিল, কই তখন তো অবাধ্য ছিল না! এটা গেল একটা পর্যায়। অর্থাৎ আমরা যে অপরাধ করেছি, সন্তানদেরকে পিতামাতার প্রতি যে দায়িত্ব, যে শিক্ষা, দীনি শিক্ষা, তাকওয়ার শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা এটা দিই নি। যখন তারা বড় হয়েছে। তখন তাদের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করি নি। তাদের সাথে দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছি। এই দূরত্ব হওয়ার কারণেই তারা অবাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আরেকটা কারণে পিতা ত্যাজ্যপুত্র করেন, বিয়ের পরে কথা শোনে না। ছেলে বউ নিয়ে পৃথক হয়ে গেছে। বিয়েটা কে দিয়েছে? এখন পর্যন্ত আমাদের সমাজে বিয়ে বাবাই দেন। বিয়ে দেওয়ার সময় বাবা কী দেখেছিলেন? খুব সুন্দরী পুত্রবধূ এবং বিয়াই সাহেবের সম্পদ অনেক আছে। আর এই ধরনের পুত্রবধূ স্বভাবতই স্বামীকে নিয়ে আলাদা হবে! এজন্য তো পুত্রকে দোষ দেওয়া যায় না। আপনিই তো বিয়েটা দিয়েছিলেন? এজন্য কোনো সন্তানকে অবাধ্যতার কারণে ত্যাজ্যপুত্র করাটাই হারাম। এটা কঠিন অন্যায়। শুধুমাত্র কোনো ছেলে মুরতাদ হয়ে গেলে, দীন ত্যাগ করলে, কুফরির ভেতরে গেলে সেটা ভিন্ন বিষয়।

এখানে পিতা অন্যায় করেছেন। পিতাকে তাওবা করে ঠিক করে দেওয়া উচিত। আর যদি কখনো পিতা এমন করেন, সেক্ষেত্রে পুত্রের জন্য পিতার খেদমতের দায়িত্ব থেকেই যাবে। পুত্রের দায়িত্ব পিতার প্রতি খেদমত করা, তার কথা শোনা। পিতা যতই গোনাহগার হোক, পিতা অমুসলিম হোক, কিন্তু পুত্রের দায়িত্ব পিতার খেদমত করা, শেষ জীবনে তার পাশে থাকা, তার বিপদাপদে থাকা, তার খরচ বহন করা।

জিজ্ঞাসা: ৭৮

একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন দ্বারা বোঝা যাচ্ছে উনি খুব বয়স্ক মানুষ। উনি বলেছেন যে, আমার অনেক বয়স হয়েছে। কিন্তু আমার সন্তানাদি যারা আছেন তারা আমার দিকে নযর দিচ্ছে না। আমার খেদমত করছে না। ইসলাম তো বলেছে, পিতামাতার খেদমতের জন্য। আসলে এই মুহূর্তে এই বয়ঃসন্ধিক্ষণে এসে আমি কী করতে পারি? সন্তানের পক্ষ থেকে আমি কী কামনা করতে পারি?

জবাবঃ

বৃদ্ধ বয়সে সন্তানেরা পাশে না থাকাটা, এটা খুবই কষ্টের, বেদনার কথা। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ কিন্তু শুধু খাওয়া এবং পরা চায় না। বৃদ্ধাশ্রমে বসে নার্সের হাতে খাওয়া-পরা এটা তারা চায় না। মানবীয় প্রকৃতি হল, ছোট্ট বেলায় যেমন মানুষ শুধু খাওয়া চায় না। খাওয়ার সাথে একটু স্নেহ মায়া মমতার অবরণ চায়। শুধু খাওয়াতে তৃপ্ত হয় না। ঠিক শেষ বয়সেও মানুষ শুধু খাওয়া, শুধু পরাতে তৃপ্ত হয় না। আশেপাশে কিছু আপনজন পেতে চায়। এই আধুনিক সভ্যতা আমাদেরকে এই সুন্দর ব্যাবস্থাপনা থেকে বঞ্চিত করেছে। মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে।

আমরা আমাদের সকল পাঠক ভাইবোনদেরকে বলব, এক্ষেত্রে বৃদ্ধ বয়সের করণীয় যেটা, এটা বলার আগে প্রথম বয়স থেকে কিছু করণীয় বলি। প্রথম বিষয় হল, আমাদের যখন আল্লাহ সন্তান দেন, এই সন্তানদেরকে আমরা জন্মের পর থেকে ৭-৮ বছর অত্যন্ত মায়া মমতায় লালন পালন করি। এরপরে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের দূরত্ব হয়ে যায়। ইসলাম কিন্তু এটা বলে না। ইসলাম মূলত বলছে, তোমার সন্তানেরা একেবারে বিবাহ পর্যন্ত তোমার সন্তানের মতোই থাকে। ৭-৮ বছর তো হৃদয়ের টানে দেবেই। এরপর তাদেরকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যাও। তাদের লেখাপড়া শেখাও। তাদের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করো। তাদের যত ব্যক্তিগত মাসআলা আছে সুন্দর করে তাদেরকে বোঝাও। তাদের সবকিছু জানতে চাও। মানে তাদের তোমরা বন্ধু হয়ে যাও। এমনকি তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়েও প্রশ্ন করো। পুত্রবধূকে উমার (রা.) প্রশ্ন করছেন, আবদুল্লাহ কেমন ছেলে? অর্থাৎ তোমার সাথে কেমন আচরণ করে? গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন। পুত্রবধূও বলছেন, আলহামদু লিল্লাহ, খুবই ভালো ছেলে। সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ে। এখানে বাবা বুঝেছেন, এখানে অভিযোগটা কী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে চলে গেছেন। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি, সে নামায পড়ে বেড়ায়। বউকে সময় দেয় না। তাহলে স্ত্রীকে সময় দিচ্ছে কি না বিয়ের পরেও পিতাকে খোঁজ নিতে হবে। তাদের সাথে সম্পর্কটা কেমন আছে, গভীর আছে কি না। তারা কোথাও ভুল করছে কি না। আমরা যদি এইভাবে তাদের সাথে থাকতাম তাহলে ওরা আমাদেরকে এইভাবে ছেড়ে যেতে পারত না। এটা আমাদের একটা ভুল।

দ্বিতীয় কথা হল, বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতাকে কাছে রাখতে হলে তার ভেতরে ঈমানি চেতনা লাগবে। এই ঈমানি চেতনা ছোট থেকে তাদের ভেতরে তৈরি করতে হবে। ধর্মীয় মূল্যবোধ যদি তৈরি হয়...। আসলে, আমি পাশ্চাত্যের কিছু আমেরিকান লেখকের বই পড়েছি। তারা মুসলিম হয়েছেন, তাদের পিতামাতা মুসলিম হন নি। কিন্তু মুসলিম হওয়ার পরে পিতামাতার যে দায়িত্বটা... কুরআন পড়েছেন তারা। আমাদের মতো কুরআন না পড়া ফী সাবীলিল্লাহ মুসলিম না। কুরআন পড়ে মুসলিম হয়েছেন। কাজেই পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব– পিতামাতা কাফির মুশরিক হলেও যে তাদের প্রতি দায়িত্ব, এই চেতনায় যখন তারা পিতামাতাকে খেদমত করছেন তখন পিতামাতা মহাখুশি হয়েছেন যে, আমার সব সন্তান কেন মুসলিম হচ্ছে না? কারণ যে ধর্ম তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছে, আমি তোমাকে গালি দিলেও তুমি আমার খেদমত করছ। আমি নিজে সে ধর্ম গ্রহণ করতে চাই, সকল মানুষ যেন সেই ধর্ম গ্রহণ করে।

[আমাদের দেশে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। দেখা যায় অনেক বৃদ্ধ বাবামাকে সন্তানেরা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসেন। তারা উচ্চশিক্ষিত, সরকারি চাকুরিজীবী। যখন ওই বৃদ্ধ বাবামায়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, আপনাদের কেন রেখে গেছে? তারা বলেন, তারা মনে করে বাসায় আমার খেদমতের জন্য তাদের একটু কষ্ট হবে। সেজন্য তারা এখানে রেখে গেছে। যদিও অনেক টাকা পয়সা দেয়। এই যে, এখানে ধর্মীয় অনুভূতি নেই। শিক্ষাটা কিন্তু আছে। - উপস্থাপক]

শিক্ষা আছে, সবই আছে। তারা পয়সা দিচ্ছে। ভাবছে পয়সা দেওয়াটাই বোধহয় সেবা। কিন্তু আসলে পয়সা তারা চাচ্ছেন না। এমনকি ছেড়া কাঁথ ায় প্রিয়জনকে যদি আশেপাশে দেখেন, কত স্পিরচুয়াল (প্রশান্তিদায়ক), মনের যে আনন্দ, এটা তারা বৃদ্ধ হলে তারপরে বুঝবেন। বৃদ্ধ হওয়ার পরে তার সন্তান যখন বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবেন তখন তারা বুঝতে পারবেন, এটা আসলে কী জীবন। তো যেটা বলছিলাম। আল্লাহ কুরআন কারীমে এই বিষয়টা বেশি বলেছেন। যখন পিতামাতার সাধারণ বয়স থাকে তখন সন্তানের খারাপ আচরণে তারা কষ্ট পান না। ২০ বা ১৫ বছরের ছেলে ৪০ বছরের পিতাকে খারাপ কথা বললে বা শুনব না তোমার কথা বললে মাইন্ড করে না। কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। ৬০-৭০ বছর বয়স, আর ৪০ বছরের ছেলে যদি একটু কটু কথা বলে, বাবার মনটা একদম

সংকুচিত হয়ে যায়। এই জন্য আল্লাহ বলেছেন:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا • وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

অনেক গুলো বিষয়। যদি তোমার পিতামাতা দুইজন কিংবা একজন বৃদ্ধ হয়ে যায়। জীবিত থাকে তোমার কাছে। তাহলে কী করবে?

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

তাদের সাথে একটু বিরক্তি... অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে মানুষ অনেক খারাপ কথা বলে, বুড়ো হয়ে গেলে শিশুর মতো হয়ে যায়, তাদের কোনো খারাপ কথায় তুমি একটুও বিরক্তি প্রকাশ করবে না। তাদেরকে রাগ করবে না। 'এই বাবা, তুমি কী বলছ! বুড়ো হয়ে গিয়ে বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে...'। এমনকি বাবার কথায়, 'আহ!' এমনটা করবে না। তাদের কাছে বিনম্র হয়ে যাবে। সুন্দর সুন্দর কথা বলবে। এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবে, আল্লাহ, আমি যখন শিশু ছিলাম পিতামাতা আমাকে কত মমতা করে রেখেছে। আমার পিতামাতা এখন শিশু, তুমি তাদেরকে মমতার সাথে রাখো, ভালো রাখো, সুস্থ রাখো।[১]

এই যে চেতনা, যদি কোনো সন্তানের মধ্যে গড়ে উঠে, তাহলে সে কখনোই বৃদ্ধাশ্রমে পিতামাতাকে ছাড়তে পারে না। পিতামাতা নিআমত। বৃদ্ধ পিতার সাথে, বৃদ্ধ মায়ের সাথে সময় দিতে পারা– এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে? এজন্য সন্তানদের ভেতরে এই অনুভূতি গড়ে তুলতে হবে।

তৃতীয়ত, আমাদের যাদের বয়স হয়েছে। পিতামাতাকে দেখছেন না, তাদেরকেও বলব, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

পিতামাতাই আমার জান্নাত, পিতামাতাই আমার জাহান্নাম।[২] তাদের মাধ্যমে ছাড়া জান্নাতে বা জাহান্নামে যাওয়া যাবে না। দুই নাম্বার হল, আমিও এক সময় বৃদ্ধ হব, আমার বয়স হবে। আমিও মানুষ। প্রযুক্তির কারণে আমরা রোবট হয়ে যায় নি। বৃদ্ধ বয়সে আমরা যে কষ্ট মাবাবাকে

১. সূরা [১৭] ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪।
২. সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৬৬২।

দিচ্ছি, তারচে বেশি কষ্ট আমাদেরকে পেতে হবে। কাজেই দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাঁচতে, দুনিয়ার বরকত পেতে এবং আখিরাতের শান্তি ও মুক্তি পেতে আমাদের পিতামাতাকে, বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে যত্ন করতে হবে।

[এখানে একটা বিষয়, একটু আগে যে হাদীসটা..., 'পিতা মাতাই আমাদের জান্নাত'। কিন্তু দেখা যায় পিতামাতাকে একটু ভালো ফল না খাইয়ে সেই টাকাটা কোনো দরবারে, মাযারে বা মসজিদে দিয়ে অথবা কোনো বাবার কাছে বলছি, আমার জন্য জান্নাতের দুআ করেন। অথচ বাবামা-ই আমার জন্য জান্নাত রয়ে গেছে। -উপস্থাপক]

এটা আরো দুঃখজনক, মানুষের বাবা কতজন হয়? আমি বড় অবাক হয়ে যাই। প্রথমত আমার বাবাতো যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন। আমার মা, যিনি আমাকে ধারণ করেছেন। আর কে আমার বাবা হতে পারে? ইসলামে কোনো নিয়ম নেই ধর্মগুরুকে বাবা বলার। খ্রিস্টান ধর্মে আছে। আমাদের ভারতীয় আদর্শে আছে, হিন্দু ধর্মে বাবা বলা। বাবা শব্দটারই ল্যাটিন শব্দ হল পোপ। পাপা, বাবা। এজন্য বড়বাবাকে পোপ বলা হয় হয়। এই যে বিষয়টা, রাসূল (ﷺ) এর সাহাবিরা তাঁকে বাবা বলেন নি। তাবিয়িরা সাহাবিদেরকে বাবা বলেন নি। বাবা তো একজন। যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন। আমার মা। দুই নাম্বার কথা হল, একটা লোককে আমি কল্পনা করলাম, লোকটা হয়তো বুযুর্গ। আল্লাহ জানেন, হয়তো ভণ্ডও হতে পারে, প্রতারক হতে পারে। কিন্তু আমাকে যিনি জন্ম দিয়েছেন, আমি জানি তিনি আমার বাবা। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। রাসূল (ﷺ) হাদীসে বলেছেন। বাবামা হল জান্নাত। বাবা মায়ের মাধ্যমে জান্নাতে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন:

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ...

তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যয় করবে? যা ব্যয় করুক, প্রথমে পিতামাতাকে দিতে হবে।[৩] আমার ব্যায়ের জন্য পিতামাতা। পিতামাতার দুআ আল্লাহ কবুল করেন, এটা সহীহ হাদীসে এসেছে। আমরা মনে করলাম, আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর একজন বুযুর্গ। এটা মনে করা, প্রমাণ নেই। আমি তার দুআর জন্য ২ হাজার টাকা দিলাম। আর আবদুস সালাম আমার পিতা, এটা কনফার্ম। আবেদা বেগম আমার মাতা, এটা কনফার্ম।

---

৩. সূরা: [২] বাকারাহ, আয়াত: ২১৫।

আল্লাহ নিশ্চিত বলেছেন, তাদের দুআ কবুল হবে। অথচ তাদের কাছে দুআ চাচ্ছি না। একটা কাল্পনিক ব্যক্তির কাছে দুআ চাচ্ছি। উপরন্তু দুআ কবুল হওয়ার পথ বন্ধ করে দিচ্ছি পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ করে। এটা সত্যিই দুঃখজনক। দ্বীনকে আমরা বুঝতে পারি নি।

জিজ্ঞাসা: ৭৯

অনেক মা-বাবা আছেন, তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে মাদরাসায় পড়াতে চান। কিন্তু ছেলেমেয়েরা মাদরাসায় যেতে চায় না। তারা অনেক সময় অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। দাবা খেলা, জুয়া খেলা ইত্যাদি অনেক গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের এই অসৎ কাজ কর্মের জন্য তাদের মা-বাবা আখিরাতে কি দায়ি থাকবেন?

জবাব:

মাবাবা যদি সন্তানকে ভালো পথে নেবার চেষ্টা করেন, দীনিশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু সন্তান যদি না গ্রহণ করে, এক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে মাবাবার কোনো দায় থাকবে না। সন্তান নিজের অপরাধের জন্য দায়ি হবে। আর মাবাবা যদি সন্তানকে শেখানোর চেষ্টা না করেন, আর এই না শেখার কারণে যদি সন্তান পাপ করে, এখানে মাবাবার দায়ভার থ াকবে। আর মাবাবার চেষ্টার পরেও যদি সন্তান না আসে, তাহলে মাবাবার দায়ভার থাকে না। মাদরাসায় সন্তানরা যেতে চায় না কেন? মনে হয় যেন মাদরাসায় মজা নেই। স্কুলটা অনেক মজাদার। এক্ষেত্রে পিতামাতার দায়িত্ব হল, মাদরাসা যে মজাদার, মাদরাসায় পড়ে যে তুমি বেশি ভালো করছ, এটা বোঝানো। পারিবারিকভাবে তাকে বেশি সম্মান করা। মানুষ অনেক সময় মাদরাসার ছেলেদের অবমূল্যায়ন করে। টুপি দেখলেই বলে, ওই হুযুর! ও মনের ভেতর একটা অবমাননা বোধ করে। আবার বাড়িতে গিয়েও যদি দেখে তার সম্মান কম। তখন সে নিশ্চিত হয়, আমার বাবামা আমাকে একটা অসম্মানের জায়গায় দিয়েছেন। তখন তার ভেতরে একটা প্রতিবাদ তৈরি হয়। এজন্য সে অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়। এজন্য পিতামাতার দায়িত্ব হল..., এই মাদরাসা শিক্ষা তার দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য কল্যাণকর, এজন্য তারা তাকে বেশি ভালোবাসেন, তার প্রতি বেশি সহানুভূতি রাখেন– এটা বোঝানো। যেন ওর ভেতরে এই ইয়াকিনটা আসে।

মুআমালাত

জিজ্ঞাসা: ৮০

আমরা জানি, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ফরয। কিন্তু আমরা বিয়ের পরে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিকভাবে বজায় রাখতে পারি না। এখন আমার প্রশ্ন হল, কীভাবে চললে আমার জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হবে?

জবাব:

এটা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব জরুরি প্রশ্ন। আমাদের দেশের লোকেরা নামাযকে একটা ইবাদত হিসেবে জানে। পড়ুক বা না পড়ুক। যাকাত যে আল্লাহর ইবাদত এটাও জানে। রোযাও জানে, করুক আর না করুক। কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা নামায-রোযার মতোই একটা বড় ইবাদত, এটা আমরা জানি না। দীনদার আলিম-উলামা, বুযুর্গ, আবিদ, কপালে দাগপড়া, দস্তরখান, টুপি-পাগড়ি সব ঠিক আছে। কিন্তু এই ফরয ইবাদত ঠিক নেই। নামায না পড়লে আল্লাহ শাস্তি দেবেন। কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে গযব দেবেন। হাদীস শরীফে বারবার এসেছে।

এখন আমরা কীভাবে এটা ঠিক রাখতে পারব। আচ্ছা! বলো তো, শীতের রাতে সকালবেলা উঠে ওযু করতে কষ্ট হয় না? কিন্তু কীভাবে তোমরা এটা করতে পার? যখন তোমাদের ইবাদতের চেতনা থাকে– না হলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। হলে আল্লাহ সাওয়াব দেবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার মূল বিষয় হল, এটা যে আল্লাহর ফরয ইবাদত। তুমি কখনো রিসিপ্রক্যাল (প্রতিদান চাইবে না) হবে না। সে তোমাকে হাজি বলবে,

তুমিও তাকে হাজি বলবে। আমরা এই থিওরিতে যাওয়ার কারণেই ফেল করি। ও আমাকে বিয়ের সময় দাওয়াত দেয় নি, ও আমার বিপদের সময় আসে নি, সুতরাং কেন আমি করব। এই চিন্তা যদি তোমার আসে, তাহলে তুমি পারবে না। তোমাকে যেটা করতে হবে, আল্লাহ আমাকে ফরয করেছেন, আমার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা, ভাবির সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা। আমার চাচাতো মামাতো খালাতো ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা। আমি এই দায়িত্ব পালন করব। সে করল বা না করল, তার ব্যাপার। সে পারে নি বলে তো আমি বাদ দিতে পারি না। এটা অনেকটা নামাযের মতো। সে নামায বাদ দিলে তো আমি বাদ দিতে পারি না। তুমি যখন এটাকে ইবাদতের চেতনায় নিয়ে যাবে, তখন এটা পালন করা তোমার জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এটা সামাজিকতার চেতনায় নাও– সে করলে আমি করব, এভাবে নাও, তখন ঘাটতি পড়ে যাবে। কারণ সে করে না। কাজেই তুমি করতে যাবে না।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

একজন তোমার সাথে ভালো সম্পর্ক রেখেছে তুমি তার সাথে রেখেছ, এর নাম 'ছিলা রাহমি' (আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা) না। যে তোমাকে কাট করেছে তুমি তার সাথে জুড়ে আছ, এর নাম হল ছিলা রাহমি।[১]

আর একটা ব্যাপার আছে, যেখানে আমরা সবাই ঠকে যাই। আমরা মানুষ থেকে প্রতিদান চাই। আমি ওর এত করলাম আর ও আমার ক্ষতি করল। আমার নামে বদনাম করল। তার মানে কি, তুমি যাকিছু করেছিলে সবই প্রতিদানের আশায়? তোমার জন্য উচিত ছিল আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশায় করা। তুমি যখনই ভাইকে দেখতে গেছ, নিয়ত হল, আল্লাহ, তোমার হুকুম তাই যাচ্ছি। তুমি যখন ভাইকে কোনো টাকা দিয়েছ, বোনকে কিছু টাকা দিয়েছ, তোমার চিন্তা হবে যে, আল্লাহ, আমার নবী বলেছে ভাই বোনদেরকে সাহায্য করলে তুমি বরকত দাও, এজন্য দিলাম। তোমার মনের ভেতরে তার কাছ থেকে থ্যাঙ্ক ইউ শোনার আশা থাকবে

১. সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৯৯১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৬৯৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৯০৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৭৮৫।

না। বললে আলহামদু লিল্লাহ, না বললেও কিছু না। তাহলে ইবাদতের চেতনা আল্লাহর হুকুম আমাকে করতেই হবে, কষ্ট হোক দুঃখ হোক। এবং ওই ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো প্রতিদান আমি চাচ্ছি না। আমি আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার নেব। এই দুইটা চেতনা যখন গভীর হবে, তখন দেখবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা পানির চেয়েও সহজ হয়ে যাবে। এবং এটা তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইবাদতে পরিণত হবে।

জিজ্ঞাসা: ৮১

ইসলামের জন্য এক মুসলিম অন্য মুসলিমের সাথে কতদিন পর্যন্ত কথা না বলে থাকা বৈধ?

জবাব:

আসলে, মুসলিমগণ পরস্পরে কথা না বলে থাকবে কেন? আর এটা ইসলামের জন্য কী করে হয়? বরং কথা না বলে থাকাটা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ধ্বংসের কারণ বলেছেন। অর্থাৎ ভাই যেটা বলতে চেয়েছেন, সম্ভবত ভালো মুসলিম নয়। পাপ করে। বিদআতি দলের, ওহাবি দলের খারাপ মুসলিম। আমরা আল্লাহর জন্য তাকে ঘৃণা করব!

আমরা শুনেছি:

اَلْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ.

আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে হবে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করতে হবে। কাজেই আমরা আল্লাহর জন্য আল্লাহর নেককার মুমিন বান্দাকে ঘৃণা করব! আমরা অমুসলিমদের অথবা খোদাদ্রোহীদের বিধানগুলোকে মুমিনের উপর নিয়ে আসি। একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমকে দীনি কারণে বা দুনিয়াবি কারণে অবজ্ঞা করা, বিদ্বেষ করাটাই হারাম। আমরা মুমিনের ছোট্ট একটা গুনাহ দেখি অথবা ভুল দেখি। তার ঈমান, অন্যান্য নেক আমল দেখি না। এজন্য, মুসলমান মুসলমানে বিদ্বেষ, শত্রুভাবাপন্নতা হারাম।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ.

আগের উম্মাতেরা যে কারণে ধ্বংস হয়েছে সেই বিষয়টা আবার তোমাদের ভেতর আসবে। সেটা হল শত্রুতা, বিদ্বেষভাব। এটা মুড়িয়ে দেয়। আমি বলছি না যে, এটা মাথা মুড়ায়। এটা দীন মুণ্ডন করে দেয়। দ্বীন ধ্বংস করে দেয়।[২] কাজেই ইসলামের কারণে, মুসলিম হওয়ার কারণে দীনি চেতনায় দলাদলি করায় একদল আরেক দলকে শত্রু ভাবা, একদল আরেক দলের সাথে কথা না বলা, এটা মূলত হারাম কাজ। এটা দ্বারা দীন নষ্ট হয়ে যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে মুসলমান মুসলমানের সাথে কথা না বলে, হঠাৎ রাগ করে সর্বোচ্চ তিন দিন থাকতে পারবে। এর ভেতরে রাগ দমন করতে হবে। কথা বলতে হবে। তা না হলে তার গুনাহ হবে এবং সাধারণ ক্ষমার আওতা থেকে বাদ পড়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা: ৮২

আমার পাশের বাসার লোকেরা বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাতভর ঢাকঢোল বাজাচ্ছে। আমরা ঠিকমতো ঘুমাতেও পারছি না। এগুলো শহর-জীবনে অনেক হয়ে থাকে। এটা কোন ধরনের পাপ হবে?

জবাব:

প্রথমত, এটা পাপ হওয়ার আগে অসভ্য কাজ। সভ্যতার একটা মূল বিষয় হল, আমি যাকিছু করি অন্যকে কষ্ট দেব না। স্বাধীনতা, মানবাধিকার, সভ্যতার মূলনীতিটা কী? যে, আমি অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু আমার দ্বারা অন্য কেউ বিরক্ত হবে না। আমি ঘরে বসে ধূমপান করতে পারি। কিন্তু আমার ধূমপানের ধোঁয়া যেন অন্য কারো কষ্টের কারণ না হয়। তাহলে আইনত দণ্ডনীয়। তো এরকম কাজ যারা করেন, গোনাহগার হওয়ার আগে তারা অসভ্য। আর কোনো সভ্য দেশে এরকম হয় না। আর যদি কোনো দেশে এরকম ঘটে তাহলে বুঝতে হবে, এটা কিছুটা হলেও অসভ্য দেশ। সভ্য দেশে এরকমটা হওয়ার কথা না। দ্বিতীয়ত, এটার অন্যায় বহুমুখি। একটা হল গানবাজনা। এগুলো গোনাহার কাজ।

২. সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৫১০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৪১২।

আরেকটা হল, অন্য মানুষকে কষ্ট দেওয়া গোনাহের কাজ। এমনকি রাতভর কুরআন বাজিয়ে মানুষের ঘুম নষ্ট করাও গুনাহের কাজ।

গানবাজনা নিজেই একটা গুনাহের কাজ। এটা দ্বারা অন্যদের ডিস্টার্ব করা গোনাহের কাজ। ঘুম নষ্ট করা গোনাহের কাজ। মহাকবীরা গুনাহ। কেউ যদি নিজে আজীবন গান শোনে, মদ খায়– এটা গুনাহ হবে। এই গুনাহ আল্লাহ তওবা করলে মাফ করবেন। কিন্তু সে যদি গান বাজিয়ে অন্যের ক্ষতি, ঘুম নষ্ট করে। এটা তওবা করলে মাফ হবে না। ওই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ক্ষমা লাগবে। এমনকি রাতভর ওয়ায বাজিয়ে, রাতভর মাইক বাজিয়ে ঘুম নষ্ট করাও গোনাহের কাজ। হারাম। বান্দার হক নষ্ট। যেমন, অনেক সময় অনেক দেশের সাহরির জন্য ডাকাডাকি করা হয়। অল্প সময় ডাকাডাকিতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু মাইক লাগিয়ে কন্টিনিউয়াস (একটানা) একঘণ্টা ক্যাসেট বাজানো হল। মানুষের ঘুমের ডিস্টার্ব হল, এগুলো সবই নাজায়িয। গুনাহের কাজ। আমরা ডাকব, অল্প কয়েক মিনিট ডাক দিলাম। যার ওঠার দরকার সে উঠবে। কিন্তু ডাকার নামে, ফজরের আগে, আযানের আগে দীর্ঘ সময় ক্যাসেট বাজানো, গযল গাওয়া– এগুলো অবৈধ। নাজায়িয এবং সুন্নাতের খেলাফ। কাউকে যদি ডাকতে হয় তাহলে ব্যক্তিগতভাবে ডাকতে হবে। এজন্য দীনের নামে অন্য মানুষদের স্বাভাবিক সময় নষ্ট করা, ঘুমের সময় নষ্ট করা...। হ্যাঁ, আযান আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। আযান বাজবে। এটাতে কারো বিরক্তি প্রকাশ করার অধিকার নেই। এটা সামান্য কয়েক মিনিট। কিন্তু ফরয সালাতের আযান বাদে ওয়ায মাহফিল এগারোটা বারোটা পর্যন্ত চলতে পারে। এরপরেও যদি কেউ শুনতে চায়, নিজেরা শুনবে। গ্রামবাসীকে ঘুমাতে দেবে না অথবা মহল্লাবাসীকে ঘুমাতে দেবে না, এটা হওয়া উচিত নয়।

জিজ্ঞাসা: ৮৩

আমাদের মুসলিমদের ভেতরে একটা বিষয় মারাত্মকভাবে দেখতে পাচ্ছি– ওজনে কম দেওয়া। যখন আমি বেচব তখন ওজনে কম দেওয়া আর যখন কিনব তখন একটু বেশি নেওয়া। মালের ভেতর ভেজাল দেওয়া– এটা যেন মজ্জাগত একটা ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়েছে। সেই বিষয়টি যদি আপনি

একটু বলেন!

জবাব:

এটা কুরআন কারীমে ভয়ঙ্করতম পাপ বলা হয়েছে। শুয়াইব (আ.) এর জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে একটা পাপের জন্য, যে, তারা ওজনে কম দিত। মানুষকে প্রতারণা করত, ভেজাল দিত। এটা অনেক বড় পাপ! আমাদের সমাজে পাপের চেতনাটা সুস্পষ্ট নয়। আমরা অনেক সময় কে মীলাদ পড়েছে, পড়ে নি, কে লাইগেশন করেছে, ব্যাসিক টোমি করেছে, কে একটু অন্যায় করেছে, কে ব্যাঙ খেয়েছে, কে কুচে খেয়েছে ইত্যাদি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলি। আমরা কত রকমের সামাজিকতা করি। বিশেষ করে কেউ যদি গরীব মানুষ হয় তার বিরুদ্ধে শত রকমের আইন কানুন আমরা প্রয়োগ করি। অথচ ওজনে কম দেওয়া এটা একটা ভয়ঙ্কর পাপ। প্রথম কথা, এর জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত। আল্লাহ কোরআন কারীমে বলেছেন:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ • الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ • وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ.

যারা ওজনে কম দেয়, দেওয়ার সময় কম দেয়, নেওয়ার সময় বেশি নেয়। এদের জন্য সুনিশ্চিত ধ্বংস। অথবা ওয়েল জাহান্নাম।[৩] কোরআন কারীমে এই ব্যাপারে বারবার বলা হয়েছে। এটা যখন সমাজে ছড়িয়ে যায়। ওপেন সিক্রেট হয়ে যায়। বিচার না হওয়াতে সমাজ মেনে নেয়। জনগন মেনে নেয়। রাষ্ট্র মেনে নেয়। চোরের শাস্তি দেওয়া হয় না। ভেজালের শাস্তি থাকে না। তখন ওই জাতির উপরে গযব আসে। পাঁচটা গযবের কথা রাসূল (ﷺ) বলেছেন। তার একটা হল:

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلَّا أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَئُوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.

পাঁচ রকমের সামাজিক পাপ যেটা মানুষের অধিকার সংক্রান্ত। এর জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ পাঁচ রকমের গযব দেন। তার ভেতরে একটা হল ওজনে

৩. সূরা: [৮৩] মুতাফফিফীন, আয়াত: ১-৩।

যদি কম দেওয়া হয়, পরিমাপের কম দেওয়া হয়। পণ্যে কম দেওয়া হয়। ভেজাল দেওয়া হয়। তাহলে আল্লাহ তাদের তিনটা গযব দেন। একটা হল অভাব। আরেকটা হল জীবন যাত্রার কাঠিন্য। অভাব নেই, কিন্তু জীবন কষ্টকর। যেমন আমাদের যানজটের সংকীর্ণতা। দুর্নীতির সংকীর্ণতা। জীবনযাত্রার সংকীর্ণতা। আরেকটা হল প্রশাসনিক যুলুম।[৪] যে দেশে মানুষ এই ওজনে কম দেয়, ফাঁকি দেয় সে দেশের প্রশাসন তাদেরকে যুলুম করবে-ই। এই পাপ বাদ না দিয়ে যতই তারা অন্যভাবে চেষ্টা করুক, এটা কাটবে না।

জিজ্ঞাসা: ৮৪

আমরা জানি, শরীআতের মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে, যেমন তালাক, আজাদ, বিবাহ– এই জাতীয় বিষয়গুলো ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, রাগে হোক, চাপ প্রয়োগ করার কারণে হোক, বললেই এগুলো বাস্তবায়িত হয়ে যায়। এগুলো কেন? বিষয়টি জানালে উপকৃত হব।

জবাব:

যদি কেউ বলে আপনার এই জিনিসটা আমাকে দিয়ে দেন। রাগ করে বলল, যাও, নিয়ে যাও। এটা দান হয়ে যাবে। যত রাগেই বলুক, যতক্ষণ তার চেতনা আছে, হয়ে যাবে। যদি এমন হয়, মাতাল হয়ে গেছে, কোনো চেতনাই নেই। এমন রাগে পৌঁছেছে যে, হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান নেই। একগ্লাস শরবত আর একগ্লাস পেশাবের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।... আমাকে অনেকে বলে, হুযুর রাগের মাথায় তালাক দিয়েছিলাম।... ভালোবেসে কি কেউ কখনও তালাক দেয়? তালাক তো রাগের মাথায় দিতে হয়। বিষয় হল, আপনি কতটুকু রেগেছিলেন? ওই সময় যদি আপনাকে একলাখ টাকার চেক দেয়া হত, ছিড়ে ফেলতেন কি না? তা যদি না হয় তাহলে তালাক হবে। আর যদি হয়, দশটাকার নোট দেখলে ছিড়তেন না, তাহলে বোঝা গেল ওই রাগ কোনো অস্বাভাবিক রাগ না। যেই রাগে হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান নষ্ট হয়ে যায় সেই রাগে তালাক হয় না।

لَا طَلَاقَ... فِيْ إِغْلَاقٍ.

---

৪. সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪০১৯।

যখন মানুষের কাণ্ডজ্ঞান বন্ধ হয়ে যায় ওই অবস্থায় তালাক হয় না।[৫] এটা আসলে খুব স্বাভাবিক, খুব সহজ। যে ব্যাক্তির হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান নেই তার কোনো কথাই আর কথা থাকে না। কিন্তু স্বাভাবিক রাগে তালাক হবে।

জিজ্ঞাসা: ৮৫

বর্তমান সময়ে আমরা প্রায় সকলেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করি। মোবাইল ফোন রিসিভ করার পর প্রথমে আমরা হ্যালো বলে তারপরে সালাম দিই। আবার অনেক সময় একসঙ্গেই দুইজন সালাম দেই। এখানে কে সালাম দেবে আর কে উত্তর দেবে? আর সালাম দেওয়ার আগে হ্যালো বলা যাবে কি না?

জবাব:

কল রিসিভ করেই হ্যালো বলা প্রচলন হয়ে গেছে। মুসলিমদের উচিত কথার শুরুতে সালাম বলা। অনেকেই আছেন যারা ফোন রিসিভ করে হ্যালো বলেন না। আগে সালাম বলেন। সালাম আগে বলা উচিত রিসিভারের। আর ইনি তো কল করেছেন। উনি রিসিভ করবেন কি করবেন না তা তো বলা যাচ্ছে না। কল রিসিভ করে প্রথমেই 'আসসালামু আলাইকুম' বলা। এরপরে তিনি 'ওয়া আলায়কুমুস সালাম' বলবেন । তবে যদি দুইজনে একসাথে সালাম দেয় তাহলে দুজনেরই উত্তর দিতে কোনো সমস্যা নেই।

---

৫. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৬৩৬০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২১৯৩; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৮০২; ইবনুল মুলাক্কিন, আল বাদরুল মুনীর ৮/৮৪।

জামাআত/মাযহাব/ফিরকা

জিজ্ঞাসা: ৮৬

আমাদের দেশে অনেক মতবাদ চালু আছে। এর মধ্যে কোনটি সঠিক? আর যেগুলো সঠিক না সেই মতবাদগুলোর অনুসারীদের কীভাবে আমরা সঠিক পথে নিয়ে আনতে পারি?

জবাব:

আমাকে গত কয়েকদিন আগে একটা মাহফিলে প্রশ্ন করা হয়েছে, ইসলামের সঠিক দল কোনটি। তুমি মতবাদ বলেছ, ওখানে দল বলা হয়েছে। এবং সারা বিশ্বব্যাপী সঠিক দল কোনটি। আমি বললাম সঠিক দল একটা আছে। নাম কী বলব?। একমাত্র সঠিক দল যেটা, আমার জানা আছে, সে দলের নাম ইসলাম। এখন সবাই আশাহত। সবাই ভাবছিল হয়ত তাদের পক্ষের কোনো দলের নাম বলব। দালাদালি ইসলামে হারাম। আমাদের একটা দল আছে, সেটা হল ইসলাম। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করছে, সে আমার দলে। এবং তাকে আমরা বিচার করব, তার আমল দিয়ে। একজন নামায পড়ে, আলহামদুলিল্লাহ, সে ভালো। সে কি অমুক দলের মাধ্যমে নামায পড়ছে, নাকি তমুক দলের– এটা দিয়ে বিচার করা যাবে না। সে নামায পড়ে কি না– এটা দেখতে হবে। একজন লোক রোযা রাখে, দাড়ি রাখে, আল্লাহর পথে দান করে, ইতেকাফ করে, যে যত বেশি ইসলাম পালন করে সে ততো বেশি আমার প্রিয়। সে আমার দলের, আমার কাছের।

এখন তুমি মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ। ইসলাম সম্পর্কে যত মতবাদ পৃথিবীতে প্রচলিত, কেউ বলতে পারব না, কুরআন-সুন্নাহর ছাড়া আর

কোন মতবাদ সহীহ। আর যত মতবাদ প্রচলিত সবাই কুরআন-সুন্নাহর থেকে কিছু নিচ্ছে। সোর্স কী? কুরআন-হাদীস। নেচ্ছে কে? আমার মতো মানুষ। এই মানুষগুলোর ভেতরে কোনো নবী আছে কি না? নেই। মাসুম বা নির্ভুল কেউ আছে? নেই। কোনো মতবাদকে এবসোলিউট (একদম) ঠিক বলা বৈধ না। এটা হল প্রথম কথা। প্রত্যেক সমাজে যা প্রচলিত আছে প্রতিটি বিষয়কে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার করতে হবে। প্রত্যেকে মুসলিম, প্রত্যেকে আমার ভাই। প্রত্যেকে দীনের কথা বলছেন। বর্তমানে যারা বলছেন, তার সোর্স কুরআন-হাদীস। কিন্তু নিচ্ছে মানুষ। কাজেই মানুষের নেয়ার ভেতরে ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। এটা ছিল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় হল, সমাজে যারা বলে, আমরাই ঠিক, বাকিরা খারাপ। এরাই ভুল, বাকিরা ভালো। কাজেই, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ.

যে বলে, মানুষ সব খারাপ হয়ে গেছে, আমি শুধু ভালো, তাহলে ও সবচেয়ে খারাপ।[১]

ইসলামের নামে যারা কাজ করে তারা দুই রকম। এক গ্রুপ হল, কুরআন-হাদীস মানো, ভালো চলো। যে দল ইচ্ছা করো, ইসলাম মেনে চলো। এদের কথা ঠিক হতে পারে, ভুল হতে পারে। আর যারা বলে নামায-রোযা যা-ই কর, এই দলে না আসলে, হুযুরের মুরীদ না হলে, তোমার কাজের কাজ হল না। তাহলে ওর কাছ থেকে শত মাইল দূরে থাকবে। কারণ তারা আল্লাহর রাসূলকে মানদণ্ড রাখে নি। তারা একজন ব্যক্তির ইজতিহাদকে মানদণ্ড রেখেছে।

তৃতীয় বিষয় হল, যারা ভুল তাদের ব্যাপারে আমরা কী করব? তারা কতটুকু ভুল সেটা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দেখতে হবে। ছোটখাটো ভুল তো সবারই আছে। আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করব। না হলে যার যার মতো চলব। ধরো, মনে করো, আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের

---

১. মুসনাদ ইবন জা'দ, হাদীস-৩৩৫৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৬৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬২৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৯৮৩।

শিক্ষাব্যবস্থা আছে। এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। সবই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু সব তো এক রকম না। কোনোটা মোটামুটি ভালো। অল্প ভুলত্রুটি আছে। কেউ অল্প ভালো, অনেক বেশি ভুলত্রুটি আছে। কারো ভুলত্রুটি সিস্টেমে। যেমন, আলিয়া মাদরাসা আছে, কওমি মাদরাসা আছে। বিভিন্ন পদ্ধতির ভেতরে পদ্ধতিগত ভুল আছে। কারোর ভুল পদ্ধতিতে শুধু না, ব্যবস্থাপনায়, বল প্রয়োগে। শিক্ষক নেই, শিক্ষকের যোগ্যতা নেই। আমরা সমালোচনা করি যে, ভাই এটা ঠিক করেন। আমার মনে হয়, সুন্নাহর আলোকে এটা ভালো।

যারা মুসলিম তাদের সবাইকে সাইজ করে একমতে নিয়ে আসতে হবে, এটা কিন্তু হবে না। এটা নিয়মও না। আমাদের দায়িত্ব হল, যিনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেন, তাকে ভালোবাসা। সব মুসলিম আমার ভাই– এটা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। মুসলিমদের রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় দল-উপদলের কারণে তাকে দুশমন মনে না করা। ভিন্নদল মনে না করা। তার বিচারটা হবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে। দলের কারণে না। ধরো, আমার একটা দল আছে। আমি ফুরফুরার পীর সাহেবের দল হলাম। একজন মানুষ ফুরফুরার পীর সাহেবের মুরীদ। আর একজন মানুষ হয়ত তাবলীগ অথবা জামায়াতে ইসলামী অথবা চরমোনাই। ফুরফুরার পীর সাহেবের মুরীদ নামায পড়ে, কিন্তু দাড়ি রাখে না। বউকে পর্দা করায় না, কিন্তু রোযা রাখে, ছেলেকে মাদরাসায় দেই নি। ছেলে-মেয়ে নামায-কালাম ঠিকমতো পড়ে না। ফুরফুরা হুযুরের প্রচণ্ড ভক্ত। আমাকে দুলাভাই বলে পাগল। হাদিয়াও দেয়। আর আরেকজন মনে করো তাবলীগের। সে নামায পড়ে। সে বউকে পর্দা করায়, ছেলেকে কুরআন শিখিয়েছে, নিজে দাড়িটা রেখেছে। আমার নিকটে দুজনের ভেতরে বেশি কাছের কে হবে? যদি আমি ইসলামকে মানদণ্ড রাখি, তাহলে তাবলীগের লোকটা আমার বেশি কাছের হবে। আর ফুরফুরা হুযুরকে মানদণ্ড রাখি তাহলে ফুরফুরার মুরীদ আমার কাছের লোক।

আমরা এখানে সবাই ভুল করছি। দল দিয়ে, মত দিয়ে মানুষকে বিচার করা যায় না। মানুষের বিচার হবে কুরআন দিয়ে, রাসূল (ﷺ) দিয়ে। যার ভেতরে আমরা যতটুকু পাব সে আমার ততটুকু প্রিয়। আর সমালোচনা ওই রকম হবে। দলীয় হবে না। আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় দোষ

হল, প্রত্যেকেই একটা দলের ভুল ধরে। এবং ভুলগুলো এমনভাবে তুলে ধরি, সে ওই ভুল থেকে তওবা করে আমার দলে না আসা পর্যন্ত তার আর কোনো নাজাত নেই। তুমি যত ভালোই হও, হানাফি ত্যাগ করে আহলে হাদীস না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতের কোনো দরজা খুলতে খুলতে পারব না। হানাফিরা যখন আহলে হাদীসদের সমালোচনা করে, মাসআলার সমালোচনা করে না। তুমি যাই বল না কেন, তোমার মূল আহলে হাদীস– এটাই হল তোমার দোযখে যাবার কারণ। তুমি যতক্ষণ তাওবা করে আমার হানাফি না হচ্ছ, ততক্ষণ তোমার বেহেশতে যাবার উপায় নেই। জামায়াত বিরোধীরা যখন জামায়াতের সমালোচনা করে, তখন তারা দলের সমালোচনা করে, তারা এই বলে না যে, তোমাদের এইটা ওইটা ভুল আছে, জামায়াতে থাকো– এই বলে না। বলে, তোমাদের জামায়াতই খারাপ। এখান থেকে বের হয়ে আমাদের দলের এসো। চরমোনাইতেও সবাই এই কাজ করি। দলগতভাবে মানুষের সমালোচনা। আমরা বলি তোমার সব খারাপ সব ছেড়ে তাওবা করে আমাদের দলে এসো। এটা অত্যন্ত ভুল মানহাজ। মুসলিমদের প্রত্যেকেই তার নিজ মাদরাসা, নিজ মতবাদ নিয়ে থাকবে। আমি তাকে বলব, ভাই, আলহামদু লিল্লাহ, আপনি অনেক কিছু ভালো করেন, এই কাজগুলো ভুল। আপনি আপনার দলে থাকেন, আপনার প্রতিষ্ঠান চালান, আপনার এই ভুলগুলো দূর করলে আপনার আরো ভালো হবে, আপনি আল্লাহর কাছে আরো সাওয়াব পাবেন। এটা যদি করে, তাহলে আলহামদু লিল্লাহ! না করলে আর আমরা কী করব! বান্দা তো আল্লাহর ইবাদত করছে আল্লাহর জন্য। আমি যেটাকে সুন্নাত মনে করি, আমি সেটার বাইরে যাব না। একজন মুসলিম নামায পড়ছে, একটা বিদআত করছে। নামায পড়ছে আর একটা নাজায়িয কাজ করছে। রোযা করছে, আবার একটা পাপ করছে।

যারা রোযা রাখেন, নামায পড়েন না তাদেরকে আমরা দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করি। তাদের ভুলত্রুটিগুলো বলতে পারি। এটা হল মূল বিষয়। আমাদের দেশসহ সারাবিশ্বে ইসলামের নামে অনেক দল আছে। অনেক মতবাদ আছে। আমরা মনে করি, কোনো মতবাদই এবসিলিউট ইসলাম না। এটা ইসলাম থেকে নেওয়া। যারা নিয়েছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নিয়েছেন। ভুলের কারণে কেউ ইসলামের বাইরে যাবে না। আমার

নিজেরও ভুল হতে পারে। ভুলটা হারামের পর্যায়ে গেলে গুনাহগার হবে। তারাও আমার ভাই। আমরা তাদের সংশোধনের চেষ্টা করব। না হলে আমরা বললাম, গুনাহসহই মুসলিম আছে। এটার মাধ্যমে আমরা তার অন্যায়টাকে মেনে নিচ্ছি না। অন্যায়টাকে অন্যায় বলাসহ আমি তার ন্যায়টাকে মেনে নিচ্ছি।

জিজ্ঞাসা: ৮৭

একজন ব্যক্তি দলগতভাবে আওয়ামীলীগ করেন। তিনি নামায পড়েন, যাকাত দেন। স্ত্রীকে পর্দাও করান। আর একজন ব্যক্তি জামায়াত ইসলামী করেন। তিনিও ওই আমলগুলো সবই করেন। কিন্তু এই দুইজন ব্যক্তির ভেতরে যিনি আওয়ামী লীগ করেন তাকে যিনি জামায়াত করেন তিনি বলছেন, উনি যেহেতু আওয়ামী লীগ করেন, সেজন্য তার সকল আমল বরবাদ। জান্নাতে যাবেন না। আমরাই জান্নাতে যাব। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

জবাব:

তোমার প্রশ্নটা হল তাত্ত্বিক। প্র্যাক্টিকাল না। তুমি সমাজ থেকে আমাকে বের করে দাও... একজন লোক নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জ করে, যাকাত দেয়, আওয়ামী লীগ করে। সাধারণভাবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যারা করেন, তারা সমাজের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ ৯০% এর মধ্যে, যারা নামায ঠিক করে পড়েন না, রোযা ঠিকমতো রাখেন না। ইসলাম ভালোবাসেন, নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করেন। কিন্তু প্র্যাক্টিসিং দীনদার না। সমাজের মানুষ দুই রকমের– প্র্যাক্টিসিং মুসলিম, নন প্র্যাক্টিসিং মুসলিম। এক ধরনের মুসলিম, যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করেন এবং নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত পালন করেন। আর আরেক ধরনের মুসলিম আছেন, যারা নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত করেন না। একটা করেন তো আরেকটা করেন না। আরেকটা করেন তো, একটা করেন না।

প্র্যাক্টিসিং মুসলিম বাংলাদেশে দশ পার্সেন্টও না। বিশেষ করে তুমি যে প্র্যাক্টিস বলেছ– বউকে পর্দা করায়, ছেলেকে দীন শেখায়, নামায পড়ে,

রোযা রাখে, হজ্জ করে, টাকা দেয়। এরকম মুসলিম বাংলাদেশে টেন পার্সেন্ট। আর এই ১০ শতাংশ মুসলিম সাধারণত বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ইত্যাদি সেক্যুলার পার্টিতে একটিভ না। তাদের মধ্যে কেউ জামায়াত করে, কেউ তাবলীগ করে, কেউ চরমোনাই করে। ইসলামের বিভিন্ন ধরনের গ্রুপে তারা অ্যাক্টিভ। তুমি যে বললে, এটা আমরা অনেক শুনি। এটা, ইসলামি রাজনীতি যারা করেন, ভিন্ন দলকে সাইজ করার জন্য এই কথাটা তাত্ত্বিকভাবে বলেন। রোযা করে, হজ্জ করে, যাকাত দেয়, পর্দা করায়– কিন্তু সেই ইসলামি শাসনব্যবস্থা চায় না, কাজেই সে মুসলিম কি না? এই প্রশ্নটা একেবারেই ভিত্তিহীন। তুমি সমাজ থেকে একজন আমাকে এনে দিতে পারবে না? একজন রোযা করে, নামায পড়ে, হজ্জ করে, বউকে পর্দা করায়, ছেলেকে মাদরাসায় পাঠায়, সে ইসলামি শাসনতন্ত্র চায় না। এমন নেই।

দ্বিতীয় কথা হল, একজন ব্যক্তি ইসলামি শাসন ব্যবস্থা চায়। তার মনে চায়, ইসলাম হোক। কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারে যে জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে এটা হবে না। তারা যোগ্য না। আওয়ামীলীগ যেহেতু একটা বড় দল। এর মাধ্যমে যদি আমরা কিছু করতে পারি, এই নিয়তে থেকে যেতে পারে। তুমি তো আর তার মনে ঢোক নি। এমনকি যারা ইসলামি দল করেন। তারাও তো বিভিন্ন সেক্যুলার দলের সমর্থন করেন। এই যে তারা একেক সময় একেক সেক্যুলার দলকে সমর্থন করেন। এই যে যেই সমর্থনটা করেন, এটাতো ইসলাম না চাওয়ার কারণে না। ইসলাম চাওয়ার কারণেই। সেই সময়ে তারা সমর্থন করতে পারে, সেটা আরেকজন করলে সমস্যা কী। তুমি তোমার ইজতিহাদে একটা সেক্যুলার দলকে সমর্থন করেছে। আরেকজন আরেকটা ইজতিহাদে আরেকটা সেক্যুলার দলকে সমর্থন করেছে।

তবে মূল বিষয় হল, নামায পড়ে, রোযা করে, হজ্জ করে, যাকাত দেয়, পর্দা করায়, এ রকম কোনো মুসলিম সেক্যুলার দলগুলোতে অ্যাক্টিভ, ১৫ কোটির মধ্যে একজন পাবে কি না সন্দেহ। কাজেই এ ধরনের কথা বলতে হয় না। কথা হল, যার ভেতরে ঈমান আছে, যার ভেতরে নামায আছে, প্র্যাক্টিস করেন, তিনি তখনও ওইসব রাজনীতিতে অ্যাকটিভ থাকেন এমন নেই। বরং উল্টো হয়। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিতে ছিলেন,

নামায-রোযা শুরু করার পর ইন্যাক্টিভ হয়ে গেছেন। হয়তো তাবলীগে যান না, জামায়াতে যান না, চরমোনাই যান না, কিন্তু তিনি তার দল থেকে ইন্যাক্টিভ হয়ে যান।

জিজ্ঞাসা: ৮৮

চার মাযহাবের কোনো একটা কি মানতেই হবে? অনেকেই বলেন, চার মাযহাবের উপর নাকি ইজমা হয়ে গেছে?

জবাব:

আমরা অনেক সময় ইজমার দোহাই দিই, যে, মীলাদের উপরে, কিয়ামের উপরে ইজমা হয়ে গেছে। কবরে সিজদার ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে। একটা বই পড়েছি, পীরের সিজদা, কবরে সিজদা নেককারদের সিজদা নবীদের সুন্নাত, ফেরেশতাদের সুন্নাত। আদমকে সিজদা করেছে ফেরেশতারা। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সিজদা করেছে তার মাবাবা, ভাই-বোনেরা। এটাই উম্মাতের ইজমা ছিল। ওহাবিরা এসে সব নষ্ট করে দিয়েছে। প্রত্যেকে তার পক্ষে ইজমা দাবি করে।

চার মাযহাবের উপর ইজমার ব্যাপারটা ঠিক আছে। এর বাইরে যাওয়া যাবে না, এর কোনো একটা ধরে রাখতে হবে, এটার উপরে কোনো ইজমা হয় নি। অনেক সময় বলা হয় ইজতিহাদের যোগ্য না। এখন যোগ্যতার সার্টিফিকেট কে দেবে। কেউ যদি মনে করে আমি যোগ্য, তোমার সমস্যা কী? চার মাযহাব ঠিক। মুসলিমরা চার মাযহাব মেনে নিয়েছেন।

তুমি নামায পড়ছ, নামায পড়া যে ঠিক আছে তো সবাই মেনে নিয়েছি। একজন জামায়াতের মাধ্যমে নামাজ শিখেছে। একজন তাবলীগের মাধ্যমে, আরেকজন চরমোনাইয়ের মাধ্যমে। তুমি নামায দেখবে? না কার মাধ্যমে নামায পড়ল, সেটা দেখব? আমরা নামায দেখব। যারা বলেন যে, আমরা মাযহাব মানি না। তারা চার মাযহাবের বাইরে কিছু করেন না। ভেতরেই তো করেন। তারাতো চার মাযহাবের। তারা অন্যায় কী করেছে।

দ্বিতীয় হল, চার মাযহাবের বাইরে কোনো মত হতে পারবে না– এটারও

কোনো ইজমা হয় নি। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আলিম-উলামারা ইজতিহাদ করতেই পারেন। আমাদের হানাফি মাযহাবে অনেক মাসাআলা এসেছে যেটা হানাফি মাযহাবে ছিল না। আবু হানীফার মতের পুরো বিপরীত। এজন্য, যারা মাযহাবের বিরোধিতা করেন, মাযহাব মানলে কাফির হয়ে গেল মুশরিক হয়ে গেল– এটা ফালতু কথা। আবার যারা মাযহাবের দাবি করেন তারা ইজতিহাদের ভুল না তুলে সিস্টেমের ভুলে চলে যান। মাযহাব মানতে হবে। কুরআন-হাদীস মানতে হবে। আমরা বলব, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তোমরা এটা ভুল করেছ। এই, মাযহাবের আলোকে একজন হানাফি নামায পড়ছে। আরেকজন আহলে হাদীস নামায পড়ছে। সাওয়াব কে বেশি পাচ্ছে? হানাফি বেশি সাওয়াব পাচ্ছে? তুমি কোন হাদীস কুরআন দিয়ে এটাকে বেটার বলবে? বরং উল্টো হয়ে গেছে এখন। একজন হানাফি নামায পড়ছে, কিন্তু কুরআন সহীহ না। মুখে সিগারেটের গন্ধ বেরোচ্ছে। দাড়ি চাঁছা আছে। কাপড় টাখনুর নিচে। তুমি তাকে খুব মহাব্বত করছ। আর একজন আহলে হাদীস, তার দাড়ি সুন্দর, নামায সহীহ। রাফউল ইয়াদাইন করছেন দুয়েকবার, আমীন জোরে বলেছে, কিন্তু তুমি বললে তার নামাযই হল না। কোন কোরআন, কোন হাদীস, কোন মাযহাব দিয়ে তুমি এটা বলবে? হানাফি মাযহাবে এটা কোথাও আছে নাকি? এটাও নিষিদ্ধ দলাদলিরই একটা অংশ। আমরা এই ধরনের দলাদলি থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই।

আমি নামায দেখব। আমি তাকে বলতে পারি, তুমি এই কাজটা করছ, এটা কুরআন ও সুন্নাহয় নেই। এটা ভুল ইজতিহাদ। হানাফি, আহলে হাদীসদের মধ্যে যেটা ঘটে, সেটা হল প্রান্তিকতা। একজন মানুষ রাফউল ইয়াদাইন করছেন, এটা কোনো নাজায়িয কাজ না। এটার প্রচুর হাদীস আছে, ইমাম আবু হানীফাও নাজায়িয বলেন নি। কিন্তু সে বলে রাফউল ইয়াদাইন না করলে নামায হবে না। এটা হাদীসবিরোধী কথা।

একজন আমাকে প্রশ্ন করছে রাফউল ইয়াদাইন না করলে নামায হবে কি না। আমি বললাম, কেন হবে না? আমার কাছে শুনে সে খুশি হয় নি। আমি মাযহাবি লোক। এরপর ডক্টর সাইফুল্লাহর কাছে ফোন করেছে। উনি বলেছেন এটাতো সহীহ হাদীস, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এর। এবার ফোন করেছে আরেক সাহেবকে। তার নাম বলছি না, কারণ তার

ব্যাপারে কিছু সমালোচনামূলক কথা আছে। সে বলেছে যে, রাফউল ইয়াদাইন না করলে নামায হবে না। কারণ প্রায় শতাধিক হাদীস আছে রাফউল ইয়াদাইন করার ব্যাপারে। কাজেই না করলে আপনাদের নামায হবে না। অথবা গুনাহ হবে। এরপর আমাকে আবার ফোন করেছে। আমি বললাম, এই ১০০ হাদীসের ভেতরে কোনো একটা হাদীসে আছে যে, রাফউল ইয়াদাইন না করলে নামায হবে না? যদিও হাদীস একশটা না। কয়েকটা সাহাবি থেকে বর্ণিত।

কেউ কি তোমাদের সামনে কখনো হাদীস দিয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, রাফউল ইয়াদাইন না করলে নামায হবে না। সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না, এটা আছে। রাফউল ইয়াদাইন না করলে নামায হবে না, এমন তো আর নেই। তাহলে কেন তুমি দাবি করলে? তোমার দাবি তো হাদীসবিরোধী হবে। রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস সহীহ। এটাকে দুর্বল বলা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদকে খারাপ বলা, খুবই দুঃখজনক। সহীহ হাদীসকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাতিল করার চেষ্টা ঠিক না। কিন্তু তুমি যখন বললে তুমি রাফউল ইয়াদাইন করছ, এটাতো নবীজি (ﷺ) করেন নি, তোমার নামায হবে না। এটাও তোমার প্রান্তিক কথা। কুরআন বলে না, হাদীস বলে না, মাযহাবও বলে না। অর্থাৎ যাদের নামে মাযহাব তাঁরা বলেন নি। হাজার বছর পরে এসে কোনো কোনো আলিম এসব কথা বলেন।

দাওয়াত/তাবলীগ/জিহাদ

জিজ্ঞাসা: ৮৯

বর্তমানে আমাদের দেশে বহু মানুষ হিন্দু থেকে, উপজাতি এলাকায়, তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। এর দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খ্রিস্টানদের যে প্রকল্প ২০৪০ সালের মধ্যে ব্যাপক হারে খ্রিস্টান করা, সেদিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের আলিম-উলামা ও দায়িদের কোনো দায়বদ্ধতা আছে কি না বা আমাদের করণীয় বা কর্মপন্থা কি হতে পারে?

জবাব:

আমার দেশের সাঁওতাল গারো, গাজীপুরের বিভিন্ন উপজাতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিসহ অনেকেই খ্রিস্টান হয়েছেন। মুসলিমরা যদি তাদের কাছে গিয়ে বলে যে, আপনারা কেন খ্রিস্টান হয়েছেন? তখন তারা বলে, আমরা কেন খ্রিস্টান হব না? মুসলিম যে হওয়া যায়, তা তো আজকের আগে কখনো শুনি নি। তারা এসেছেন তারা সেবা করেছেন। তারা আমাদেরকে ধর্মান্তর হওয়া যায় বলেছেন। আমরা হয়েছি। যদি আপনারা আসতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই মুসলিম হতাম।

দ্বিতীয় কথা হল, এই যে মানুষগুলো খ্রিস্টান হল, মুসলিম হল না, এজন্য আল্লাহ তাআলা এদেশের আলিমদেরকে অবশ্যই দায়ি করবেন। তোমার বাসার পাশের মানুষটা সে সত্য চাচ্ছিল, সে সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল। একজন মানুষ তাকে বুঝিয়ে, অসত্যকে সত্য বলে পেশ করল। কিন্তু তুমি তোমার সত্যটাকে বল নি। ও যদি জাহান্নামে যায়, এর দায়ভার তোমারও কিছুটা থাকা উচিত।

আমাদের সমাজের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। এই সমাজে দীন এসেছে আলিমদের মাধ্যমে। মুসলিমরা কখনো কোথাও দীন প্রচার করে নি। মুসলমান এসেছে ব্যবসা করেছে। শুধু তাদের আখলাক এবং ইবাদত দেখেই মানুষ মুসলিম হয়ে গেছে। ১৯৫০ সালে ভ্যাটিকান থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আফ্রিকাতে খ্রিস্টান করা হবে। ২০০০ সালের মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশ হবে খ্রিস্টান মহাদেশ। তারা মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে এগোচ্ছে। মুসলিমরা কিছুই করে নি। তারপরও ২০০০ সালে আফ্রিকা মহাদেশের খ্রিস্টান ধর্ম যতটুকু প্রচারিত হয়েছে কাছাকাছি প্রায় ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। অর্থাৎ কালো বা উত্তর আফ্রিকায়। এটা কিন্তু কোনো অর্গানাইজড (সংগঠিত) প্রচারের মাধ্যমে না। একজন কোনো ইমাম বাসায় গেছেন, তাকে দেখে দেখে হাজার হাজার মানুষ মুসলিম হয়ে গেছে। ইসলামের একটা নিজস্ব আলো আছে। আমরা গত অনেক শতাব্দী যাবত দীনের কথাটা অন্য মানুষের কাছে জানাই না, ভাই তুমি মুসলিম হও। এমন কথা কখনোই কোনো মুসলিম কাউকে বলে নি; ইসলামের আখলাক দেখানো, ইসলামে তাওহীদের মর্যাদা বোঝানো, আমার দীনটা এই, এটা তুলে ধরেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা করি নি বলেই মানুষ এই ভাবে চলে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে সমাধান হল, আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এটা এত কঠিন অসচেতনতা। একবার কিছু মুসলিম আমাদের দেশে খ্রিস্টান হয়েছিলেন। আমরা বলেছিলাম তাদেরকে দাওয়াত দেন। হাতে পায়ে জড়ায়ে ধরে তাদেরকে ইসলামে নিয়ে আসেন। তখন আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় মসজিদে, একজন তোমাদের মতোই তালিবে ইলম দাওরায়ে হাদীস পাশ, আমাদের আল হাদীসের ছাত্র, প্রশ্ন করেছিল:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

কেউ মুরতাদ হলে তাকে কতল করতে হবে।[১] দাওয়াত দিতে হবে এটা কোথায় আছে? আমি বললাম, দেখো, নামায ত্যাগ করলে জেলে যেতে হবে কতল করতে হবে। রোযার তরক করলে জেলে দিতে হবে, কতল করতে হবে। তাহলে এই বেনামাযিদেরকে দাওয়াত দিতে হবে এটাই বা

১. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩০১৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২৫৩৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৩৫১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৪৫৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪০৫৯।

কোথায় আছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব আর দায়ির দায়িত্ব– এই দুটো তোমরা বুঝলে না। বিচারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র বিচার করবে। আমাদের দায়িত্ব কী?। আমরা তো বিচারক নই। আমরা প্রচারক। কাজেই আমরা দাওয়াত দেব। আরেকজন আরেকটা প্রশ্ন করেছেন। অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়া জায়িয হবে কি না? বিদআত হবে কি না? নবী রাসূল (ﷺ) দাওয়াত দিয়েছেন কি না?

আমরা দাওয়াত দেয়া বলতে বুঝি, মুসলিমদেরকে গিয়ে দাওয়াত দেয়া। অথবা তরীকার দাওয়াত দেয়া। অথবা জিহাদের দাওয়াত দেয়া। অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে হবে, ওইটা যে দীন, আমরা জানি না। এজন্য প্রশ্নটা হচ্ছে, অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়া বিদআত কি না? কী ভয়ঙ্কর অবস্থা! রাসূল (ﷺ) কাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন? সবাই কি মুসলিম ছিলেন?! রাসুল (ﷺ) চিঠি লেখে লেখে দাওয়াত দিলেন মুসলিমদেরকে?! সাহাবিরা সবাই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গিয়েছেন মুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য?! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যত দাওয়াতের হাদীস এসেছে সব অমুসলিমদের জন্য।

ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

[আপনার রবের পথের দিকে আহ্বান করুন হিকমাত ও উত্তম আলোচনার মাধ্যমে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন।][২]

এটা কাদের জন্য? কাফিরদের জন্য, অমুসলিমদের জন্য। কারণ মুসলিমদের সাথে 'জিদাল' হয় না। বিতর্ক হয় অমুসলিমদের সাথে। অমুসলিমদেরকে দীনের কথাটা জানানো যে, তোমার দীন তোমার। তুমি চয়েজ করেছ। কিন্তু আমার দীনে এইটা আছে, এটা সবার জন্য, ইচ্ছা করলে তুমিও এই রাস্তায় মুক্তি পেতে পরে। এই কথাটা জানানোর দায়িত্ব তো আমাদের ছিল। এজন্য আমাদের ভেতরে দায়িত্ব সচেতনতা, ইসলামি চেতনা তৈরি করা। ইসলামকে সত্যিকারভাবে প্র্যাকটিস করা এবং মানুষদেরকে সুন্দর ভাবে দাওয়াত দেওয়া যদি আমরা বাড়াতে পারতাম, তাহলে ইসলাম আরো অনেক দ্রুত আমাদের মাঝে আসত।

---

২. সূরা: [১৬] নাহল, আয়াত: ১২৫।

জিজ্ঞাসা: ৯০

একজন একটা প্রশ্ন করছেন দাওয়াতের কাজের ব্যাপারে। দাওয়াতটা মূলত আলিমরা দেবেন বা যাদের জ্ঞান আছে তারা দেবেন। সাধারণ মানুষের উপরে দীনের দাওয়াত দেওয়ার জিম্মা আছে কি না?

জবাব:

দীনের দাওয়াত, এটা আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যবসা। এটা সবার জন্যই প্রযোজ্য। তবে সবার জন্য ফরয নয়। ফরযে আইন নয়। যিনি করবেন তিনি মহান মর্যাদা লাভ করবেন। আর এজন্য আলিম হওয়া জরুরি না। আমরা আলিম নই– এ রকম মুমিন নেই তো! সালাত যে ভালো কাজ, এ রকম ইলম তো সবারই আছে। কাজেই যদি একজন একটা মানুষকে বলেন, ভাই আপনি মুসলিম, সালাত আদায় করেন না ভাই! এই দাওয়াত দিতে তো আমাদের কোনো নিষেধ নেই। এইজন্য প্রথম কথা হল, দাওয়াতের গুরুত্ব আমাদের বুঝতে হবে। দাওয়াত, অর্থাৎ মানুষকে ভালো কাজের কথা বলা, খারাপ থেকে নিষেধ করা। এটা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয়কাজ। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

أَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ.

একটা ছোট্ট ভালো কথা একজনকে বলবে, এটা একটা অনেক বড় সদকা হিসেবে সাওয়াব লেখা হবে। অর্থাৎ কয়েক লক্ষটাকা দান করবেন, এরকম একটা সাওয়াব একজন মানুষকে একটা ভালো কথা বললে আপনি পেয়ে যাবেন। একজন লোক একটা খারাপ কাজ করছে। আপনি বললেন, ভাই, এই জিনিসটা তো ভালো না। এটা বর্জন করলে হয় না ভাই? এটা একটা সদাকা।[৩] সাওয়াব পাওয়া গেল। আর ওই ব্যক্তি যদি এটা শুনে আপনার দ্বারা ভালো হয়, এর থেকে বড় মর্যাদার কিছু নেই। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

وَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

---

৩. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২১৪৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭২০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৮৫।

তোমার অছিলায়, তোমার কারণে যদি একটা লোক ভালো হয় (তৎকালীন আরব বিশ্বে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছিল লাল উটগুলো) [একজন লোক হেদায়াত পাওয়া তোমার জন্য এই লাল উটের চেয়েও উত্তম]।[৪] অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ক্যাডিলাকের মতো একটা বিষয়।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, দুনিয়ার জীবনে যত বড় সম্পদ আছে তার চেয়ে বড় সম্পদ হল তোমার ওসিলায় একজন মানুষ হেদায়াত হোক। আরো সম্পদ রয়েছে। একজন মানুষ হেদায়াত হয়ে, অর্থাৎ আমি একজনকে বললাম, ভাই, এই ভালো পথে চলেন। চলেন মসজিদে যাই। একটা ওয়ায আছে। সে মসজিদে গেল। যাওয়ার পরে ভালো হয়ে গেল। সালাত আদায় করল। সিয়াম পালন করল। মানুষকে ভালো পথে ডাকল। ওই ব্যক্তি আজীবন যত নেক আমল করবে, তার মাধ্যমে যত নেক আমল দুনিয়াতে জারি থাকবে। সবকিছুর সমপরিমাণ কমিশন সাওয়াব আমার আমলনামায় যুক্ত হয়ে যাবে। এর থেকে সহজ ব্যবসা তো আর কিছু নেই।

তবে এ ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, আমরা দাওয়াত দিই না। অন্যায় দেখে চুপ করে থাকি। অথবা একটা সুযোগ পেলেও কথা বলি না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ; কী হবে এসব কথা বলে! এসব কথা চিন্তা করে আমরা অনেক সময় দাওয়াত থেকে বিরত থাকি। এটা, আধুনিক যে ব্যক্তিত্ব বলা হয়– কেউ কারো ব্যাপারে কথা বলব না।

আল্লাহ কুরআন কারীমে শেখাচ্ছেন, লুকমান (আ.) তাঁর ছেলেকে, কিশোরকে যে নসিহতগুলো করেছেন, তারবিয়াত দিয়েছেন:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ.

...তুমি ভালো কাজে আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর এই ব্যাপারে যাহোক সবর করবে।[৫] ভালো ভালো কাজের কথা বলতে হবে। খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে। আর সবর করতে হবে। এক্ষেত্রেও আমরা পরাজিত হই। আমরা উগ্র হয়ে যাই। সবর করি না।

---

৪. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৭০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪০৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৬৬১।

৫. সূরা: [৩১] লুকমান, আয়াত: ১৭।

কঠোর ভাষায় কথা বলি। কঠোর ভাষায় কথার নাম দাওয়াত নয়। কঠোর ভাষায় কথা বলার নাম হল গালি দেওয়া। এটাতে কোনো সাওয়াব হয় না। বরং গুনাহ হয়।

জিজ্ঞাসা: ৯১

আমরা অনেকেই দাওয়াতের কাজে গিয়ে অনেক সময় এক্সট্রিম (কঠোর) হয়ে যাই। খুবই কঠোরতা করি। আমরা মনে করি, যে যত বেশি কঠোর হব সে ততো বেশি সাওয়াব পাব। এই বিষয়টা ঠিক কি না?

জবাব:

আমাদের ধারণা, আমি হককথা বলছি একেবারে কঠোরভাবে বলব। কিন্তু ইসলাম এর বিপরীতটা নির্দেশ করে, হককথাকে নরম করে বলো। এটা কুরআন কারীমে বারবার বারবার বলা হয়েছে। আমাদের রাসূল (ﷺ) কে আল্লাহ প্রশংসা করেছেন কী বলে?

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ.

আপনি বিনম্র। তাদের সাথে খুব নরম আচরণ করেন।[৬] সেই নরম আচরণ দিয়ে আরবের বর্বর লোকগুলোর হৃদয় তিনি জয় করেছেন। তরবারি দিয়ে না। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নরম হৃদয়ের কথাতে। মানুষ মুসলিম হয়। রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন রাষ্ট্রের স্বার্থে, সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য, আক্রমণ থেকে হেফাযত করার জন্য যুদ্ধকে বৈধ করা হয়েছে। সেটা ভিন্ন কথা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার এ বিনম্রতার কথা বলেছেন। আমরা কুরআনে যাই। কুরআনে আল্লাহ তাআলা দাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে মূসা (আ.) কে বলছেন:

فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى.

[তোমরা তার সাথে নরমভাবে কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ

---

৬. সূরা: [৩] আল ইমরান, আয়াত: ১৫৯।

করবে অথবা ভীত হবে।][৭]

মূসা আ. আল্লাহর প্রিয়তম নবী। এবং আল্লাহ তাঁকে বলেছেন:

فَلَا يَصِلُوْنَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُوْنَ.

[তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। আমার আয়াতসমূহের বলে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে।][৮]

আল্লাহ তাঁকে নিশ্চিত করেছেন, ফেরাউন বাহিনী তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার আয়াত দিয়ে তোমরাই বিজয়ী হবে। কাজেই ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাঁকে আল্লাহ তাআলা হেফাযত করেছেন। তারপরেও আল্লাহ তাঁদেরকে অর্থাৎ মুসা এবং হারুনকে হুকুম করলেন, তোমরা নরম কথা বলবে।

فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا.

বিনম্র, নরম কথা বলবে।

لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى.

এই বিনম্র কথার তা'সীরে (প্রতিক্রিয়ায়) হয়ত তারা ভালো হয়ে যেতে পারে। তাহলে ফেরাউনের মতো তাগুতের কাছে মূসা (আ.) এর মতো সাহায্যপ্রাপ্ত নবীকে পাঠিয়ে সেখানেও বিনম্রতার কথা বলা হচ্ছে। মূসা (আ.) এর স্বার্থ দেখে নয়। ফেরাউনের স্বার্থ দেখে। হয়তবা তার মনটা গলে যাবে। সেখানে আমরা যাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি তারা ফেরাউনের চেয়ে খারাপ না। আর আমরা মূসা (আ.) এর থেকে ভালো না। আল্লাহ কুরআন কারীমে অন্য জায়গায় দাওয়াতের কথা বলছেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

এরপরে আল্লাহ কী বলছেন?

---

৭. সূরা: [২০] ত-হা, আয়াত: ৪৪।

৮. সূরা: [২৮] কাসাস, আয়াত: ৩৫।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

আল্লাহ প্রথমে বললেন যে, ওই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে আল্লাহর পথে ডাকে, নিজে নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলিম। এরপর আল্লাহ বললেন, সুন্দর আচরণ আর খারাপ আচরণ এক হতে পারে না।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

খারাপ আচরণ করলেও তুমি সুন্দর আচরণ দিয়ে তার জবাব দাও। আল্লাহ তাআলা বলছেন দায়িদের গুণ, দাওয়াতের পদ্ধতি– দাওয়াত দাও, নিজে নেক আমল করো, নিজের আমল বাদ দিয়ে দাওয়াত দিয়ো না। এবং তোমার ইসলামি পরিচয়টা সমুন্নত রাখো। এরপর আল্লাহ বলছেন, খারাপ আচরণ আর ভালো আচরণ এক হতে পারে না। সমান হতে পারে না। তুমি ভালো আচরণ করবে। এটাই শুধু নয়, কেউ যদি খারাপ আচরণ করে তবুও।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

যেটা উত্তম। সে যদি তোমাকে মৌলবাদী বলে তুমি তাকে ভালো বলো। সে যদি তোমাকে পশ্চাৎপদ বলে, তুমি তাকে একটা ভালো সম্বোধন করো। তুমি তার খারাপ কথাটাকে অনেক বেশি ভালো দিয়ে প্রতিহত করো। প্রতিরোধ করো, প্রতিহত করো। আমরা প্রতিহত মানে বুঝি অনেক কিছু। আল্লাহ বলেন, না, তার খারাপটাকে প্রতিহত করো উত্তম দিয়ে।

فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ.

আল্লাহ কী বললেন? তুমি যদি রিয়াকশন (প্রতিক্রিয়া) না করে প্রঅ্যাক্টিভ (প্ররোচক) হও, রিয়াক্টিভ (প্রতিক্রিয়াশীল) না হয়ে। সে তোমাকে বাজে কথা বলল, তুমি সবর করে সুন্দর কথা বললে। বাজে কথা বললেও সুন্দর কথা বললে। তুমি যদি আত্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে পার, আজকে যার সাথে তোমার দুশমনি রয়েছে। কাল সে তোমার বন্ধু হয়ে

যাবে।[৯] এই যে সবর, সবরের মাধ্যমে, বিনম্রতার সাথে দাওয়াত দেওয়া, এটা হল নবীদের দাওয়াত। কেউ যদি রেগে যায়, কঠোর হয়, সেটা দাওয়াত নয়। সেটা অহঙ্কার এবং নিজের আমিত্ব প্রকাশ করা। এর জন্য ভয়ঙ্কর গোনাহ হবে। অনেক সময় মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হবে। এটা দাওয়াত হবে না।

এরপরে আল্লাহ বলেছেন:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ.

যদি কোনো সময় শয়তান রিয়াকশনের মাধ্যমে আমাকে রাগিয়ে দেয়। খারাপ কথা বলেছে। তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।[১০] আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম। রাগটা অন্যায়। শয়তান চাচ্ছে, আমি রেগে যাই। আল্লাহ চাচ্ছেন, আমি সবর করি। এভাবে আল্লাহ এই আয়াতগুলো বিস্তারিত বলেছেন। দায়ি অবশ্যই সবর করবেন। সুন্দর কথা বলবেন। মানুষকে আদর করে ডাকবেন। সবচেয়ে বড়কথা হল, আমাদেরকে আল্লাহর সাথে বিজনেসের একটা চেতনা থাকতে হবে। একজন ইন্সুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট, তিনি আমার কাছে এসে তার কোম্পানির সবকথা বলার পরে আমি রেগে যাব। এটা হবে না। এগুলো বাজে কথা বলছেন। উনি কিন্তু রাগবেন না। তার রাগ আছে। কিন্তু উনি রাখবেন না। কারণ তার ভেতর একটা বিজনেসের চিন্তা আছে। উনি রেগে গেলে কাস্টমার হারাবেন। এজন্য উনি রাগ থাকলেও রাগবেন না। পাঠক আমরাও তো কাস্টমার হারাব। আমরাও তো আল্লাহর সাথে বিজনেস করছি। এই মানুষটাকে আমি নামায পড়াতে পারলে আল্লাহ খুশি হবেন। আমার একটা বিজনেস হবে। এই ব্যক্তি তার জীবনে যত নেক আমল করবে তার একটা পারসেন্টেন্স পাব। কাজেই আমি রাগব কেন? আমি বিনম্রতার সাথে তাকে দীনের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। এটা আল্লাহর নির্দেশ। ঈমানের দাবি। আর কঠোরতা আল্লাহর নিষেধ করেছেন।

আয়িশা (রা.) বসে আছেন। মদীনার কিছু ইয়াহুদি এসেছে। রাসূলুল্লাহ

৯. সূরা: [৪১] ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৩-৩৪।

১০. সূরা: [৭] আ'রাফ, আয়াত: ২০০।

(ﷺ) কে সালাম দিয়েছে: اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! আবুল কাসিম, আপনার ওপর 'সাম' মানে মৃত্যু হোক। আয়িশা (রা.) ক্ষেপে গেলেন– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে গালি দিয়েছে–

عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ.

তোমাদের উপরে মৃত্যু হোক। অভিশাপ হোক, গযব হোক। নবীজি (ﷺ) বললেন:

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ.

আয়িশা, বিনম্র হও।

لَمْ يَدْخُلِ الرِّفْقُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

আল্লাহ যেখানে বিনম্রতা, সেটাকেই মর্যাদা দান করেছেন। আর যেখান থেকে বিনম্রতা কেড়ে নিয়েছেন সেটাকে অপমানিত করেছেন। ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি শুনেন নি ওরা কী বলেছে? 'না, আমি শুনেছি এবং উত্তর নিয়েছি'। 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কী বলেছেন?' 'আমি বলেছি, (وَعَلَيْكُمْ) ওয়া আলাইকুম'। আর কিছু বলেন নি। 'তোমাদের উপরেও হোক। তোমরা যেটা আমাকে দিতে চেয়েছ সেটা তোমাদের হোক'।[১১] কত সহজ সুন্দর বিনম্রতার মাধ্যমে কথা শেষ। এজন্য, দায়িদেরকে বিনম্র হতে হবে।

জিজ্ঞাসা: ৯২

যুবসমাজের যে ধর্মীয় এবং নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে, তাদেরকে আমরা কীভাবে দ্বীনের দিকে আহবান করতে পারি?

জবাব:

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে দাওয়াতের কিছু পদ্ধতি শিখিয়েছেন। প্রথম যে পদ্ধতি, আমরা যারা হুযুর হয়েছি, আমাদের কাছে যুবকেরা আসতে ভয় পায়। আমাদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু রাসূল (ﷺ)

১১. সহীহ বুখারি, হাদীস-৬০৩০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২১৬৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৩৫৩১।

এর কাছে সবাই যেত। কিশোর-যুবক গিয়ে একদম গোপন প্রশ্ন করত। কোনো সংকোচ বোধ করত না। অর্থাৎ দায়ির ব্যক্তিত্ব এমন হবে, যাকে তুমি দীনের কথাটা বলবে, সে যেন বলে যে, উনি একজন উন্মুক্ত এবং খুব ভালো মানুষ। তার কাছে সবচেয়ে খারাপ কথাটা বললেও সে রাগ করবে না। এটা দায়ির ব্যক্তিগত আখলাক বা চরিত্র থাকা উচিত। এটা রাসূল (ﷺ) এর মডেল। চিন্তা করে দেখো, রাসূল (ﷺ) মদীনার প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপ্রধান, আল্লাহর রাসূল (ﷺ), তাঁর কাছে কিশোরেরা, যুবকেরা যেকোনো প্রশ্ন করছে। যৌবনের প্রশ্ন, ব্যক্তিগত প্রশ্ন। সব প্রশ্ন করছে। সবকথা বলতে পারছে।

দ্বিতীয়ত হল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দ্বীনের দাওয়াতের পদ্ধতি শিখিয়েছেন:

بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا.

[তোমরা সুসংবাদ দাও, বিরক্তি সৃষ্টি কোরো না এবং সহজ করো, কঠিন কোরো না।][12]

যুবকদের জন্য আমরা দীনকে কঠিন করে ফেলি। সালাতের আগেই টুপির দাওয়াত দিই। ইসলামের আগেই তোমরা কেউ সুফি সাহেব হওয়ার দাওয়াত দাও। কেউ সালাফি সাহেব হওয়ার দাওয়াত দাও। আগে সবার আগে ইসলামের দাওয়াত দাও। তাকে ঈমানের কথা বলো, নামাযের কথা বলো। এরপর সেটা কমবেশি হতে থাক।

একজন কৃষক টুপি ছাড়া নামায পড়লে আমরা রাগ করি। কিন্তু নামায মোটেও না পড়লে রাগ করি না। রাসূল (ﷺ) যেটা যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন ওটাকে সেভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। একজন এসে বলছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, জান্নাতে যেতে আমাকে কী করতে হবে? তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ো, রোযা রাখো ইত্যাদি। সে বলল, আমি এর বেশি করব না, কমও করব না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এই লোকটা জান্নাতি।[13]

কেউ যদি ফরযটা অন্তত পালন করে, রাসূল (ﷺ) নিজেই তাকে জান্নাতি বলেছেন। তুমি তার সাথে আবার জুড়বে কেন? এজন্য তাকে বলতে হবে

১২. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭৩২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৮৩৫; সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৯।
১৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১১, ১৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৫৮, ৫০২৮।

আল্লাহর দীন সবচেয়ে সহজ। তুমি সালাত পড়বে তোমার জন্য। সালাত পড়ে এই ঈমানটাকে সহীহ রাখো। বাবামায়ের খেদমত করো। তাদের সাথে ভালো আচরণ করো। এরপরে ভুলভ্রান্তি হবে..., আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা করো। সে যখন বুঝবে দীনটা সহজ; অর্থাৎ একজন লোক তিন কিলো দৌড়াবে। তার আধা কিলো যদি টার্গেট থাকে তুমি এই পর্যন্ত গেলেই চলবে। ও তো যাবে। কিন্তু ওকে যদি তুমি তিন কিলো টার্গেট দাও, সে দেখে বলবে, অতদূর তো আমি যেতে পারব না।

যুবকেরা অনেক সময় অন্যায় করে। একজন যুবকের মাথায় চুল আছে, কানের দুল পরেছে, হাতে চুড়ি পরেছে। এটা দেখে তুমি খুব মাইন্ড কর। ও একেবারে পচা। ওর ভেতরেও কিন্তু ঈমান আছে। ওইগুলো করেছে কিন্তু কারোর দেখে দেখে প্রভাবিত হয়ে। তুমি ওর ওই লম্বা চুল দেখে ঘৃণা না করে, যদি ওকে ভালোবেসে বলো, ভাই, এগুলোর ভালো-মন্দ আছে, তোমার মাথায় যত চুল হোক, প্যান্ট ছোট বা বড় হোক নামাযটা ছেড়ো না। এই নামায আপনাকে আল্লাহ সাথে ধরে রাখবে। ও নামাযের দিকে এগিয়ে আসবে। আর যদি তুমি আগেই চুল নিয়ে সমালোচনা কর। বল যে, শয়তানের মতো দেখা যাচ্ছে। এটা ইসলামের কথা না। ইসলামকে তো এভাবে সমালোচনা করতে বলে নি। আল্লাহ যে তাকে ভালোবাসেন, তার ইবাদত আল্লাহর জন্য। মায়ের ভালোবাসা যত মজা লাগে আল্লাহর ভালোবাসা তারচেয়ে বেশি মজা লাগে। রাসূল (ﷺ) তাকে কত ভালোবাসতেন! এই ভালোবাসা তার ভেতর উজ্জীবিত করতে হবে। যে এই ভালোবাসার মজা পাবে তখন আর ছাড়তে পারবে না।

জিজ্ঞাসা: ৯৩

একজন প্রশ্ন করেছেন। আমরা যারা মহিলা আছি। এই দাওয়াতের কাজে আমরা ঘর থেকে বাইরে অন্য কোথাও যেতে পারব কি না?

জবাব:

মহিলারা ঘর থেকে বের হতে পারবেন যদি বিবাহিত হন স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে। যদি অবিবাহিত হন পিতামাতার অনুমতি সাপেক্ষে তারা বের হবেন। তবে এই বের হওয়াটা প্রথমত দূরে হবে না। সফরের

দূরত্ব পরিমাণ হবে না। সফরের দূরত্ব যেতে মাহরাম সাথে যেতে হয়। দ্বিতীয়ত, আপনার যাওয়াটায় নিরাপত্তা লাগবে। আরো বিষয় হল, যেটা আমরা খুব ভালো জানি সেটার দাওয়াত দেব। আমরা যেন এমন কোনো কথা না বলি যেটা ভুল ইলম হয়। কাউকে ভুল শেখালে সেখানে তার পাপটা কিন্তু আমার উপরে থেকে যাবে।

মেয়েরাও দাওয়াতে অংশ নেবেন পুরুষদের মতো। এবং দাওয়াতটা হবে আল্লাহ কুরআনে যেটা বলেছেন:

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ.

এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে ডাকছি। আমি এবং আমার অনুসারীরা। ওহির জ্ঞানের ভিত্তিতে।[১৪] কাজেই আমরা দাওয়াতে যাব অবশ্যই সহীহ জ্ঞানের ভিত্তিতে। কুরআনের ভিত্তিতে। সহীহ সুন্নাহর ভিত্তিতে। গল্পের ভিত্তিতে নয়। বিভিন্ন গল্প হেকায়াতের ভিত্তিতে নয়। কারণ আল্লাহ কুরআন কারীমে অন্য কয়েক জায়গায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দাওয়ার পদ্ধতি–

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

[তিনিই নিরক্ষর জাতির মধ্যে তাদের একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন।][১৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দাওয়াত ছিল কিতাব দিয়ে এবং হিকমাহ অর্থাৎ সহীহ সুন্নাহ দিয়ে। কাজেই আমাদের দাওয়াতটা পরিপূর্ণ কিতাব নির্ভর হতে হবে। কুরআন আমরা ভালো করে অধ্যায়ন করব। কুরআন-নির্ভর দাওয়াত দেব। সুন্নাহ-নির্ভর দাওয়াত দেব। সাহাবিদের মডেল তুলে ধরব। এগুলো ভালোভাবে জেনে, 'আলা বাসিরতিন' হয়ে আমাদের দাওয়াত দিতে হবে। আমরা বেশি জানি না, যতটুকু জানি, সালাতের

---

১৪. সূরা: [১২] ইউসুফ, আয়াত: ১০৮।
১৫. সূরা: [৬২] জুমুআহ, আয়াত: ২।

ততটুকু বলব। সত্য কথা, বলার কথা বলব। বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়িলগুলো আলিমদের উপর ছেড়ে দেব।

জিজ্ঞাসা: ৯৪

ইসলামি আন্দোলন করার জন্য বা ইসলামি আন্দোলনের কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনে পিতামাতার সাথে মিথ্যা বলতে পারব কি না?

জবাব:

জি, এটা অনেক যুবকের মনের একটা আবেগ। দীনি কাজে পিতামাতা বাধা দিলে মিথ্যা বলব না কেন! এই আবেগ কতটুকু ইসলামি? ইসলামি আন্দোলন..., আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি সংগঠন নিয়ে। যেটা ইসলামের কোনো পরিভাষা না। আন্দোলন শব্দটাও ইসলামের পরিভাষা না। আন্দোলন এটার ইংরেজি শব্দ মুভমেন্ট। আরবি হল হারাকা (حركة)। কুরআন-সুন্নাহয় এমন শব্দ কোথাও নেই। আমাদের কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত। যেকোনো ব্যাপারে সুন্নাতসম্মত কোনো পরিভাষা ব্যবহার করলে সমস্যা কম হয়। আমাদের সমাজে পরিভাষার জটিলতা অনেক। 'তাযকিয়ায়ে নাফস' যতদিন তাযকিয়ায়ে নফস ছিল ততদিন কোনো সমস্যা ছিল না। যখনই 'তাসাওউফ' হয়ে গেল, জটিলতা তৈরি হয়ে গেল। ঠিক ঈমান যখন ঈমান ছিল জটিলতা ছিল না। ঈমান যখন আকীদায় পরিণত হল, এটা নতুন পরিভাষা, কুরআন-সুন্নাতের পরিভাষা না, আমাদের সমস্যা, জটিলতা দেখা দিল। ঠিক তেমনি ইসলামের আন্দোলন– এই কথাটি একটি নতুন পরিভাষা। এটা দ্বারা কী বোঝাচ্ছে? খুবই জটিল একটা বিষয়। এটা দ্বারা কি আমরা জিহাদ বোঝাচ্ছি, এটা দ্বারা দাওয়াত বোঝাচ্ছি, লেখাপড়া বোঝাচ্ছি? এটা একটা জটিলতা তৈরি করে। তারপরও আমরা ধরে নিচ্ছি, ইসলামি আন্দোলন বলতে আমরা দাওয়াত অথবা জিহাদ বোঝাচ্ছি।

জিহাদ শব্দটার অর্থ হল চেষ্টা। আর শরয়ি অর্থ হল, কিতালুল আদুও– শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই। কাজেই আন্দোলনকে জিহাদ বলা ঠিক না। আন্দোলন হল দাওয়াতের একটা অংশ। ইসলাম প্রচারের, অন্যের কাছে ইসলাম পৌঁছে দিয়ে তার জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা, সমাজে ইসলাম

প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা, এটা মূলত জিহাদ নয়। জিহাদ হল রাষ্ট্রের অধীনে রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এটা হল পারিভাষিক অর্থ। যেমন সালাত মানে দুআ। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় সালাত শুধু দুআ নয়। একটি নির্ধারিত সিস্টেমে দুআ।

অনেক সময় আমরা মনে করি, জিহাদ বোধহয় আন্দোলন। আন্দোলন বোধহয় জিহাদ। এরপরে জিহাদ ধরে নিলেও জিহাদ এবং দাওয়াত কোনোটাই ফরযে আইন নয়। পিতামাতা বা স্বামীর অনুমতির বাইরে জিহাদ করা যায় না। এটা আমরা হাদীসে দেখে এসেছি। হাদীস শরীফে ঠিক এই যুবকের মতো একজন চলে এসেছে। যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলল্লাহঃ

إِنِّيْ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ مَعَكَ وَجِئْتُ أَسْتَشِيْرُكَ.

'আমি এসেছি আপনার নেতৃত্বে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব'। আমরা আন্দোলন বলতে পারি। কাতাল বলতে পারি। নবীজি (ﷺ) বললেনঃ

أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟

তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ

فَارْجِعْ... فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

ফিরে যাও। ফিরে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে জিহাদ করো।[১৬] অর্থাৎ তোমার আন্দোলনটা পিতামাতাকে নিয়ে করো। পিতা মাতার খেদমত তোমার উপর ফরয।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাছে এক যুবক এসেছে, ইয়া রাসুলুল্লাহ,

إِنِّيْ أَتَيْتُكَ لِأُجَاهِدَ مَعَكَ وَتَرَكْتُ وَالِدَيَّ يَبْكِيَانِ.

'আমি জিহাদের জন্য আপনার কাছে চলে এসেছি। আমার বাবামা কাঁদছিলেন'। আমাদের মতো আবেগী নেতা হলে বলতেন, মাশাআল্লাহ,

---

১৬. সহীহ বুখারি, হাদীস-৩০০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৫৪৯; জামিউল উসুল ১/৪০২; আল আহাদ ওয়াল মাসানি, হাদীস-১৩৭১।

এরকম মায়ের চোখের পানির বাধন ছিঁড়ে দীনের জন্য চলে এসেছে। এরকম যুবক-ই দরকার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মতো সস্তা আবেগের দীন প্রচার করেন নি। তিনি বললেন:

اِرْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا.

তুমি ফিরে যাও। তুমি যেমন কাঁদিয়ে এসেছ তাদেরকে গিয়ে হাসাও। পায়ের কাছে পড়ে থাকো। সেখানে জান্নাত পাবে।[১৭] এজন্য পিতামাতার কাছে মিথ্যা-সত্য কোনো কথা বলেই পিতামাতার অনুমতি ছাড়া দীনের কাজে; দাওয়াত বা আন্দোলন বা জিহাদে যাওয়া বৈধ নয়। পিতা মাতার খেদমত ফরযে আইন। আর এই ফরযে আইন সম্পূর্ণ করে তাদের অনুমতি নিয়েই এর বাইরে দাওয়াত বা জিহাদে যাওয়া যেতে পারে।

[অনেক যুবকের মধ্যে ঈমানি জযবা আছে। এটা খুবই ভালো। এই জাযবাকে সামনে নিয়ে অনেকেই আছে প্রয়োজনবোধে পিতামাতাকে ছেড়ে দিচ্ছে। দেশ ত্যাগ করছে। একদেশ থেকে আরেক দেশে হিজরত করার চিন্তাও করে। এই যে আবেগতাড়িত হয়ে এই কাজ করা আমাদের কতটুকু জন্য কল্যাণকর হতে পারে? -উপস্থাপক]

আসলে ইসলাম আবেগ নয়, ইলম দিয়ে। যখন ইসলামের আবেগ ব্যাপক থাকে আর সুন্নাতের, সীরাতের ইলম কম থাকে তখন আমরা ভুল করবই করব। এজন্য যুবকদের দায়িত্ব হল, সমাজের প্রচলিত মূলধারার আলিম-উলামাদের সোহবতে যাওয়া। তাদের কাছে প্রশ্ন করা কী করব? তারা কিছু ইসলামি পরিভাষা শোনে। যেমন, ইসলামের দাওয়াত, ইসলামের জিহাদ, ইসলামের হিজরত। কিন্তু এটা কী? এটা তারা বোঝে না;– কখন করতে হয়, কোন সিচুয়েশনে (পরিস্থিতিতে) করা যায় না। আর এটা কি ফরয? সুন্নাত, ওয়াজিব কখন হয়? অথবা তারা শব্দ শোনে ফিতনা। ফিতনা অর্থ কী? শাব্দিক অর্থ কী? আর এটার পারিভাষিক অর্থ কী? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবাদের এটা বলতে কী বুঝিয়েছেন? এটা তারা বোঝে না। না বুঝে তারা বিপদগ্রস্ত হয়ে যায়। এজন্য, হিজরত কখন। যখন মানুষ একটা দেশে দীন পালন করতে পারে না তখন হল হিজরত।

---

১৭. আসার আবু ইউসুফ, হাদীস-৯০২; আত তালখীসুল হাবীর ৪/২৪৫।

আর সহীহ বুখারি ও অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) এর সময়ে মুসলিম বিশ্বে একটা যুদ্ধ ছিল। একদিকে আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.)। মক্কায় তাঁর রাজধানী। আরেকদিকে উমাইয়ারা; মারওয়ান ইবন হাকাম, তার ছেলে আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান। সিরিয়া। আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর খুব পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি সহীহ শরীআহ কায়িম করেছেন। উমাইয়াদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের প্রায় নব্বই ভাগ আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইরের হাতে। উমাইয়ারা কোণঠাসা ছিল। আস্তে আস্তে তারা এগোতে লাগল। এ সময় অনেক যুবক আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) এর পক্ষে চলে গেল দিনের হেফাযতের জন্য। আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) প্রতিবছর হজ্জ করতেন। এই ব্যাপারটিকে কটাক্ষ করে কিছু যুবক তাঁকে এসে বলেছে:

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللهُ فِيْهِ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِيْ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ إِيْمَانٍ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ... قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ...

হে আবু আব্দুর রাহমান, আপনি নবীর সাহাবি হয়ে, মানুষ ফিতনায় জর্জরিত, আর আপনি শুধু হজ্জ-উমরাহ নিয়ে পড়ে আছেন? অথচ আল্লাহ কুরআনে বলছেন, লড়াই করো। যুদ্ধ করো তাদের সাথে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দীন শুধু আল্লাহর হয়ে যায়। তখন আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) বললেন, বাবা, আমরা ফিতনা দূর করার জন্য যুদ্ধ করেছি। তোমরা ফিতনার জন্য যুদ্ধ করছ। ফিতনা কী? ফিতনা হল, একজন মানুষ দীন পালন করতে পারছে না। জোর করে মূর্তিপূজা করানো হচ্ছে। তাওহীদের জন্য তাকে কতল করা হচ্ছে। ঈমান আনার কারণে মেরে ফেলা হচ্ছে। মূর্তিপূজা না করলে মেরে ফেলা হচ্ছে। এটার নাম হল ফিতনা। আমরা এটা দূর করে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছি। আর এখন তোমরা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যুদ্ধ করছ। এই যুদ্ধটাই হল মূল ফিতনা। এটা ফেতনা দূর করা হচ্ছে না। তোমরা যুদ্ধ করছ যেন

সবকিছু ফিতনা হয়ে যায়। মানুষ সহিসালামতে আল্লাহর ইবাদত করতে না পারে। এরপরে তিনি বোঝালেন দ্যাখো দীনের মূল হল পাঁচটা রুকন। ঈমান, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ। এগুলো হল দীন। আর এই যে এইগুলো হল দীনের উপকরণ। দীন যখন একেবারে আক্রান্ত হবে তখন তুমি লড়াই করতে পার। হিজরত করতে পার। কিন্তু ছোটছোট বিষয় নিয়ে লড়াই-হিজরত এটাই বরং ফিতনা। এই ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) এর অনেক মতামত আছে।[১৮]

সবকিছুর খোলাসা হল, আমাদের দেশগুলো সবই দারুল ইসলাম। মুসলমান যে দেশগুলোতে বাস করে। যেসব অমুসলিম দেশে মুসলিমরা বাস করছে আমান দ্বারা। মুসলিমদের সাথে তাদের সন্ধি আছে। শান্তিতে দীন পালন করতে পারছেন। এ ক্ষেত্রে পিতামাতার হক নষ্ট করে হিজরতের চিন্তা করা, এটা শরীআতসম্মত না।

জিজ্ঞাসা: ৯৫

স্ত্রীর জন্য স্বামীর হুকুম ছাড়া ইসলামের অথবা সাংগঠনিক কোনো কাজে যাওয়া যাবে কি না?

জবাব:

আসলে সংগঠন শব্দটাই কোনো ইসলামি শব্দ নয়। সংগঠন বলতে আমরা বুঝি, একটা দল, একটা গ্রুপ। কিছু মানুষ এক জায়গায় হয়। সুসংগঠিত হয়েছে। এই শব্দটা কোনো ইসলামিক শব্দ নয়। ইসলামে এর কোনো পরিভাষা নেই। কুরআন বা সুন্নাহয় এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। আমরা জামাআত শব্দটা ব্যবহার করি। জামাআত শব্দের অর্থ হল ঐক্য। দল-উপদল নয়। দল অর্থ ফিরকা। জামাআত শব্দের অর্থটা হল দলহীন ঐক্য।

জামাআ ইয়াজমায়ু জামাআন (جمع يجمع جمعا): জমা হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

আর দল সংগঠন হল ফিরকা। ফারাকা, ইফতারাকা, তাফাররাকা (فرق،

---

১৮. সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৫১৪।

(افترق, تفرق) মানে বিভক্ত হয়েছে। সংগঠন হল অনেক মানুষের ভেতর থেকে কিছু মানুষ একত্রিত হয়েছেন। তারা তাদের ভেতরে একত্রিত। কিন্তু মূল সমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। এজন্য, সাংগঠনিক কর্ম দীনের জন্য করা যেতে পারে। কিছু মানুষ এক জায়গায় একত্রিত হয়েছেন, দীনের কাজ করছেন। কিন্তু এটা ইসলামের মূল বিষয় নয়।

দীনের কাজের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অর্থ হল, সকল মুসলিম মনে মনে এক থাকবে যে, অন্তরে আমরা সবাই এক। আমাদের মুসলিমদের ভেতরে কোনো দল নেই। কাজের জন্য আমরা বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করতে পারি। এটা হল প্রথম বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় হল, দীনের কাজে সংগঠনের কাজ বলতে আমরা যেটা বুঝি, দাওয়াতি কাজ বা রাজনৈতিক কাজ। এই কাজগুলো অধিকাংশ সময় ফরয নয়। ফরয যেটা, ফরযে আইন– এই কাজ স্বামীর অনুমতি ছাড়া করা যায়। যেমন, সালাত আদায় করব, স্বামীর অনুমতি ছাড়া করা যাবে। স্বামী বাধা দিলেও করতে হবে। সিয়াম পালন করব, বাধা দিলেও করতে হবে। কিন্তু ফরযে কিফায়া– জানাযায় শরিক হওয়া, স্বামীর অনুমতি ছাড়া যাওয়া যাবে না। নফল, নফল সিয়াম স্বামীর অনুমতি লাগবে।

তৃতীয়ত হল, এই যে দাওয়াহ বা জিহাদ এগুলো ফরযে কিফায়া। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসে একটা যুবক বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে এসেছি জিহাদ করব বলে। আপনার কাছে এসেছি, আপনার নেতৃত্বে জিহাদ করব। রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমার পিতামাতা কি আছেন? হ্যাঁ আছে। তুমি ফিরে যাও। পিতামাতার খেদমতের মাধ্যমে জিহাদ কর। একটা যুবক এসে বলেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এসেছি আপনার নেতৃত্বে জিহাদ করব। আমার বাবামা কাঁদছিলেন। তিনি বললেন:

فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا.

তুমি ফিরে যাও। তাদেরকে হাসাও। যেমন তাদেরকে কাঁদিয়েছ। জান্নাত সেখানে আছে আমার এখানে নয়।[১৯]

১৯. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৪৯০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৫২৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২৭৮২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩১০৪।

তাহলে জিহাদ-দাওয়াত এই কাজগুলো ফরযে আইন নয়। ফরযে কিফায়া। যদি কারো পিতামাতা থাকে, পিতামাতার খেদমত ফরযে আইন। স্বামী থাকলে স্বামীর অনুমতি নেওয়া ফরযে আইন। কাজেই স্বামীর বিনা অনুমতিতে দীনি কাজের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া, অংশগ্রহণ করা, এটা বৈধ নয়। স্বামীর অনুমতিসহ অথবা ঘরে বসে যতটুকু করা যায়, এটা করতে হবে। পাশাপাশি স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের এই ধরনের কাজের অনুমতি দেওয়া। স্ত্রী যখন দীনি কাজে অংশ নেন, তার ভিতরে দীনি চেতনা বাড়ে। পারিবারিক শান্তি বাড়ে। স্বামীর প্রতি আনুগত্য বাড়ে। দীন সম্পর্কে জানতে পারেন। একাজে স্ত্রীদেরকে সহযোগিতা করা দরকার।

[আমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে দীনের জন্য খুব বেশি জযবা তৈরি করি। কিন্তু স্বামীর খবর নেই, সন্তানের খবর নেই, পারিবারিক শৃঙ্খলা– সেটাও আমরা লক্ষ করছি না। এরকম অনেক রিপোর্ট আমাদের কাছে আসে। আবার পুরুষেরাও অনেক সময় এরকম হয়। -উপস্থাপক]

পুরুষদের বিষয়েও বলা দরকার। যদিও পাঠক প্রশ্ন করেন নি। যেমন, পুরুষ দীনি দাওয়াতের জন্য, আন্দোলনের জন্য, ইলম তলবের জন্য স্ত্রী-সন্তানকে রেখে যান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে। মনে করেন এটা তাওয়াক্কুল। অথচ স্ত্রী-সন্তানের খেদমত একটি বিশেষ পর্যায়ে ফরযে আইন। স্ত্রী অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া ফরযে আইন।

[আমার পরিবার তো অন্য কেউ দেখতে পারবে না। দীনের কাজ তো আরো অনেক ভাই করতে পারবে! -উপস্থাপক]

এজন্য, স্ত্রী পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব পালন করা ফরযে আইন। আমি দীনের জন্য বের হতে পারব। কিন্তু ফরযে আইন অবহেলা করে বের হতে পারব না। এ দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় নফল... দীনের জন্য, দীনি দাওয়াত ফরযে কিফায়া। দীনি দাওয়াতের জন্য বাইরে যাওয়া, এটা নফল। নফলও নয়। দীনি দাওয়াত আমি দেব, আশেপাশে দিতে পারি। এজন্য আমাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে, এটা জরুরি নয়। হ্যাঁ, বাড়ি ছেড়ে গেলে আমার কাজের একাগ্রতা বাড়বে, ভালো কিছু মানুষের সাথে থাকব, এগুলো ভালো। কিন্তু এটা একেবারে নফল পর্যায়ের বিষয়।

আর স্ত্রী-সন্তানের দেখাশোনা, ভরণপোষণ, তারবিয়াত, সঙ্গ দেওয়া– এটা অনেক সময় ফরযে আইন পর্যায়ের। অনেক সময় নফল পর্যায়ের। নফলটা অবহেলা করা যেতে পারে, কিন্তু ফরযে আইনটা অবহেলা করা যেতে পারে না।

সুন্নাত/বিদআত

জিজ্ঞাসা: ৯৬

সকল আমলে, আমরা যে দৈনন্দিন আমলগুলো করি বা আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক সকল আমলে সুন্নাতের অনুসরণ কীভাবে করতে পারি?

জবাব:

আমাদের পাঠক জীবনের মূল কেন্দ্রে পৌঁছেছেন। বিষয়টা হল, আমরা আমল করি। সেটা কি আমাদের তৃপ্তির জন্য? ভালোলাগার জন্য? না আল্লাহ তাআলার কাছে কবুলিয়াতের জন্য? এটা আমাদের বুঝতে হবে। আর আল্লাহ তাআলার কাছে কবুলিয়াতের দরজা একটাই– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আমরা আমাদের ঈমানের সাথে বলি, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমাদের সকল ইবাদত, আরাধনা, উপাসনা আমাদের চাওয়-পাওয়া সবকিছু তাঁকে খুশি করতে। তাঁর কাছ থেকে সন্তুষ্টি, সাওয়াব পাওয়ার জন্য। আর আমরা এর সাথে সাথে বলছি, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (ﷺ), অর্থাৎ কোন পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করলে, আল্লাহকে ডাকলে, আল্লাহর যিকির করলে, আল্লাহর জন্য কাজ করলে আল্লাহ কবুল করবেন। এ পদ্ধতিটা আল্লাহ একমাত্র তাঁকে শিখিয়েছেন। আর আমরা তাঁর কাছ থেকে শিখে নেব। এজন্যে ঈমানের অর্থই হল আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছ ছাড়া কারো কাছে ইবাদত শিখব না। ইবাদত আল্লাহর আর ইবাদতের পদ্ধতি একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আর এই ইবাদতের পদ্ধতি, এটার নামই হল সুন্নাত।

তাহলে আমরা পাঠকেরা একমত হলাম, আল্লাহর ইবাদত সুন্নাত পদ্ধতির

বাইরে করলে আল্লাহ কবুল করেন না। এটাই আমাদের ঈমানের কথা, ঈমানের দাবি। যদি আমি কোনো ইবাদত করি, যেটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শেখান নি। তার বাইরে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করি, তাহলে আমার বিশ্বাস মূলত এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শিক্ষা আমার প্রয়োজন হল না। অথবা তাঁর শিক্ষার বাইরেও আল্লাহকে পাওয়া যেতে পারে। আর এই বিশ্বাস তো ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক!

এখন পাঠকের প্রশ্ন হল, কীভাবে আমরা সুন্নাত সম্পর্কে জানব?

এজন্য প্রথম হল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে পড়তে বলেছেন। আল্লাহ আমাদের পড়তে বলেছেন। কুরআন পড়তে হবে, হাদীস পড়তে হবে। নিজে যতটুকু সম্ভব। পাশাপাশি সুন্নাহ্ নির্ভর, সহীহ সুন্নাহ্ নির্ভর গবেষক আলিমদের লেখা পড়তে হবে। আর কারো লেখাই তথ্য বিচার, যাচাই ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেছেন:

اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ.

যারা কথা শোনে এবং কথার ভেতর থেকে ভালোগুলোকে গ্রহণ করে আমল করে।[১] তার মানে আমরা যা শুনব তাতেই উত্তেজিত হব, গ্রহণ করব– এটা মুমিনের প্রকৃতি হতে পারে না। প্রতিটি কথা আমরা যাচাই করার চেষ্টা করব। প্রথমত কুরআন-সুন্নাহ থেকে। পারলে ইন্টারনেট থেকে। না হলে অন্য কোনো ভালো আলিমদের থেকে যাচাই করব। যেখানে সন্দেহ সেখানেই যাচাই। এভাবে যখন মুমিনের চেতনা থাকে আমি সুন্নাতের বাইরে যাব না। যে যাই বলুক, আমি সুন্নাত দিয়ে যাচাই করব, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করেছেন কিনা!

পাঠক, এখানে একটা ফাঁক থাকে। সেটা হল যুক্তির দলীল। এই যুক্তিতে, এই দলীলে। না, আপনি শুনবেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এভাবে করেছেন কি না। সুন্নাত হল তাঁর আচরিত কর্মপদ্ধতি। এভাবে যদি আমরা এগোতে থাকি তাহলে আমরা সুন্নাত পেয়ে যাব।

---

১. সূরা: [৩৯] যুমার, আয়াত: ১৮।

[আমরা দুনিয়াবি, অর্থাৎ বৈষয়িক কাজে অনেক যাচাই-বাছাই করি। সন্তান অসুস্থ হলে কোনো ডাক্তার দেখানোর আগে দশ বারোজনের সাথে শলাপরামর্শ করি। কিন্তু যখন দীন-আমলের কথা আসে তখন আমাদের এই অনুসন্ধানটা কম। -উপস্থাপক]

এখানে আরেকটা মজার উদাহরণ, একভাইয়ের সাথে আলোচনা করেছিলাম। একভাই বাজারে গিয়েছেন। হয়ত আলু কিনছেন। দোকানদার আলুগুলো তুলে দিচ্ছে। অথবা লেবু কিনছেন। তুলে দিচ্ছে। 'রাখ আমি বেছে নেব'। উনি কিন্তু ঢেলে দিতে দিচ্ছেন না। উনি হাত দিয়ে বেছে সুন্দরটা নিচ্ছেন। ওই ব্যক্তি যখন আযান হল। মসজিদে ঢুকলেন। উনি কী আমল করছেন একটাও বেছে নিচ্ছেন না। সমাজে প্রচলিত আছে করে যাচ্ছেন। একটু যাচাই করে দেখব সুন্নাত দিয়ে, হাদীস দিয়ে– এই চেতনা তার কেন আসছে না, আমরা বুঝতে পারি না।

জিজ্ঞাসা: ৯৭

বিভিন্ন তরীকার যিকিরের পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের। আমরা তো সবাই এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি। তাহলে যিকিরের পদ্ধতিটা একাধিক রকমের হবে কেন? আমরা সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণ করে কীভাবে যিকির করতে পারব?

জবাব:

এখানে মূল সমস্যা হল, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছি বলে এই সমস্যাটা হচ্ছে। বিশেষ করে যিকির, ওযীফা, নামায– এগুলো সবই তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিখিয়ে গেছেন। নামায যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিখিয়েছেন, যিকিরের ওযীফাও তিনি দিয়েছেন। সকাল থেকে ঘুমানো পর্যন্ত। এমনকি ঘুমানোর ভেতরেও কীভাবে ওযীফা করব, এটাও তিনি শিখিয়ে গেছেন। কতবার করব, কোন পদ্ধতিতে করব তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। তরীকাগুলোর বিষয় হল, এক সময় এটা অনেকটা সিলেবাস মতো ছিল। এক সময় কিছু আলিম, যখন মানুষ জাহিল ছিল, তারা সুন্নাত থেকে বাছাই করে কিছু আমল দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তরীকা বলতে আমরা এখন যেটা বুঝি, সব মানুষের বানানো।

মনে করেন, চিশতিয়া তরীকা বাংলাদেশ একরকম। ইন্ডিয়ায় এক রকম, খুলনায় একরকম, কুমিল্লায় এক রকম। আবার শাহজালালিয়া তরীকা। একই হুযুরের নামে চলছে, কিন্তু এক এক জায়গায় এক এক রকম। তার মানে এগুলোর কোনোটাই তারা দেন নি। তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে আমরা বানাচ্ছি। এজন্য সমাজে ফটোকপির পর ফটোকপি; আমরা কপি করি ভাই। ফটো থেকে ফটো বানাই, তার থেকে ফটো বানাই। মূল থাকে না। এজন্য আমাদের আসলে যেতে হবে। কুরআন এবং সুন্নাহর ভেতর। আসলে ভুল থাকে না। কপি করতে করতে ছবি একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য আমরা সবাই সুন্নাতে ফিরে যাই। সুন্নাত ওযীফাগুলো পালন করি। সুন্নাত তরিকায় আমল করি। এর উপর অনেক বইও আছে। আমি গুনাহগার একটা বই লেখেছি **রাহে বেলায়াত** নামে। মাসনূন ওযীফার একটা বই আছে। ছোট বই। **সহীহ মাসনূন ওযীফা**। যিকিরের উপরে **হিসনুল মুসলিম** নামে একটা ভালো বই আছে। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এছাড়াও মিশকাত শরীফের 'কিতাবুল আযকার' পড়লে যে কেউ মাসনূন ওযীফা এবং তরীকা পেয়ে যাবেন। এগুলো আমাদের করা উচিত।

যদি আমরা কোনো পীরের কাছে, আলিমের কাছে যাই, তার তরিকা নিতে নয়। আমি বলব, হুযুর, আমি সুন্নাত তরীকায় আল্লাহর যিকির করতে চাই। আপনি আমাকে সুন্নাত তরীকায় আমলগুলো বলে দেন। তাহলে আমরা ভালোটা পাব, ইনশাল্লাহ।

[কালিমাকে ভাগ করে কেউ কেউ শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'ইল্লাল্লাহ' যিকিরের মতো আমাদের দেশে আছে -উপস্থাপক]

এটা আরো আপত্তিকর। যিকির কয়েক রকম। একটা হল সুন্নাত। বাক্য সুন্নাত, পদ্ধতিও সুন্নাত। আরেকটা হল বাক্যটা সুন্নাত, পদ্ধতি সুন্নাত নয়। আরেকটা হল, বাক্যও অসুন্নাত পদ্ধতিও অসুন্নাত। ওটা শতভাগ বিদআত আর কি। আমরা যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির করি। যিকিরের ক্ষেত্রে সাহাবিগণ যিকির করেছেন। কোন শব্দ কোথাও টানতে হবে, কোথাও ঢিল দিতে হবে, কোথাও উঁচু করতে হবে, কোথাও ছোট করতে হবে, কখনো তারা করেন নি। আমরা স্বাভাবিকভাবে যিকির করব। আল্লাহর সাথে কথা

বলছি। আমি মনের আবেগে আল্লাহর কথা বলব। আমি যখন আমার কোনো এমপি, মুরুব্বির সামনে কথা বলি। যেমন আদবের সাথে বলি সেভাবে বলব। একজন 'সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ' যিকির করছেন। তিনি এটা সুন্নাত যিকির করছেন। কিন্তু তিনি যদি সমস্বরে করেন? পদ্ধতিটা গায়ের সুন্নাত হয়ে গেল। একজন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির করছেন। সুন্নাত যিকির করছেন। কিন্তু যখন 'লা ইলাহা' বাদ দিয়ে শুধু 'ইল্লাল্লাহ' করছেন, এই বাক্যটা অসুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শ্রেষ্ঠ যিকির।[২] আমার কি কষ্ট হল যে, অর্ধেক যিকিরটা বাদ দিলাম? আমার কি এত কষ্ট হল, যেটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবিরা আজীবন করলেন! কাজেই এটা আমাদের বর্জন করতে হবে। যুক্তি নয়। অমুক করেছেন, তমুক করেছেন। আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবিরা কি যথেষ্ট নয়? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুন্নাতে পরিতৃপ্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

জিজ্ঞাসা: ৯৮

আমরা আল্লাহ তাআলার যিকির করার চেষ্টা করি। যিকিরের মধ্যে অনেক নিআমত আছে, শান্তি আছে। কিন্তু অনেক পীর সাহেব বা তাদের মুরীদেরা যিকির করে 'ইলহু, ইলহু' এ রকম করে। বিভিন্ন কায়দায়। কোনো শব্দই বোঝা যায় না। একটা সাউন্ড বোঝা যায়। এই জাতীয় শব্দ বা সাউন্ড করে অথবা 'ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ ইলহু ইলহু' এ রকম করে যিকির করা জায়িয আছে কি না?

জবাব:

জি, এটা একটা গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা আমাদের মুসলিম সমাজের একটা বাস্তবতা। বিশ্বের সব দেশের মুসলিমদের ভেতর এগুলো রয়েছে। আসলে প্রথমে এখানে আমাদেরকে জানতে হবে, যিকির কেন করছি? যিকির যদি দুনিয়ার কোনো প্রয়োজনে হয়, সেটা ভিন্ন কথা। যিকির

২. সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৩৮৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৮০০; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৮৪৬; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১৮৩৪।

যদি আল্লাহকে খুশি করতে হয়, তাহলে আমাদের একটা মডেল আছে। মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আমাদের ঈমানটা কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'– আল্লাহর ইবাদত করব, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ', অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতটা কীভাবে করব– এটা মুহাম্মাদ (ﷺ) থেকে শিখব। তাহলে, আমরা যত ইবাদত করি... সালাত। আমরা সালাতে হাত কোথায় বাঁধব। হাতটা কোথায় তুলব। সিজদা কীভাবে দেব। কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ কবুল করবেন– এই পদ্ধতির সবগুলো কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শিখব। এটাই হল ঈমান।

ইবাদত করব একমাত্র আল্লাহর। যেকোনো ইবাদতের সাওয়াব তিনি দেবেন বলে আশা করব। আর ইবাদত কীভাবে করলে আল্লাহ কবুল করবেন, সাওয়াব দেবেন– এটা শিখব মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কাছে। এটাই হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ'র প্রতি ঈমানের দাবি। তাহলে যিকির একটা ইবাদত। আমরা অনেক সময় ভুল বুঝি যে, কুরআনে আল্লাহ যিকির করতে বলেছেন। যার যার ইচ্ছামতো যিকির করব। তাহলে আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' মানলাম, কিন্তু 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' মানলাম না। আল্লাহ তো এমন করেন নি। আল্লাহ দুটো করে দিয়েছেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

সুন্দর মডেল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ভেতরে।[৩]

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ.

তোমরা যদি আল্লাহর প্রেম করে থাক রাসূলের ইত্তিবা' করো।[৪] কাজেই যিকিরটা রাসূল (ﷺ) এর ইত্তিবায়ে হতে হবে। কাজেই, কুরআনের একটা আয়াত দিয়ে, হাদীসের একটা ফযীলত দিয়ে ইচ্ছামতো করলে এটা নবুয়াতের উপরে অবাধ্যতা করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাত ইনকার করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকল যিকির করেছেন। প্রত্যেক যিকিরের পদ্ধতি সহীহ হাদীসগুলোতে রয়েছে। এর বাইরে যেটাই করা হবে সেটাই কোনো ইবাদত হবে না। এটা অন্য মজা হতে পারে, তৃপ্তি

৩. সূরা: [৩৩] আহযাব, আয়াত: ২১।
৪. সূরা: [৩] আল ইমরান, আয়াত: ৩১।

লাগতে পারে। তবে এতে কোনো ইবাদত হবে না। সাওয়াব হবে না। বিদআত হবে, গুনাহ হবে।

এই পদ্ধতিগুলো, যেটা পাঠক প্রশ্ন করেছেন, এগুলোর কো.নাটাই হাদীসে পাওয়া যায় না। আর এটা বিতর্কের কোনো বিষয় না তো। যারা করছেন, তাদেরকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এটা এভাবে করেছেন কি না? তারা যদি হাদীসে দেখান, আলহামদু লিল্লাহ। আর যদি হাদীসে না থাকে, যুক্তি দলীল দেন, আমরা একটা কথাই বলব, আমরা ইবাদত যুক্তি দিয়ে করি না। আমরা রাসূল (ﷺ) এর ইত্তিবা' দিয়ে করি।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ.

আর ইবাদতের জন্যে যুক্তিতে যাওয়ার অর্থই হল, রাসূল (ﷺ) এর ইবাদতটা বোধহয় কবুল করেন নি। সাহাবায়ে কিরামও বোধহয় এই পদ্ধতি বোঝেন নি। কাজেই, ভাইয়েরা এই যে পদ্ধতিগুলো, এগুলো কোনটাই দীন নয়। আমি আরো দেখেছি, বিভিন্ন দেশে দেখেছি, অনেকে অনেক কষ্ট করে এসব পদ্ধতিতে যিকির করে। কিন্তু অল্প সুন্নাত যিকিরে হৃদয়ে যে প্রভাব, দুআ কবুলের অবস্থা, এটা কিন্তু অনেক ব্যাপক। অনেকেই এই যিকির করতে গিয়ে অনেক বেশি কষ্ট করেন। শব্দ করেন, সেগুলো অপ্রয়োজনীয়। শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক। ইসলামকে অবমাননা করা হয় নীরবে। আল্লাহ কুরআনে যিকির শিখিয়েছেন:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ.

[আপনি আপনার প্রতিপালককে আপন মনে স্মরণ করতে থাকুন বিনম্রতা ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চস্বরে।][৫]

আমি যখন প্রধানমন্ত্রীর সামনে বসে তাকে ডাকি, কী আদবের সাথে ডাকি! আর আমি আল্লাহর সামনে চিল্লায়ে চিল্লায়ে ডাকব তাঁকে?! আল্লাহ শুনছেন না? এজন্য আদবের সাথে, ভদ্রতার সাথে, বিনম্রতার সাথে আল্লাহর দিকে মুখ করে অল্প যিকিরে তা'সীর বেশি, হৃদয়ের সাফাই বেশি। দুআ কবুলও বেশি হয়।

---

৫. সূরা :[৭] আ'রাফ, আয়াত: ২০৫।

[অনেকে বলেন, জোরে জোরে বললে নাকি অন্তর বেশি সাফ হয়? - উপস্থাপক]

তাহলে বুঝতে হবে রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবিদের অন্তর সাফ হয় নি। তারা তো এভাবে করেন নি। আল্লাহ তো বললেন, আস্তে আস্তে করো। মৃদুস্বরে করো। না এই যুক্তিগুলোর সাথে আমরা যাব না ভাই, যে যুক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পদ্ধতিকে ছোট বানিয়ে দেয়। জোরে না বললে কলব সাফ হয় না। কাজেই নবীজি (ﷺ) এর কলব সাফ হয় নি! সাহাবিদের কলব সাফ হয় নি! তাবিয়িদের কলব সাফ হয় নি! এটা তো খুব খারাপ যুক্তি। আমি কেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতকে ছোট করার যুক্তি দেব? বরং বড় করার যুক্তি দেব।

জিজ্ঞাসা: ৯৯

আমাদের এলাকায় কেউ মারা গেলে মৃত্যু উপলক্ষে বিবাহের ন্যায় খানার আয়োজন করা হয়। এবং জানাযা পড়ে এলান (ঘোষণা) করা হয়, খাবার না খেয়ে কেউ যেন না যায়। শরীআতের দৃষ্টিতে মৃতের বাড়িতে এরকম আয়োজন করার বিধান কী?

জবাব:

শরীআতের আগে মারফতের কথা বলি। এ ধরনের আয়োজন করাটা আমাদের মারফতে, অর্থাৎ মনের চিন্তায় খুব ভালো কাজ। কারণ ফ্রি খাওয়া সমাজে সাধারণত পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজে দুটো খাদ্য ফ্রি। একটা হল বরযাত্রী খাওয়া। আরেকটা হল মরা খাওয়া। এজন্য মরার সঙ্গেসঙ্গে সমাজে মানুষদের লোভে লালা পড়তে শুরু করে যে, ভালো একটা খাবারের আয়োজন হবে। আর এই ধরনের খাওয়ানোর ক্ষেত্রে, কেউ যদি খাওয়ান, তার জন্য আমাদের স্পেশাল দুআ করা উচিত যে, আল্লাহ, এরা এত ভালো, মানুষ মরলে খুশি হয়। বিবাহের খুশির মতো মরলেও খুশি হয়! আর অন্যদিকে বিবাহের দাওয়াত দেয় বেছে। আবার খেতে গেলে কিছু হাদিয়াও দিতে হয়। আর মরার খাওয়াটা সবাইকে দাওয়াত দেয়। এবং হাদিয়া দেওয়া লাগে না। ফ্রি। কাজেই আল্লাহ, এদের বাড়িতে ঘনঘন মরুক! আর আমরা ঘনঘন খাই!

[অনেকে বলেন, জোরে জোরে বললে নাকি অন্তর বেশি সাফ হয়? - উপস্থাপক]

তাহলে বুঝতে হবে রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবিদের অন্তর সাফ হয় নি। তারা তো এভাবে করেন নি। আল্লাহ তো বললেন, আস্তে আস্তে করো। মৃদুস্বরে করো। না এই যুক্তিগুলোর সাথে আমরা যাব না ভাই, যে যুক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পদ্ধতিকে ছোট বানিয়ে দেয়। জোরে না বললে কলব সাফ হয় না। কাজেই নবীজি (ﷺ) এর কলব সাফ হয় নি! সাহাবিদের কলব সাফ হয় নি! তাবিয়িদের কলব সাফ হয় নি! এটা তো খুব খারাপ যুক্তি। আমি কেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাতকে ছোট করার যুক্তি দেব? বরং বড় করার যুক্তি দেব।

জিজ্ঞাসা: ৯৯

আমাদের এলাকায় কেউ মারা গেলে মৃত্যু উপলক্ষে বিবাহের ন্যায় খানার আয়োজন করা হয়। এবং জানাযা পড়ে এলান (ঘোষণা) করা হয়, খাবার না খেয়ে কেউ যেন না যায়। শরীআতের দৃষ্টিতে মৃতের বাড়িতে এরকম আয়োজন করার বিধান কী?

জবাব:

শরীআতের আগে মারফতের কথা বলি। এ ধরনের আয়োজন করাটা আমাদের মারফতে, অর্থাৎ মনের চিন্তায় খুব ভালো কাজ। কারণ ফ্রি খাওয়া সমাজে সাধারণত পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজে দুটো খাদ্য ফ্রি। একটা হল বরযাত্রী খাওয়া। আরেকটা হল মরা খাওয়া। এজন্য মরার সঙ্গেসঙ্গে সমাজে মানুষদের লোভে লালা পড়তে শুরু করে যে, ভালো একটা খাবারের আয়োজন হবে। আর এই ধরনের খাওয়ানোর ক্ষেত্রে, কেউ যদি খাওয়ান, তার জন্য আমাদের স্পেশাল দুআ করা উচিত যে, আল্লাহ, এরা এত ভালো, মানুষ মরলে খুশি হয়। বিবাহের খুশির মতো মরলেও খুশি হয়! আর অন্যদিকে বিবাহের দাওয়াত দেয় বেছে। আবার খেতে গেলে কিছু হাদিয়াও দিতে হয়। আর মরার খাওয়াটা সবাইকে দাওয়াত দেয়। এবং হাদিয়া দেওয়া লাগে না। ফ্রি। কাজেই আল্লাহ, এদের বাড়িতে ঘনঘন মরুক! আর আমরা ঘনঘন খাই!

আমার ধারণা, সুপ্রিয় পাঠক, মরার পরে খাওয়ানোর যে আয়োজন এটা বর্বর আয়োজন। কারণ খাওয়ানো হয় আনন্দে। আমি মানুষের মৃত্যুতে কী আনন্দ পেলাম যে, আমি খাওয়াব? দ্বিতীয়ত, এটা সুন্নাহ্‌বিরোধী কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কারো বাড়িতে মারা গেলে তিনদিন পর্যন্ত ওদেরকে রান্না করতে দেবে না। তোমরা খাওয়াবে। কারণ তারা শোকার্ত, তারা রাধবে কী! তাদের তো রাঁধার মানসিকতাই নেই।[৬] অনেক সময় আসলেই মানুষ না খেয়ে থাকে। খাওয়ার কোনো মন নেই। তাকে সেধে খাবার নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে তাদেরকে রান্না করতে বাধ্য করি। অনেক মেহমান চলে গেছে...। এ শোক মাথায় নিয়ে তাদের রান্না করতে হয়। এটা সুন্নাহ্‌বিরোধী, মানবতাবিরোধী কাজ। এবং এটা বর্বর কাজ, যে, মানুষকে মৃত্যু উপলক্ষে খাওয়াতে হবে। মৃত্যু উপলক্ষে যেটা করতে হয়, শোকে সান্তনা দিতে হবে। অন্যান্যরা তাদেরকে খাওয়াবেন। তাদেরকে অন্তত এক সপ্তাহ রান্না করতে না হয় সে ব্যবস্থা করবেন। এবং যাদের কেউ মারা গেছেন তারা মৃত্যুর পরে শোক কমে উঠলে সদকায়ে জারিয়া করবেন। অর্থাৎ মসজিদে, মাদরাসায়, জনকল্যাণে কিছু দান করবেন।

এই খাওয়ার অভ্যাসটা এসেছে, এক সময় ভারতীয় ঐতিহ্য ছিল শ্রাদ্ধ করা। মানুষকে খাওয়াতে হবে। এটা ভারতীয়, আমাদের হিন্দু ভাইদের কাছে শুনেছি যে, মৃত সৎকারে যে থাকবে তাকে না খাওয়ালে মৃত ব্যক্তি কষ্ট পাবে। এজন্য তারা বারবার বলেন, যারা এসেছেন, খানা না খেয়ে যাবেন না। একদম হিন্দুয়ানি কালচার থেকে এসেছে। আমার কাছে একটা কিশোর-তরুণ, অনার্স ফার্স্ট-সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে বোধহয়, মুসলিম হয়েছে। হিন্দু ছেলে। জিজ্ঞেস করি, তুমি কেন মুসলিম হলে? বলে, আমার বাবাকে যখন পোড়ায় খুব কষ্ট পেয়েছি, যে, আমার বাবাকে এরকম পুড়িয়ে ফেলল! মুসলিমদের রীতিটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি মুসলিমদের কিছু ধর্ম পড়েছি। আমার মুসলিম হওয়ার ইচ্ছা। ওর পরিবার ওর উপর অনেক অত্যাচার করে। ভগ্নিপতিটা মারা গেল। আমি বললাম, বোনের সেবা করাটা কিন্তু ইসলামের দায়িত্ব। তুমি বোনের

---

৬. সুনান তিরমিযি, হাদীস-৯৯৮।

পাশে থাকবে। তো সে তার বোনের পাশে ছিল। তার কিছু মুসলিম বন্ধুও তার বোনের পাশে ছিল। ছেলেটার ভগ্নিপতিকে মৃত্যুর সময় সেবা করা, যত্ন করা, শ্মশানে নেওয়া– সব করেছে। এখনো বোন কাঁদছে, তোমার বন্ধুদের বলো তোমার বন্ধুরা যদি না খেয়ে যায় তাহলে তোমার দুলাভাইয়ের আত্মা কষ্ট পাবে। তো এখন ওরা পড়ে গেছে বিপদে। খেতেই হবে।

এই যে ভারতীয় বা হিন্দুয়ানি যে কুসংস্কার আচ্ছন্ন চিন্তা। এটা আমাদের মুসলিমদেরকে গ্রাস করেছে। এজন্য কেউ মারা গেলে খাওয়ার আয়োজন করা একটা হিন্দুয়ানি কালচার। এবং এটা বর্বর অভ্যাস। আমরা দয়া করে এটা থেকে উদ্ধার পাই। বর্তমানে যেটা হয়, কেউ যদি সহীহ সুন্নাহর কথা শোনে। বাবামার মৃত্যুর পরে খানা না করে, মসজিদে দেওয়ার কথা বলে। মানুষ তাদের একঘরে করে। সন্ত্রাসী থেকে শুরু করে মোল্লা পর্যন্ত সবাই বলে, বাপটা মরে গেল খাওয়াবে না?! একটা ছেলেকে বিয়ে দিল, খাওয়ায় নি। কোনো অসুবিধা নেই। বাপ মারা গেছে এত আনন্দের যে, আমাদের সাথে শেয়ার করবে না?! এরকম একটা চিন্তা।

জিজ্ঞাসা: ১০০

মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা করা হয়। ৪০ দিনের মধ্যে একটা অনুষ্ঠান করা হয়। এতে করে মৃত ব্যক্তির প্রতি আমাদের কোনো ইহসান করা হয় কি না?

জবাব:

আসলে আমাদের আবারো আগে ফিরে যেতে হবে। মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পাবে কি পাবে না, এইটা জানার উৎসটা কী? এটা জানার উৎস ওহি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), তাঁর সাহাবি, তাবিয়িগণ, আমাদের যে প্রসিদ্ধ ইমাম তারা কেউ কখনো কোনোদিন কোনো মাইয়েতের জন্য চল্লিশা করেন নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় তাঁর সন্তান, তাঁর স্ত্রী এবং অগণিত আপনজন মৃত্যুবরণ করেছেন। সাহাবাদের পিতামাতা আপনজন মৃত্যুবরণ করেছেন। কখনো একটি বারের জন্য কেউ কখনো কোনো সময় তিনদিন, চল্লিশদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকীতে অনুষ্ঠান

করেন নি। এটা একেবারে অনৈসলামিক একটা অনুষ্ঠান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে মানুষ মৃত্যুবরণ করলে কী করতে হবে বলে দিয়েছেন। একটা হল তার জন্য দান করা। আরেকটা হল তার জন্য দুআ করা। একটা তার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া করা। স্থায়ী কোনো দান করা। মসজিদ বানিয়ে দেওয়া। এতিমখানা বানিয়ে দেওয়া। কিছু সম্পত্তি এতিমখানায় দিয়ে দেওয়া। একটা ঘর করে দেওয়া। যে দানটা স্থায়ী থাকে। মানুষ তার থেকে কল্যাণ পেতে থাকে। এটা তিনি শিখিয়েছেন।

আর খাদ্য বিতরণ এটা ভারতীয় একটা ট্রেডিশন। এটা ইসলামের কিছু না। এটার কয়েকটা অপকারিতা আছে। প্রথম কথা হল, এটা একটা অমানবিক কাজ। যে, একজন মানুষ মারা গেছে, মৃত্যু হল, আমরা আনন্দ করছি। খানা তো হয় আনন্দে– বিবাহ, ওলিমাতে, কেউ চাকরি পেলে, আনন্দে। কিন্তু মৃত্যুটা কি এত আনন্দের তার জন্য আমি সবাইকে ডেকে খানা খাওয়াব? এটা যুলুম। একজন মৃত ব্যক্তির উপর অত্যাচার করছি যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দেরকে খানা খাওয়াতে বাধ্য করছি আমরা।

[অনেকে যুক্তি দেন গরীবদের খাওয়ালে সাওয়াব হয় - উপস্থাপক]

গরীবদের খাওয়ালে সওয়াব হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে গরীবদের খাওয়ালে সাওয়াব হয় কি না? এটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাত না। দ্বিতীয়ত, গরীবদের আপনি খাওয়াবেন; কিন্তু গরীবদের তো খাওয়ানো হচ্ছে না। বড়লোক, বেনামাযি, সন্ত্রাসী এরাই তো খাচ্ছে। এদের খাওয়ালে সাওয়াব হয়, এটা আপনাকে কে বলেছে? বরং কোনো পাপী-খুনি, এ ধরনের মানুষদেরকে সম্মান করলে আমিও পাপের ভাগীদার হয়ে গেলাম।

এটা সামাজিকতা মাত্র। আপনি যদি খাওয়াতে চান, একটা গরু এতিমখানায় দিয়ে দিলে তারা খেতে পারত। কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা জন্য সমাজ থেকে চাপ তৈরি করা হয়। কারণ সমাজের দুটো খানা ফ্রি। একটা হচ্ছে বরযাত্রী খানা। আরেকটা হল মৃত ব্যক্তির জন্য যে খানা। আর এই ফ্রি খাওয়ার জন্য সমাজের সবাই আমরা উদগ্রীব। যেকোনো মূল্যে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ-খায়ের হোক বা না হোক খানাটা যেন হয়, এটা আমরা চেষ্টা করি। খানা না করলে বদনাম দেয়। কারণ আমরা ফ্রি খেতে পারলাম

না। আমরা আশা করছি, পাঠকরা এই বদরসুম (কুপ্রথা) পরিত্যাগ করে এই টাকাটা কোনো সমাজ কল্যাণে, এতিমখানায়, মসজিদে, মানুষের কল্যাণে স্থায়ীভাবে ব্যয় করবেন। এটা সুন্নাত পদ্ধতিতে সাওয়াব হবে। আর আমরা একলাখ টাকা খরচ করে একবার খাওয়ালাম। দুনিয়ার অন্যায়কারীরা এসে খেয়ে গেল। সুন্নাতবিরোধী কাজ। সাওয়াব হল না। কিন্তু ওই টাকাটা স্থায়ী দান করলে কিয়ামত পর্যন্ত আমার আব্বা-আম্মা সাওয়াব পেতে থাকবে।

[আমাদের সমাজে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে মারামারি খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায় - উপস্থাপক]

কারণ এ খাওয়াতে সমাজের সবচেয়ে দুষ্টু লোকেরা সন্ত্রাসীরা খুব উদগ্রীব। কারণ এটা ফ্রি খাওয়া। যত বেশি খাওয়া যায়। এইজন্যই সামাজিকতাটা তুলে দেওয়া খুবই দরকার। এটা অমানবিক কাজ। একটা মানুষ মারা গিয়েছে আমি ফুর্তি করছি।

জিজ্ঞাসা: ১০১

সাধারণ মানুষকে কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাতের ইশারায় কবরের দেয়াল স্পর্শ করে কবরবাসীকে সালাম দিতে দেখা যায়। এভাবে সালাম দেয়ার প্রচলন শরীআত সম্মত কি না?

জবাব:

প্রথম কথা, কবরকে মাযার বলা, এটা একটা ইসলামবিরোধী কাজ। আমরা যখন হাদীস পড়ি রাসূলুল্লাহর (ﷺ), সাহাবিগণ, তাবিয়িগণ, ইমামগণ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ (রাহ.) হাসান বাসরি, জুনাইদ বাগদাদি... আমরা শতশত বছর পর্যন্ত বই দেখি, কেউ কখনো কবরকে মাযার বলেন নি।

রওযা তো বলেন-ই নি। তারা বলেছেন, زرت قبر رسول الله. رأيت قبر رسول الله... । 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কবর দেখলাম। কবর যিয়ারত করলাম। কবরে গেলাম, কবরকে সালাম করলাম'। তারা কবরকে কখনোই মাযার বলেন নি। কবরকে মাযার বলাটাই একটা বিদআত। যেটা আমাদেরকে

একটা বড় শিরকের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। যখন কবর বলি, তখন ভেতর এত অতিভক্তি আসে না। যখন মাযার বলি, তখন আরেকটু ভক্তি জন্মে। জৌলুস ভাব আসে। মনের ভেতর একটা মুক্তির প্রবণতা চলে আসে। কেন বলি? সবার কবরকে তো মাযার বলি না। নিশ্চয় এ ব্যক্তি বিশেষ কিছু। আসলেই কোনো ব্যক্তি বিশেষ কিছু? যার নাম কুরআনে নেই, যার নাম হাদীসে নেই! তিনি আদৌ জান্নাতি না জাহান্নামি, সেটা বলতে পারব না।

আবু হানীফা (রাহ.) নিজের বইয়ে লেখেছেন, যার নাম কুরআনে নেই, যার নাম হাদীসে নেই, ওই ব্যক্তির নাম ধরে তাকে জান্নাতিও বলা যাবে না। ওলি বা বুযুর্গ বলা তো দূরের কথা! ধারণা করা যাবে, আশা করা যাবে যে, লোকটা ভালো। এজন্য কবরকে মাযার বলাটাই অবৈধ। কারণ এটাকে কি আমরা ইবাদত বা দীন মনে করি? আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবি, তাবিয়ি, তাবি-তাবিয়িরা যেটাকে দীন মনে করেন নি, এটাকে আমরা দীন মনে করছি। কবর বললে বেয়াদবি মনে করছি। তার মানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবিরা (রা.) বেয়াদব ছিলেন! নাউযুবিল্লাহ। আবু হানীফা বেয়াদব ছিলেন? শাফিয়ি বেয়াদব ছিলেন? আহমাদ ইবন হাম্বল বেয়াদব ছিলেন? তারা কেউই জানে না?! আমরা বেশি আদর জানি?

দ্বিতীয় হল, কবর জিয়ারতের সময় সালাম দিতে হবে। কবর স্পর্শ করা, ইশারা করা এগুলো সবই অবৈধ। আর যদি এর ভেতর থেকে বরকত চাওয়া হয়, এটা শিরক হয়ে যাবে। কারণ আমরা আগেও পাঠকদের বলেছি কবরবাসীকে সালাম দেওয়াটা হল জিয়ারতের উদ্দেশ্য। কবরবাসীর কাছে কিছু পাওয়ার চিন্তা হলে সেটা শিরকে চলে যাবে। পাওয়ার জন্য তো আল্লাহ নিকটবর্তী।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

[আমার বান্দাগণ যখন আপনার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বস্তুত আমি নিকটেই, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় আমি সাড়া দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে।][৭]

---

৭. সূরা: [২] বাকারাহ, আয়াত: ১৮৬।

আল্লাহ আমার নিকটবর্তী। আমি চাইলে আল্লাহ শুনবেন, দেবেন। কোনো বান্দা যদি মনে করে, আল্লাহ কথার কথা বলেছেন যে, আল্লাহ কাছে আছেন, চাইলে দেবেন। আমি এই হুযুরের মাধ্যম ছাড়া চাইলে বোধহয় দেবেন না। আল্লাহ তাআলার এই মহান ওয়াদাকে অবমূল্যায়ন করার কারণে তার ঈমানটাই নষ্ট হয়ে গেল।

[বাস চলে। রাস্তার ওপাশে হয়ত কোনো কবর আছে। কোনো বাবার একটা মাযার আছে। বাস ড্রাইভার ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় একটু স্লো করে সালাম দিয়ে যায়। যেন, ওখান দিয়ে তাড়াতাড়ি গেলে বাসটা ধ্বংস হয়ে যায় কিনা! - উপস্থাপক]

বিষয়টা এমন হয়েছে... আমি একজন বুযুর্গকে জানতাম। নেককার মানুষ ছিলেন। উনি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বাস যেতে দেখলে হাত তুলতেন। লোকে নিত না। উনি মারা গেলেন। ওইদিনে কোনো বাস উনার বাড়ির পাশে না দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না। ক্যাসেট বাজাছে না। অর্থাৎ উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন খুব নিরীহ ছিলেন। মরার পরে সন্ত্রাসী হয়ে গেছেন। এখন যদি গান বাজানো হয় বা বাড়ি না যাওয়া হয় তাহলে বাসটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবেন। আমি দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এক বছর আগের কথা। ড্রাইভার ল্যান্ড ক্রুজার, ল্যান্ড রোভার গাড়ি, জিপগুলো নিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠে। পাশে ঢালু। পাহাড়ি রাস্তার পাশেপাশে কিছু মূর্তি থাকে। আমরা তো এমনিতেই ভয়ে আছি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ও আবার হাত খুলে নমস্কার করে যাচ্ছে। আমরা ভাবছি কখনো স্টিয়ারিং ব্রেক হয়ে পড়ে যায় কি না! ও নমস্কার করেই যাচ্ছে। আমি বাংলাদেশের এক ডাইভার ভাড়া নিলাম, ৯৮ সালের দিকে। ওরকম কোনো মাযার দেখলে সালাম না দিয়ে যাচ্ছে না। একই চেতনা। এই ব্যক্তির ভাবনা, যদি আমি সালাম না দিয়ে যাই, ও আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারে। আমার পীর এত খারাপ, এত সন্ত্রাসী যে, ঘুষ না দিলে বোধ হয় আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে! এটা একই ধরনের শিরকের ভিন্নরূপ। চেতনায় একই।

কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক আল্লাহ। কবরে যাওয়ার পরে মানুষের ক্ষমতা বেড়ে দেবত্ব পেয়েছে– এটা হল শিরকের বড় একটা কারণ।

[অনেকেই মনে করেন, ওলি-আউলিয়াদের জীবিত থাকতে যে ক্ষমতা থাকে, মরার পরে সেই ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে যায়। - উপস্থাপক]

এটা একেবারে... গ্রিক মিথলজি (পুরাণ) যদি পড়েন? গ্রিক মিথলজির মূল থিম কী? যে, হিরোরা মরার পরে গড হয়। দেবতা হয়। প্রাচীনকাল থেকে দেবতা বানায় কারা? বেঁচে থাকতে হিরো ছিল, অবশ্যই মরার পরে ঈশ্বর তাকে দেবত্ব দেবেন। অর্থাৎ পাওয়ার, কিছু পাওয়ার তাকে দিয়ে দেবেন। বিভিন্ন মিথলজিতে যত দেবতা আছে এভাবে হয়েছে।

জিজ্ঞাসা: ১০২

আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখি কবরে ফুল, আগরবাতি বা গোলাপজল ইত্যাদি দেয়। এগুলো দেওয়া বিদআত না কি শিরক?

জবাব:

এখন প্রথম কথা হল, এগুলোর ঘ্রাণ যদি মৃত ব্যক্তিকে শুকানো যায় তাহলে চিন্তা করা যেতে পারে এগুলো বিদআত কি না। আসলে ভাই বুঝি না, জীবন্ত একটা মানুষকে ফুল উপহার দিলে খুশবু পায়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির কবরে যদি এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দেওয়া হয়, মৃত ব্যক্তি ফায়দা পান কি না? এটা কি ধরনের বোকামি! আমরা মৃত ব্যক্তির কবরে ফুল দিচ্ছি, এসি দিচ্ছি, গরু দিচ্ছি, ছাগল দিচ্ছি। অথচ তিনি খেতে পারছেন না। সেখানকার অন্যান্য মানুষেরা এটা খাচ্ছে।

প্রথমত, ফুল কিন্তু পূজার সাথে সম্পর্কিত। আপনি জানেন কি না, হিন্দু ধর্মে কোনো পূজা ফুল ছাড়া হয় না! এজন্য দেবতাকে ফুল দেওয়া হয়। ফুলের মাধ্যমে পূজা করা, এটা হিন্দু ধর্মের একটা ধর্মীয় রীতি। অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামে কখনোই কোনো মৃত ব্যক্তিকে ফুল দেওয়া হয় নি। ইসলামে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা হয়। মাইয়েতের জন্য দুআ করা। তার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা। ফুল দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে বা মৃত ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত স্থানকে সম্মান করা হয়েছে, এটা ইসলামে নেই। এটাকে আমরা যদি শিরক নাও বলি, মুশরিকদের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কিছুই বলা যায় না। তারা যেহেতু পূজার জন্য ফুল দেন। তারা

দেবতাকে ফুল দেন অথবা স্মৃতিস্তম্ভকে ফুল দেন। আমরা মনে করি, এটা জেনে অথবা না জেনে অন্ধ অনুকরণ করছি।

আমাদের জন্য দায়িত্ব ছিল, মৃত ব্যক্তিকে জন্য দুআ করব। সুন্নাত পদ্ধতিতে কবর যিয়ারত করব। এটা ছিল আমাদের দায়িত্ব। এখানে খুব সহজ বিষয়– মৃতের কাছে যেতে হলে ধর্ম লাগে। কেউ যদি নাস্তিক হন। তাহলে তো... আমি অনেক সময় বন্ধুদের বলি, নাস্তিকের তো উচিত তার মৃত পিতামাতার গোশত ফ্রিজে রেখে খেয়ে ফেলা। কারণ লাশটা কবর দিলে পোকায় খেয়ে যাবে। যদি আমরা ধর্ম বাদ দিই তাহলে কোন যুক্তিতে আমরা এটাকে মাটিতে পুঁতে দেব? অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলব? এটা অপচয় তো হল। তাই না?

কাজেই নাস্তিকের জন্য কবরে ফুল দেওয়া, কবরে যাওয়া, এটা হয় প্রতারণা, আত্মপ্রবঞ্চনা অথবা লোক দেখানো প্রতারণা। বিশ্বাস করছেন না ওই ব্যক্তির ব্যাপারে। আর ওই ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, এটাও তো নাস্তিকতার কোনো নৈতিকতাতেই আসে না। নাস্তিকতার অর্থ হল আমরা পশু। পশু এক পর্যায়ে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ হয়েছে। পশুরা তো মৃতকে সম্মান করে না। তাহলে আমরা কেন করব? যেমন তারা বলেন, পশুরা বিবাহ করে না আমরা কেন করব? পশুরা যাকে পারে খুন করে খেয়ে নেয়। আমরাও খেয়ে নেব। পশুরা কিন্তু মৃত আপনজনের গোশত খেয়ে ফেলে। কারণ এটাকে ফেলে দিলে তো অপচয় হবে।

আর যদি কেউ আস্তিক হন। কোনো না কোনো ধর্মের মাধ্যমে তাকে মৃত ব্যক্তির কাছে যেতে হবে। তাহলে তো এমন হতে পারে না, আমি কোনো ধর্ম ছাড়া মৃত ব্যক্তির কাছে কোনো কল্যাণ পৌঁছে দেব। আমরা মুসলিম, আমরা ইসলাম ধর্ম যে পদ্ধতি বলেছে সে পদ্ধতিতে করব। যিনি হিন্দু তিনি হিন্দু ধর্মের মাধ্যমে। যিনি বৌদ্ধ তিনি বৌদ্ধ ধর্মের, যিনি খ্রিস্টান তিনি তার ধর্মের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে আত্ম-সম্মান বা আত্মার শান্তি কামনা করবেন। কিন্তু আমরা যেটা করছি, এটা কি আত্মপ্রবঞ্চনা না কি লোক দেখানো? আল্লাহ ভালো জানেন।

[আমাদের ইসলাম ধর্মের যে পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতি মেনেই তাদের জন্য কিছু করা উচিত। - উপস্থাপক]

আর এক্ষেত্রে মডেল তো মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবাগণ। সাহাবাগণ নবীজি (ﷺ) এর জন্য কী করেছিলেন? এটা তো যে কোনো বই পড়লে পাওয়া যায়। তাঁরা ফুল দেন নি। তাঁরা কোনো অনুষ্ঠান করেন নি। তাঁরা মৃত্যুদিন জন্মদিন পালন করেন নি। তাঁরা কবর যিয়ারত করেছেন, সালাম দিয়েছেন। যদি গোলাপজল ছিটানো অথবা আগরবাতি জ্বালানো আত্মার শান্তি হয়, শ্রদ্ধা জানানো হয়, তাহলে তো দুনিয়ার সব থেকে বেশি আগরবাতি সাহাবিরা দিতেন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কবরে। আমরাও দিতাম। সেটা তো তাঁরা দেন নি। আর এই জন্যে হয়ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির কবরে এটা দেবে সেটা দেবে।

এটাতো অপচয়! এই আতর গোলাপজলের টাকাটা গরীবকে দিলে, তারা খেলে এটাতে সাওয়াব হত। আমাদের দেশেই একটা বিরাট মাযার তেরি করা হয়েছে। সরকারি খরচে প্রায় পাঁচকাটি টাকা ব্যয়। আমার খুব কষ্ট লাগল। এই পাঁচকোটি টাকা ব্যয় করে যদি দরিদ্রদের জন্য বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হত আর নিয়ত করা হত এর সওয়াব মাইয়েত পাবেন। এটা কাজে লাগত। এই মাইয়েতের কবরের উপরে পাঁচকোটি টাকার সৌধ বানিয়েছে উত্তরবঙ্গের একটা জায়গায়। এই পাঁচকোটি টাকা জনগণের সম্পদের অপচয়। টাকার অপচয়। আর ওই ব্যক্তিও কিছু পেলেন। বরং ওই সৌধ দেখে মানুষ সেখানে শিরক করতে লাগল।

সেখানে তো বছরে একটা সময় আখড়া বসে। মদের আখড়া। এগুলোতে অসামাজিক কার্যকলাপে শতশত, হাজার হাজার সময়, ঘণ্টা নষ্ট হয়। বেকারত্ব, অনাচার এবং বিভিন্ন রকমের মাদকতার আখড়া হয়ে যায়।

সুদ/ঘুষ/বীমা

জিজ্ঞাসা: ১০৩

সুদ হারাম। তবে যদি কোনো বাবামা ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ নেবার চেষ্টা করে। এখন সন্তান যদি বাবামাকে বোঝানোর চেষ্টা করে এবং তারা যদি না মানে, তখন ওই ছেলের করণীয় কী?

জবাব:

বাবামা সুদভিত্তিক কোনো লেনদেন করছেন, সন্তান আপত্তি করবে। না করলে কিছু করার নেই। এটা বাবামার কাজ। যখন সন্তান বড় হবে তখন আর বাবামার খাবে না। সন্তান যখন ছোট, উপার্জনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত পিতামাতা তাকে ভরণ পোষণ করবে। এটা পিতামাতার উপর ফরয। আর উপার্জনে অক্ষম হলে সন্তান পিতামাতার ভরণপোষণ করবে, এটা সন্তানের দায়িত্ব। এজন্য এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু করার নেই। পিতামাতার ভালোমন্দ তাদের। সন্তান আদবের সাথে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবে। না হলে মেনে নিয়ে থাকবে। যখন নিজের পায়ে চলার মতো হবে তখন নিজের ভরণপোষণ নিজে চালাবে।

জিজ্ঞাসা: ১০৪

আমরা ১২ জন চাকুরিজীবি মিলে একটা সমিতি করি। ১২ জন প্রতি মাসে ১০০০ করে দিয়ে ১২০০০ টাকা হয়। মাস শেষে আমরা ১২ জনের নামে লটারি করি। একজনের নাম ওঠে। তিনি এই ১২ হাজার টাকা নেন। দ্বিতীয় মাসে আবার সবাই এভাবে ১০০০ টাকা করে দেয়। ১২০০০ টাকা জমলে আবার লটারি হয়। যার নাম পূর্বে ছিল তিনি আগামী ১২ মাস আর কোনো টাকা পাবেন না। এভাবে ১২ মাস পার হয়ে গেলে সবাই ১২

হাজার করে পেয়ে যান। যার যার ১২০০০ টাকা তার কাছে চলে কাছে চলে গেল। এই ধরনের সমিতি করে টাকা জমানো এবং পরে ১১ জন নিয়ে নেওয়া, সবাই সমান ভাগে নিল। এটা সুদ বা অবৈধ হবে কি না?

জবাব:

লটারির মাধ্যমে অনেকের টাকা একা নিয়ে যাওয়া হারাম। এটা জুয়া। কিন্তু আপনারা যে পদ্ধতি বলেছেন, এখানে যদি সুদ না থাকে, অর্থাৎ যে নেবে সে কিছু দেবে অথবা সদস্যদের পক্ষ থেকে টাকার বিনিময় কোনো রকম টাকা নেয়া হবে না, এসব না থেকে যেটুকু বলা হচ্ছে, যদি ওইটুকুই শুধু হয় এবং প্রত্যেকে জামা দেয়, একজনে নিয়ে যায়, এটার ভেতরে অবৈধতা কিছু নেই, যদি এর সাথে অবৈধ কিছু লেনদেন না থাকে। একজন পেয়ে গেল প্রথম মাসেই, কিন্তু একজন হয়ত গিয়ে ১২ নম্বর মাসে পেল, এটাতে সমস্যা নেই। এ ধরনের ক্ষেত্রে লটারি বৈধ। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) একজনকে যুদ্ধ নিয়ে যাবেন। দুইজনেরই সমান যোগ্যতা। তখন লটারি করতেন, যার নাম উঠত, তাকে নিয়ে যেতেন। অর্থাৎ সবাই যোগ্য কিন্তু একজন নেবে। যেমন, খেলার দুই গ্রুপের যে কোনো একদল প্রথমে শুরু করে, টস জেতার মাধ্যমে। এই ধরনের ক্ষুদ্র লটারিতে সমস্যা নেই। এটা ইসলামসম্মত।

জিজ্ঞাসা: ১০৫

একজন প্রশ্ন করেছেন সুদের টাকা দিয়ে মসজিদের অথবা মাদরাসার টয়লেট নির্মাণ করা বৈধ হবে কি না?

জবাব:

সুদ অবৈধ। এটা জনকল্যাণে ব্যয় করা যায়। মানুষের নিজের কল্যাণে না। একজন অসহায় মানুষের জন্য অথবা জনকল্যাণমূলক কোনো কাজের জন্য। মানুষ উপকৃত হয় এমন কাজে। তবে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নয়। গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে। এজন্য টয়লেট, বাথরুম এগুলো সবাই ব্যবহার করে। মানুষ উপকৃত হয়। এগুলো করা যেতে পারে সমস্যা নেই।

জিজ্ঞাসা: ১০৬

বিভিন্ন সরকারি অফিসে যখন আমরা কাজের জন্য যাই, যারা সার্ভিস দেয়ার জন্য বসে থাকে, সরকারি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ, এদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা কাজের বিনিময়ে অর্থ নেয়। না হলে তারা কাজ করতে চায় না। এটাকে আমরা ঘুষ বলতে পারি। এই ঘুষ দেয়ার কারণে আমরা দায়ি হব কি না? কারণ ঘুষ ছাড়া তারা এ কাজটা করতে চায় না।

জবাব:

ঘুষ হারাম। কেউ যদি আমার হক কাজের জন্য জোর করে ঘুষ আদায় করে, এটা মূলত ঘুষ না। এটা হল চাঁদাবাজি। বুকে ছুরি ধরে চাঁদা নিয়েছে। মাজবুর, বাধ্য। এতে আল্লার কাছে তাওবা করবে, সে তো বাধ্য হয়ে দিয়েছে, এখানে কিছু করার নেই। যৌতুক হারাম, দেওয়া হারাম, নেওয়া হারাম। এখন, জামাই জোর করে যত আদায় করেছে, যৌতুক না দিলে সে মেয়ে ছেড়ে দেবে– এক্ষেত্রে পুরো গুনাহই জামাইয়ের হবে, শ্বশুরের হবে না।

জিজ্ঞাসা: ১০৭

এনজিও এবং বীমা কোম্পানিগুলোর সাথে লেনদেন করা বৈধ হবে কি না?

জবাব:

আসলে লেনদেনটা কীভাবে করব। সাধারণভাবে এনজিও এবং বীমা কোম্পানি সুদভিত্তিক এবং তাদের লেনদেনটা মূলত সুদের। কাজেই তাদের সাথে লেনদেন মানেই সুদের লেনদেন। এটা বৈধ নয়। কিন্তু এর বাইরে সুদবিহীন স্বাভাবিক কোনো লেনদেন যদি হয়, যেমন একজন জমি বিক্রয় করবে, বিল্ডিং বিক্রয় করবে, তারা কিনবে। এটা হয়ত বৈধ হতে পারে। যদি বীমা কোম্পানি জমি কিনতে চায়, বিল্ডিং করতে চায়, আমি তাদের কাছে বিক্রয় করি। এটা অবৈধ হবার কথা না।

তারিখ/ইতিহাস

<u>জিজ্ঞাসা: ১০৮</u>

আমি জানতে চাই, বনি ইসরাঈলের ইতিহাস এবং মূসা নবীর পরে কোন কোন নবী এসেছিলেন?

জবাব:

প্রশ্নটা দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রাখে। বনী ইসরাঈল শব্দের অর্থ হল ইসরাইলের সন্তানগণ। ইসরাইল হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পৌত্র। ইবরাহীমের দুই ছেলে। বড় ছেলে ইসমাইল (আ.) ছোট ছেলে ইসহাক (আ.)। ইসহাকের দুই ছেলে, বড় ছেলে এষৈ, ছোট ছেলে ইয়াকুব (আ.)। তাহলে ইয়াকুব হচ্ছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পৌত্র। ইয়াকুবের একটা নাম হল ইসরাঈল। এই ইসরাঈলের সন্তানদেরকে বলা হয় বনি ইসরাঈল। আমাদের মুসলিমদের পরিভাষায়, ইসরাঈল আলাইহিস সালামের ছেলেদের ভেতরে আমরা যাকে চিনি তিনি ইউসুফ আলাইহিস সালাম। ইউসুফ আলাইহিস সালামের আরো ১১ জন ভাই ছিল। তারা মোট ১২ ভাই। এই বারো ভাইয়ের বারো বংশের মানুষদেরকে বলা হত বনি ইসরাইল।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে, এদের একটা পর্যায়ে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময় বনী ইসরাঈলের লোকেরা মিশরে চলে যায়। যেটা মুসলিমদের অনেকেরই জানা আছে। মিশরে যাবার পরে প্রায় দুইশত বছর তারা মিশরে থাকে। মিশরে থেকে সেখানে তারা তিন প্রজন্ম চার প্রজন্ম থাকে। মিশরের ফেরাউন তাদের উপর অত্যাচার করত। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রায় ৪০০ বছর পরে মূসা আলাইহিস

সালামের জন্য। তিনি ইসরাঈলকে, অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধরকে নিয়ে আসলেন মিশর থেকে বের করে সিনাই এলাকায়।

মূসা আলাইহিস সালামের পরে কুরআনে তেমন বেশি নবীর কথা বলা হয় নি। অল্প কিছু নবীর কথা বলা হয়েছে। তাদের ভেতরে রয়েছেন আল-ইয়াসা, ইলিয়াস, দাউদ, সুলাইমান– এদের নাম কুরআনে আছে। এছাড়া বনি ইসরাঈলের ইতিহাসে আরো নবীর নাম এসেছে। বনি ইসরাঈলের মধ্যে শেষ নবী হলেন ঈসা আলাইহিস সালাম। বনি ইসরাঈলের মধ্যে সর্বশেষ আসেন ঈসা আলাইহিস সালাম। যিনি যিশুখ্রিস্ট, যার ধর্ম খ্রিস্টধর্ম বলে প্রচলিত। মূলত তিনি খ্রিস্টধর্ম বলে আলাদা কোনো ধর্ম দেন নি। তিনি বলেছেন যে, আমি মূসা নবীর শরীআতকে জিন্দা করতে এসেছি। পরবর্তীতে কিছু ভক্ত এটাকে পৃথক একটা ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

জিজ্ঞাসা: ১০৯

মক্কার অধিকাংশ লোক ইসলামে আসার পর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান হয়েছিল, নাকি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরও কাফিরদের সংখ্যা বেশি ছিল?

জবাব:

বিষয়টাতে ভুল বোঝাবুঝি আছে। এটা মক্কা না মদীনা। ইসলামি রাষ্ট্র মক্কায় হয়েছে নাকি মদীনায় হয়েছে? মদীনার অধিকাংশ মানুষ মুসলিম হবার পরে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় গিয়েছেন এবং সেখানে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব নিয়েছেন। ইসলামি রাষ্ট্র মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাসূল (ﷺ) দায়িত্ব যখন নিয়েছেন তখন মদীনার অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাসূল (ﷺ) কে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব দিয়েছেন। অমুসলিম ছিলেন অল্প পরিমাণ। মদীনার মূল আরবদের ভেতরে অমুসলিম তেমন কেউ ছিলেন না। ইয়াহুদি ছিলেন। মদীনায় বসবাসকারী ইয়াহুদি ছিলেন। অল্প একটা শ্রেণি মুনাফিক ছিল। অর্থাৎ সবাইকে মুসলিম হতে দেখে তারাও নিজেদেরকে মুসলিম বলেছে। ভেতরে ভেতরে কাফির ছিল। কিন্তু এরা সমাজে মুসলিম। এজন্য মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক মুসলিম হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাসূল (ﷺ) কে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করে। সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মক্কা বিজয় হয়েছে একটা প্রেক্ষাপটে। মক্কায় রাসূল (ﷺ) এর সন্ধিচুক্তি ছিল। তারা সন্ধি ভঙ্গ করে। ভঙ্গের পরে রাসূল (ﷺ) তাদেরকে আক্রমণ করেন। রাসূল (ﷺ) এর সাথে সন্ধি করা মানুষদেরকে তারা আক্রমণ করে সেখানে হত্যা করেছিল। সেখানে রাসূল (ﷺ) একজনকেও হত্যা করেন নি। প্রতিশোধ নেন নি। তাদেরকে এমনভাবে আক্রমণ করেন যেন তারা সারেন্ডার করে। করলে তিনি বলেন তোমরা মাফ। তোমরা মুক্ত। তখন অধিকাংশ মানুষ মুসলিম হয়ে যায়। তখন অনেকে অমুসলিম ছিল। রাসূল (ﷺ) কাউকে বাধ্য করেন নি।

জিজ্ঞাসা: ১১০

একজন আলিম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মারিয়া কিবতিয়া (রা.) কে বিয়ে করেন নি। তিনি শুধু তাঁর দাসী ছিলেন।

জবাব:

মানুষকে ক্রয়-বিক্রয় করার প্রথা ইসলামের আগে থেকেই ছিল। ইসলাম এটাকে গ্র্যাজুয়ালি কমানোর জন্য কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। অনেকটা মদের মতো। একবারে হারাম করা হয় নি। হারাম করলে অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যেত। কারণ তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্য এই দাসপ্রথা নির্ভর ছিল। কুরআনে ব্যবস্থা দিয়েছে সেখানে। একটা হল, কেউ যদি ক্রীতদাসীকে স্বাধীন করে বিবাহ করে তাহলে সে ডাবল সাওয়াব পাবে। আর যদি দাসী অবস্থায় তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে নতুন বিবাহ লাগে না। কারণ তার সাথে তো একটা এগ্রিমেন্ট আছে। বিবাহ যেমন একটা সোশ্যাল এগ্রিমেন্ট। তেমন ক্রয়-বিক্রয় একটা এগ্রিমেন্ট। সে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার ফলে, যদি তার পেটে সন্তান হয় তাহলে সে দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে। এটাও দাস মুক্তির একটা পথ। এজন্যই যে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ক্রীতদাসীকে আজাদ করে বিবাহ করলে ডাবল সাওয়াব।[১] স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে বিবাহ করলে আলাদা বিবাহ প্রয়োজন হয় না।

---

১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৯৫৩২; সহীহ বুখারি, হাদীস-৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৫৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২০৫৩।

জিজ্ঞাসা: ১১১

দাড়িবিহীন ব্যক্তির প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকাতেন না- এই বিষয়ে কোনো দলীল আছে কি না?

জবাব:

এই বিষয়ে একটা হাদীস ইমাম তাবারি তার তারীখ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সনদসহ। আমরা জানি, প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ তাদের বর্ণনাগুলো সনদসহ বর্ণনা করতেন। এখানে ইমাম তাবারির সনদ ইতিহাসের সনদ অনুযায়ী মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। অধিকাংশ রাবি সহীহ। কেউ একটু হাসান বা সাধারণ পর্যায়ের। মোটামুটি ঐতিহাসিক সনদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে পারস্যের বাদশাহ দূত পাঠান। রাসূল (ﷺ) তাদের সঙ্গে দেখা করতে প্রথমে অস্বীকার করেন। পরে দেখা করেন। যখন তারা তাঁর কাছে প্রবেশ করে তাদের মুখে দাড়ি ছিল না। তিনি খুব ঘৃণা ভরে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি বলেন তোমরা কেন দাড়ি রাখ নি? কেন দাড়ি চেঁছে ফেলেছ? তারা বলে, আমাদের রব আমাদের দাড়ি চাঁছতে বলেছেন। তখন রাসূল (ﷺ) বলেন আমার রব আমাকে দাড়ি রাখতে বলেছেন। এই ঘটনা থেকে দেখা যায়, রাসূল (ﷺ) দাড়ি চাঁছা লোকদের দিকে তাকাতে খুব বিরক্ত বোধ করতেন।

জিজ্ঞাসা: ১১২

একজন গুগলে নবীজি (ﷺ) এর নামে সার্চ দিয়ে কিছু ছবি পেয়েছেন এবং একটা আর্টিকেলে তিনি এটাও পেয়েছেন, এই ছবি নাকি মিশরীয় বা কোনো এরাবিয়ান লোক অথেনটিকভাবে পেয়েছেন বা এঁকেছেন। আসলে নবীজি (ﷺ) এর কোনো অথেনটিক (আসল) ছবি পৃথিবীতে আছে কি না?

জবাব:

জি, না!

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ছবি আঁকবেন তো তাঁর আশেপাশের মানুষেরা। রাসূল

(ﷺ) ছবি হারাম করেছেন। তাদেরকে অভিশপ্ত বলেছেন। সাহাবিরা সব ছবি ছিড়ে ফেলেছেন। রাসূল (ﷺ) নিজে আলী (রা.) কে বলছেন, তুমি যাও, যত ছবি দেখবে ছিড়ে ফেলবে। যত মূর্তি দেখবে ভেঙ্গে ফেলবে। যত কবর দেখবে সমান করে দিবে। কাজেই তাঁর আশেপাশের কোনো মানুষ তাঁর ছবি এঁকেছেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তিহীন। বরং ছবি আঁকতে দেখলে ভেঙেছেন। বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের ছবি পূজার মূল বিষয় হয়ে যায়। এজন্য, রাসূল (ﷺ) এর আশেপাশে অমুসলিম কেউ ছবি আঁকতে আসেন নি। রাসূল (ﷺ) এর পাশে অমুসলিম কেউ ছিলেন না। আর পরবর্তী যুগের মিশরের লোক রাসূল (ﷺ) কে দেখেই নি। কুফার মানুষেরাও দেখে নি। শুধু মক্কা-মদীনার মানুষেরা দেখেছে। এবং তাদের মধ্যে ছবি আঁকার কোনো প্রচলন ছিল না। নবীজি (ﷺ) কাউকে অনুমতিও দেন নি। নিষেধ করেছেন ভয়ঙ্করভাবে। কাজেই এই কথাগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট। এটা বিভিন্নভাবে বানোয়াট। পরবর্তী এক দুই প্রজন্মের কেউ শুনে শুনে আঁকিয়েছে, এটা দুই তিন প্রজন্ম পর বর্ণনা শুনে। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা এবং বানোয়াট ছবি।

সমকালীন প্রসঙ্গ

জিজ্ঞাসাঃ ১১৩

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এবং এখানে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে কথা রয়েছে। এতদসত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তিতে কেন পিছিয়ে আছে? বিধর্মীরা উন্নতির চরম শিখরে রয়েছে। তারা তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে মুসলিমদেরকে নির্যাতন করছে। মুসলিমদের এই অধঃপতনের কারণ সম্পর্কে জানতে চাই।

জবাবঃ

মুসলিমরা পিছিয়ে আছে ব্যাপারটা এ রকম নয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করছেন না। এজন্য অনেক মুসলিম, যারা তথ্য-প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান এগিয়েছেন, তারা অনেক সময় বিদেশে চলে গিয়েছেন। এবং সেখানে তারা ভালো সেবা দিচ্ছেন। কিন্তু তাদের সেবাটা মুসলিম সমাজ পাচ্ছে না। কারণ তারা সেখানে মূল্যায়ন পেয়েছেন। এখানে মূল্যায়ন পান নি।

ইসলাম জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিয়েছে। মুসলিমরা যতদিন কুরআন-সুন্নাহ ধরেছিল, ইসলামি আমল আখলাক ছিল, ততদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানেও ভালো ছিল । যখন কুরআন-সুন্নাহর চর্চা কমে গেছে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানেও কমে গেছে। এটা ঠিক ইউরোপের উল্টো। যতদিন ইউরোপকে চার্চ কন্ট্রোল করেছে ততদিন কোনো বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নি। কোনো বিজ্ঞানী গবেষণা করলেই তাকে মেরে ফেলা হত। পুড়িয়ে ফেলা হত। ইনকুইজিশন করা হত। রেনেসাঁর পরে যখন ধর্মকে ছাটাই করে দেয়া হল, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে তখন সেক্যুলারিজমের জন্ম হল। এরপর থেকে ওইসব দেশগুলোতে বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তি বাড়তে থাকল। আর মুসলিমদের ঠিক উল্টো।

মুসলিমদের মধ্যে যতদিন কুরআন-সুন্নাহ, ইসলামি সমাজ ছিল ততদিন জ্ঞান-গবেষণাও ভালো ছিল। বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য মেডিসিন ফিজিক্স জিওগ্রাফি নিয়ে মুসলিমরা বেশি লেখেছেন, যখন সমাজগুলো ইসলামি চিন্তা-চেতনায় বেশি প্রভাবিত ছিল। এখন যুগের আবর্তনে আমরা পিছিয়ে গেছি। এটা থেকে উত্তরণের উপায় আমাদের একার হাতে না। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করার চেষ্টা করব। যারা ইসলামি জ্ঞানে জ্ঞানী তারা উৎসাহ দেবেন। তবে সামগ্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে এটা সম্ভব না।

দ্বিতীয়ত, আর একটা বিষয় আছে। আমি সৌদি আরব থাকাকালীন কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এন্ড টেকনোলজি থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলেন। আমাদের এখানে সেমিনার হবে। তাদেরকে প্রশ্ন করা হল, আপনারা এত টাকা দিয়ে প্রযুক্তি না কিনে নিজেরা গবেষণা করে প্রযুক্তি বানান না কেন। তখন উনি বললেন গবেষণার ক্ষেত্রে একটা রেড লাইন আছে। পাশ্চাত্যের যারা তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের দেওয়া রেড লাইনের উপরে আমরা উঠতে পারি না। আরব বা মুসলিম দেশগুলোতে যে গবেষণা হয়, প্রতিটা তথ্য তাদের কাছে আছে। আমরা যখন গবেষণায় ওই রেড লাইনের উপরে চলে যাব তখন তারা যে কোনো মূল্যে তা বন্ধ করে দেবে। আমাদেরকে এগোতে দেবে না। একান্ত গোপনে কেউ যদি কিছু করে সেটা ভিন্ন কথা। এজন্য সরকারগুলো খুব বেশি দূরে যেতে পারে না। ইউরোপ ও পাশ্চাত্য শক্তির চাপ থাকে। তারা চায় যে টেকনোলজি তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তারা বিক্রি করবে আমরা কিনব। আমাদের খাদ্যের টেকনোলজি এখন তাদের কাছে চলে যাচ্ছে। তারা বায়োফুড আবিষ্কার করবে। তাদের কাছ থেকে কিনে আমাদের খেতে হবে। এটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ। এর ভেতর দিয়েও মুসলিমরা এগোচ্ছে।

যে সমস্ত দেশে মুসলিমদের রাজনৈতিক স্ট্যাবিলিটি (স্থিতিশীলতা) আছে। যেমন মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কিছুটা হলেও ইরান, এই সকল দেশে মুসলিমরা বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তিতে অন্যান্য দেশের থেকে ভালো এগিয়েছে। দেশে যদি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ না থাকে নিরাপত্তা না থাকে, জনগণ এগোতে পারে না। আসলে কোনো দেশের উন্নতি সরকার করে না। সরকার শুধু নিরাপত্তা ও ইনসাফ দেবে। যার যতটুকু যোগ্যতা আছে এগোতে দেবে। তখন মানুষ দ্রুত এগোতে থাকে। মানুষ দৌড়ায়, শুধু মানুষের পথের ইটগুলো সরিয়ে দিতে হয়।

তুরস্ক খুব ভালো এগোচ্ছে। তুরস্ক যখন ফুল সেক্যুলার ছিল তখন তুরস্ককে সিক ম্যান অফ ইউরোপ বলা হত। ইউরোপের রুগ্ন মানুষ। সেই উনিশশো সালের শুরু থেকে এটা বলা হত। তখন কামাল আতাতুর্ক বললেন, আমাদের সকল সমস্যার মূল হল ধর্ম। ধর্ম ধরো আর কাটো। টুপি দেখলে কাটো, দাড়ি দেখলে কাটো, রোযা দেখলে কাটো, নামায দেখলে কাটো, কুরআন দেখলে কাটো। কেটে কেটে ধর্ম সব শেষ করে দিল। উনি সম্পূর্ণ ধর্মমুক্ত সেক্যুলার হওয়ার চেষ্টা করলেন। এরপর তুরস্ক ১০০ বছর সেক্যুলার থাকল, কিন্তু কোনো উন্নতি হল না। তুরস্ক দাড়ি চেঁছে ফেলল, বোরকা খুলে ফেলল। জার্মানির সংবিধান নিল, ইটালির সংবিধান নিল। পোশাকে-আশাকে পুরো ইউরোপীয় হয়ে গেল। কিন্তু অর্থনীতিতে ইউরোপের সিক ম্যানই থেকে গেল। যখন তুরস্কের ইসলামপন্থী সেক্যুলাররা আসল। ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রমোট (সর্মথন) করল। মানুষের ভেতর একটা নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে দিল। তারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং অর্থনীতিতে ভালো করেছে। আর তাদের স্ট্যাবিলিটি আছে। স্ট্যাবিলিটি যখন থাকবে না, তখন আর এই উন্নতিটা হবে না।

আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান এনেছে আমল করেছে, তাদেরকে দুনিয়াতে স্থলাভিষিক্ত করবেন। যেমন আগের লোকেদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। দ্বীনকে তাদের পালন করতে সক্ষমতা দেবেন। তাদের ভিত্তিটাকে নিরাপত্তায় পরিণত করে দেবেন, তারা আমার ইবাদত করবে। শিরক করবে না।[১] এখানে আমরা অনেক দিকে ভুল করি। আল্লাহ তাআলা এই যে ওয়াদা করেছিলেন, সেটা কি ৩০ বছরের জন্য? নাকি ৩০০ বা ৩০০০ বছরের জন্য? কিয়ামত পর্যন্ত। যারা বলেন ইসলাম নেই, ইসলামি রাষ্ট্র নেই, ইসলামি সমাজ নেই, ইসলাম উঠে গেছে, ইসলাম ৩০ বছর ছিল, ৬০ বছর ছিল...। তারা প্রকারান্তরে বলতে চান, রাসূল (ﷺ) নাউযু বিল্লাহ, ব্যর্থ নবী ছিলেন। তাঁর এত কষ্টের দেওয়া দ্বীন ৩০, ৫০, ১০০ বছরেই শেষ হয়ে গেছে। একথা তো ঠিক না যে, এখন মুসলিমরা আছে, কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা নষ্ট হয়ে গেছে।

আল্লাহ এখানে কী কী বলেছেন, এটা বুঝতে হবে। আল্লাহ পৃথিবীতে আমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমাদের দীন পালনের সক্ষমতা দেবেন। তোমাদের ভয়টাকে নিরাপত্তা করে দেবেন। তোমরা আমার ইবাদত করবে, শিরক করবে না। এটা এখনো আছে। সারাবিশ্বের

---

১. সূরা: ২৪] নূর, আয়াত: ৫৫।

মুসলিমরা ইবাদত করতে দারুল হারবে যে বাধা পেত, মুসলিমদেরকে ইবাদত করতে দেয়া হত না, শিরক করতে বাধ্য করা হত, দীন পালন করতে গেলে ভয় লাগত, আযান দিতে পারত না– এই ভয় আমাদের আর নেই। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে অনেক জায়গা করে দিয়েছেন। মুসলিমরা নিরাপদে ইবাদত করতে পারছেন। পাশাপাশি এই 'তামকীন' [প্রতিষ্ঠা] এর পূর্ণতা, মিনিমাম তামকীন কন্টিনিউ করছে, ম্যাক্সিমামের জন্য আমাদের আমল হবে। এটা তো আল্লাহ কুরআনের অন্য জায়গায় বলেছেন। আল্লাহ ইসলামকে তো আরব বা বাঙালিদের জন্য দেন নি। বিশ্বের মানুষের জন্য দিয়েছেন। যখন একটা জাতি দীনের সাথে অবিশ্বস্ততার পরিচয় দেবে, সে দাবি করবে মুসলিম, কিন্তু তার ভেতর দীন থাকবে না, আল্লাহর নিআমত পাবার যোগ্যতা হারাবে। ইসলাম হারবে না। কিন্তু এই ইসলাম অন্য জাতির কাছে চলে যাবে। প্রথমে আল্লাহ দীন দিলেন আরবদের হাতে। এরপর আরবদের মধ্যে দীনি আখলাক কমে গেল। এরপর ইরান বা পারস্যের লোকেরা তামকীন পেল। এরপর এরা খারাপ হয়ে গেল। এরপর আল্লাহ তুর্কিদের হাতে ক্ষমতা দিয়েদিলেন। বাকিরা আছে কমবেশি। তুর্কিরা এক সময় অবহেলা করে হারিয়ে ফেলল। এরপর ভারতীয় মুসলিমদের কাছে অনেক রকম তামকীন আল্লাহ দিলেন। এরপর ভারতও হারিয়ে ফেলল।

তো ৫০ বছর পর আমেরিকা-ইউরোপে যাবে। ইউরোপ-আমেরিকায় দুইটা বিষয় আছে। তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার কারণে ইউরোপে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে গেছে। বিয়ে-শাদি কমে গেছে, জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। এটাতো বাংলাদেশের জন্য আনন্দের ব্যাপার, নাকি! কিন্তু ওদের জন্য মহাসংবাদ। সুনামির চেয়েও দুঃসংবাদ। যদি জন্মসংখ্যা কমে যায়, শিল্প-কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য কে চালাবে? প্রতিবছর কয়েক লক্ষ মানুষ রিটায়ার করছে আবার। শিল্প ইন্ড্রাস্ট্রি, বিজ্ঞান, শিক্ষা...। ওখানে তো আবার কয়েক লাখ লোক যেতে হবে। কিন্তু নেই। এজন্য শূন্যতা পূরণ করার জন্য কাউকে না কাউকে তো যেতে হচ্ছে। এই মানুষ যাওয়ার ভেতরে মুসলিমরা একটা বড় অংশ। সেই দেশে যাওয়ার পরে অন্যান্য অনেক ধর্মের মানুষেরা ওদের সাথে মিশে যায়। আসলে তার মধ্যে ঢুকে যায়। মুসলিমদের একটা অংশ ঢুকে। বাকি অংশ টিকে থাকে। মুসলিমদের জনসংখ্যা বাড়ে। ইউরোপ-আমেরিকায় যারা মুসলিম হয়, তারাও পরিবারমুখি হয়ে যায়। অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকে। তাদের সংখ্যা বাড়ে। এবং এটা কিন্তু কম না।

যদিও বিভিন্ন ঘটনায় ইসলামের বিরুদ্ধে কলঙ্ক আসছে। ইসলামবিরোধী মনোভাব আসে। তবুও সেসব দেশে ইসলামের প্রচার হচ্ছে। পাশ্চাত্যের ধর্ম ছিল খ্রিস্টধর্ম। কিন্তু বর্তমানে আর খ্রিস্টধর্ম সেখানে নেই। যদিও নামে ভ্যাটিকান আছে। মানুষ ধর্মে খ্রিস্টান আছে। শিক্ষিত মানুষ খ্রিস্টধর্ম মোটেও পছন্দ করে না। নাস্তিক নয়, কিন্তু ধর্মবিরোধী। বাইবেলের ভেতরে এমন অনেক নোংরা জিনিস আছে, যে কোনো শিক্ষিত বা বোদ্ধা মানুষ পড়লে আর এই ধর্মের কাছে যেতে পারে না। আমাদের দেশে নাস্তিকরা যা বলে, তা তো কুরআন পড়ে বলে না। তারা পাশ্চাত্যের নাস্তিকদের কথাগুলো নকল করে শুধু। এটা যে কুরআনে নেই, ইসলাম এর চেয়েও ভিন্ন জিনিস, তারা তা জানে না। যেখানে ইসলাম মুসলিমদের অবহেলার কারণে দুর্বল হয়ে গেছে হয়ত। আগামী ৫০ বছর পর ইউরোপ-আমেরিকায় শক্তিশালী হয়ে যাবে। আল্লাহর তামকীন অব্যাহত থাকবে। মুসলিমদের মধ্যে যারা অন্যায় করে তারা শাস্তি পাবে।

জিজ্ঞাসা: ১১৪

বর্তমানে মোবাইল এবং ইন্টারনেটে যে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি, এই অশ্লীলতা থেকে আমরা কীভাবে বাঁচতে পারি? গুনাহমুক্ত জীবনযাপন করতে পারি?

জবাব:

স্বভাবতই যুবকদের ভেতরে ঈমান আছে। বরং বৃদ্ধদের চেয়ে অনেক বেশি আছে। যদিও আমরা বৃদ্ধরা জেনারেশন গ্যাপের জন্য যুবকদের ছোটখাট অন্যায়কে দেখে 'ছেলেপেলে সব নষ্ট হয়ে গেছে' বলি। কিন্তু আমাদের সময়ে আমরা খারাপের মধ্যে যে পরিমাণ খারাপ ছিলাম সেই তুলনায় যুবকরা অনেক ভালো আছে। কিন্তু তারা ভালো থাকতে পারছে না। থাকতে চায় কিন্তু পারে না। কীভাবে থাকবে? এটা হল প্রশ্ন। বিশেষ করে ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট মিডিয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে যে বহু রকমের অশ্লীলতা এবং অশালীনতা, সহ্য করা যুবকদের জন্য কষ্টকর। পাপের পথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রথম বিষয় হল, যুবকদের জন্য আল্লাহ তাআলা দীনকে সহজ করেছেন। মানুষ তো পাপ করতে পারে। তাওবা তার জন্য খোলা। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যারা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান পাবে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণি হল:

وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ

যে যুবকেরা আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে।[২] এজন্য বৃদ্ধদের ইবাদতের চেয়ে যুবকদের ইবাদতের মূল্য বেশি। তারপরেও যুবকদের সচেতন থাকতে হবে। যুবকদের শক্তিও বেশি। রাসূল (ﷺ) এর সাহাবি হয়েছিলেন সবাই যুবক। রাসূল (ﷺ) ৪০ বছর বয়সে নবুয়াত পেলেন। তাঁর চেয়ে বেশি বয়সের কেউ ঈমান এনেছিল, এমন কাউকে আমরা দেখি নি। সবাই তাঁর চেয়ে কম বয়সের। অধিকাংশই ১২/১৪/১৫/২০ এর ভেতরে। অর্থাৎ তরুণ সমাজ যত সহজে সত্যকে গ্রহণ করতে পারে, স্বার্থচিন্তা না করে সত্যচিন্তা করতে পারে, সেটা বৃদ্ধরা পারে না।

এখন প্রশ্ন হল তারা কীভাবে ভালো থাকবে। ভালো থাকার জন্য কয়েকটা বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমত আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা পার্সোনাল করতে হবে। সালাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সালাতটাকে যদি যুবকরা বুঝে পড়তে পারে; সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে যদি ভালোভাবে দুআ করতে পারে। আল্লাহর সাথে কথা বলার অনুভূতিতে যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারে। তাহলে তাদের ভেতরে শক্তি আসবে। পাপ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জন হবে।

দ্বিতীয় হল, সোহবত বা সাহচর্য। ভালো মানুষদের কাছে যেতে হবে, যাদের কথায় ঈমান উজ্জীবিত হয়। এটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তৃতীয় হল, পাপ করে ফেললে বসিয়ে না রাখা। আমি তো পাপ করতেই থাকব, সুতরাং তাওবা করলে আর কোনো লাভ নেই– এই চিন্তা না করে প্রত্যেকটা পাপের পরেই দ্রুত তাওবা করা যে, হে আল্লাহ অন্যায় করেছি, আর করব না। মনে নিয়ত করতে হবে, আর করব না। আর করব না বলে রাখতে পারব না, কাজেই এখন আর তাওবা করে লাভ নেই। অতদূর চিন্তা করার দরকার নেই। আমি পাপ করেছি তাওবা করব। এবং এই নিয়তটা দৃঢ় করতে হবে।

এরপরে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক গভীর করার জন্য সহজ নফল, কিন্তু উপকারী হল বেশিবেশি আল্লাহর যিকির করা। এটা কিন্তু যুবকদের জন্য কঠিন কিছু না। চলতে-ফিরতে আল্লাহর তাসবীহ-তাহলীল করা, দরুদ শরীফ পড়া। আল্লাহর সাথে কথা বলা, দুআ করা। এটা যদিও

---

২. সহীহ বুখারি, হাদীস-১৪২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৩১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৩৯১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫৩৮০।

নফল ইবাদত, কিন্তু এটা মনের ভেতরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, পাপ বর্জনের শক্তি এনে দেয়। আর সবচেয়ে বড় হল, পড়া। কুরআন পড়তে হবে। পড়া কিন্তু একজনের বড় সোহবত। একজন আলিমের কাছে বসে তুমি আলিমের সোহবত পেলে। আর কুরআনের সাথে বসে তুমি স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সোহবত পেলে, যদি কুরআন বুঝতে চেষ্টা কর। হাদীস বুঝতে পারা মানে, রাসূল (ﷺ) এর সোহবতে থাকা। এগুলো বাড়াতে হবে। এগুলো করলে আল্লাহ দিলে আল্লাহর পথে আসতে থাকবে। কিছু পাপ হবে, ভুলভ্রান্তি হবে, সঙ্গেসঙ্গে তাওবা করবে। এভাবে যুবকেরা এগোতে থাকবে।

জিজ্ঞাসা: ১১৫

বর্তমান যামানায় আমরা যারা যুবক-যুবতি আছি, তাদের যে নৈতিক অবক্ষয়, সেগুলো থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের কী করনীয় এবং বর্জনীয় আছে? সে ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক নির্দেশনা দিলে আমরা উপকৃত হব।

জবাব:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কথা আছে, পশু পশু হয়ে জন্মলাভ করে। মানুষ কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মে না। মানুষ বানানো কঠিন। মানুষকে মানুষ বানানো অনেক কষ্টকর কাজ। মানুষকে মানুষ বানানোর ক্ষেত্রে পিতামাতা পরিবেশের দায় অপরিসীম। একটা গরুর বাচ্চা জন্মের পরেই জানে, দুধ খেতে হয় এবং তা সে বোঝে। তাকে শেখাতে হয় না। সে নিজেই দুধ খেতে পারে। সে মায়ের দুধের কাছে মুখ নিয়ে দুধ খায়। একটা হাঁসের বাচ্চা ডিম থেকে বেরোনোর পরে মায়ের পিছেপিছে পানিতে চলে যায়। সাঁতার শেখাতে হয় না। কিন্তু একটা মানুষের বাচ্চা কিছুই করতে পারে না। নিবিড় পরিচর্যা ছাড়া সে একদিনও বাঁচে না। সে কান্নাকাটি করে ভাত খেতে চায়। কোথায় গিয়ে খেতে হবে, তা জানে না।

وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا.

তোমরা মায়ের পেটে থাকতে কিছুই জানতে না।[৩] এই যে, আমাদের মধ্যে ভালোমন্দ মূল্যবোধ, সৎ-অসৎ জ্ঞান, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ঢোকাবে। এই যে, হাঁসের বাচ্চা, গরুর বাছুর এদের আল্লাহ একটা বিষয়

৩. সূরা: [১৬] নাহল, আয়াত: ৭৮।

দিয়েছেন, এরা আল্লাহর দীন বা শরীআত সবসময় মেনে চলে। এরা আল্লাহর আইনের বাইরে কখনো যায় না। এজন্য ওদের আর কিছু শেখা লাগে না।

মানুষকে আল্লাহ শক্তি দিয়েছেন, ইচ্ছামতো সবকিছু করতে পারে। এ ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এটার জ্ঞান গভীরভাবে না হলে সে খারাপ করবেই। এখানে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতি ভালো রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দায়ভার হল পিতামাতার এবং সমাজের। তাদের কানে, তাদের মনে, তাদের চেতনায়, তাদের মননে ভালো কথাগুলো ঢুকানো। পিতামাতাকেই এ ব্যাপারে সবচেয়ে সচেতন হতে হবে। সবচেয়ে দুঃখজনক যেটা, পিতামাতা সাতআট বছরের পর ছেলেমেয়েদেরকে ছেড়ে দেয়। বন্ধুবান্ধবের সাথে কোথায় যায়, কী করে, কিছুই দেখে না। অথচ আমাদের দায়িত্বই শুরু হয় ৭ থেকে ২১ পর্যন্ত। পিতামাতা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখবে সন্তানদেরকে।

দ্বিতীয়ত, সন্তানদের দায়িত্ব। বাঁচার উপায় হল, ভেতরে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা। তোমরা জানো যে, বার্ড ফ্লু আছে, সোয়াইন ফ্লু আছে। আমরা যদি সরকারের কাছে দাবি করি, ইন্ডিয়ায় বার্ড ফ্লু হয়েছে, বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে যেন বার্ডফ্লু না ঢোকে। এজন্য বর্ডার বন্ধ করে দেন। এটা কি হবে? হবে না। এজন্য বার্ড ফ্লুর বিরুদ্ধে টিকা নিতে হবে। আমার প্রতিরোধ লাগবে। পুরো দেশটাকে আটকানো যাবে না। ঠিক এই ভাবেই যুবকদের ভেতরে প্রতিরোধ তৈরি করতে হবে। প্রতিরোধ হল, তাদের নামায, কুরআন শিখতে হবে। কুরআনের অর্থ কিছুটা হলেও বুঝতে হবে। ভালো মানুষের সোহবতে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তার ভেতরের সচেতনতা তৈরি করতে হবে। ভালো কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। এটা সবচেয়ে বড় জিনিস।

যৌবন মানে গতিশীল ছটফটানি। কাজ করবে। যেমন নদী চলে, খাল চলে না। এই চলাটা যদি তুমি ভালো খাতে প্রবাহিত করো কোটিকোটি মিলিয়ন টাকার বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারবে। আর যদি ওটা খারাপ কাজে যায়, হাজার হাজার একর জমি ভেঙেচুরে যাবে। এজন্য যুবকদের শক্তিটাকে গতিশীল খাতে ব্যয় করার দায়িত্ব সমাজ, দেশ, পিতামাতা এবং যুবকদের নিজেদের। এগুলো যদি করার ব্যবস্থা থাকে..., সমাজ যদি নাও থাকে, নিজেদের করতে হবে। নিজেদেরকে ভালো কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। অলস থাকলেই খারাপের দিকে মন চলে যাবে। তখন

তুমি গানে চলে যাবে, অশ্লীলতার দিকে চলে যাবে। ভালো কথা শোনো, তাহলে অন্তত ব্যস্ত থাকবে। যারা ভালো তারা খারাপদেরকে দাওয়াত দেবে। যুববান্ধব হবে। যুববান্ধব প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে। এভাবে চেষ্টা করতে হবে।

জিজ্ঞাসা: ১১৬

আমার প্রশ্ন, বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত আইএস সম্পর্কে। তারা কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শরীআহ কায়িম করছে? আইএস সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে কি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়? তাদের আগমন-আবির্ভাবের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কিছু পাওয়া যায় কি না?

জবাব:

বহুল আলোচিত হলে আমরাও আলোচনায় জড়িয়ে যাই। প্রথমত আইএস কী, ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি না। মিডিয়া ছাড়া কিছুই জানার উপায় নেই। মিডিয়া থেকে তাদের দাবি থেকে, যা আমরা দেখি, শরীআহ তারা কায়িম করেছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাদের কথার সাথে কর্মের মিল খুব কম দেখা যায়। বাস্তব তো আমরা জানি না। শুধু মিডিয়া-মাধ্যমে যেটা শুনি। মুসলিমদের কখনই উচিত নয় কোনো ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠীর সাথে দীনকে জড়িয়ে ফেলা। আল্লাহর দীন কুরআন-হাদীস এবং সুন্নাহর সাথে। তা সাহাবি-তাবিয়িদের থেকে পাব। আমি আমার দেশে কুরআন-সুন্নাহর মতো চলব। অন্য দেশে কে কোথায় কী করেছেন, না-করেছেন, এই নিয়ে জিন্দাবাদ করা খুবই জটিল ব্যাপার।

যখন উসামা বিন লাদেন এলেন, মানুষজন তো পাগল হয়ে গেল। আমাদের একটা পাগলামি আছে, যেটার জন্য তুমি প্রশ্ন করেছ, কোনো ভবিষ্যৎবাণী আছে কি না। এটাও এক ধরনের জঘন্য পাগলামি যে, কোনো কিছু পেলেই ভবিষ্যদ্বাণীর খোঁজ করা। এটা আসলে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা করে। ইমাম মাহদি একটা ভবিষ্যদ্বাণী। খালি খুঁজে ইমাম মাহদি কবে আসবে। ওই জিনিসটা আমাদের বিজয় নিয়ে আসবে কি না।... এর কারণ হল, আমাদের মনের ভেতরে কষ্ট আছে। আমেরিকান অন্যায় করছে। কবে আমরা সাইজ করতে পারব। এজন্য কোনো কিছু দেখলেই আমরা পাগল হয়ে যাই। যেমন, সমাজে হয়ত একজন খারাপ লোক আছে। তুমি চাও যে সে একটু বিপদে পড়ুক। কিন্তু তোমার বিপদে ফেলানোর ক্ষমতা

নেই। এখন তুমি যদি তার একটু বিপদের খবর শোনা, খুব খুশি হও। অমুকের পুলিশে ধরেছে।...

আমাদের যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসল, তখন এই এলাকার কিছু রাজনৈতিক নেতা এমপি ওদের ব্যাপারে মানুষ খুব খুশি, দুদক কবে এসে ওদের ধরবে। আমরা তো আর সাইজ করতে পারছি না, দুদক যদি একটু করে দেয়। মুমিনের এই চিন্তাটা ঠিক না। উসামা বিন লাদেনের যখন উদ্ভব হল, তখন একবার একভাই তার খুব প্রশংসা করছিল। ওই মিটিংয়ের প্রধান অতিথি ছিলাম আমি। আমি খুব আপত্তি করেছিলাম। দেখেন, ইসলাম তো কোনো ব্যক্তির সাথে জড়িত কিছু না। এটা ৯৮/৯৯ এর কথা বলছি। যখন আমি প্রথম বাংলাদেশে আসি।

ইসলাম কুরআন-সুন্নাহর সাথে জড়িত। আমরা সাহাবি-তাবেয়ি থেকে দীন নিয়েছি। উসামা বিন লাদেন কে? আমরা জানি না। কী করছেন জানি না, তার তথ্য কী, জানি না। যা শুনি সব মিডিয়া থেকে। আর মিডিয়া তো নিয়ন্ত্রণ করেন অমুসলিমরা। যে ভিডিও ক্যাসেট বের হয় সেটা ব্যক্তির, না তার নামে..., এটাও তো আমরা জানি না। কাজেই আমরা কেন ব্যক্তি নিয়ে লাফাব? ওই সময় সারা বাংলাদেশে প্ল্যাকার্ড হল লাদেনের ছবি, আফগানিস্তানে আমেরিকা মার খাচ্ছে। এই সময় আমি আমার শ্বশুরকে বললাম, আমি আর ওয়ায করব না। কারণ বাংলাদেশের লোক চায় গরম ওয়ায অথবা সুবহানাল্লাহ। মিথ্যা কারামতগুলো বলতে হবে– অমুক আকাশ দিয়ে উড়ে গেছিল। সবাই বলবে, সুবহানাল্লাহ। আমি তো এসব জানি না। আর একটা লোক গরম ওয়ায করতে হবে। লাদেনকে নিয়ে কবিতা বলতে হবে। আমি তো এটাও জানি না এবং পছন্দ করি না।

একটা মানুষ ভালো কি মন্দ আমরা জানি না। মিডিয়ায় দেখছি। যা দেখছি তার অনেক কিছুই ভালো না। খ্রিস্টান বা পাশ্চাত্য নীতিতে নিরাপদে লোক মারে তারা। যুদ্ধ করে আফগানিস্তানে বোমা ফেলে দিল। অনেক মানুষ মারা গেল। এতে ইসলাম বলছে যে কোনো নারী-শিশু, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা যাবে না। একজনের অপরাধে অন্যজনকে মারা যাবে না। এখন একটা এম্বাসিতে বোমা মেরে দিল। কে মেরেছে জানি না। লোকে বলল উসামা বিন লাদেন মেরেছে। সেটা তো অনেক লোক মারা গেল। আমি কীভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সমর্থন করব? এটাতো সম্ভবই না। আল্লাহ ভালো জানেন, কে করেছে কীভাবে করেছে। কাজেই আমি গরম ওয়াযও পারব না, সুবহানাল্লাহও পারব না, আমি ওয়ায-

নসিহত বাদ দেব।

ওই সময় অনেকেই আমাকে বলেছেন, আমি এখন তাকবীনি জগতে ঢুকে গেছি। ফেরেশতারা কী করে, না করে আমি সব জানি। তাকবীনি জগতে গিয়ে উনি দেখেছেন, আল্লাহর ফেরেশতারা লাদেনের কাছে বিশ্বের ম্যাপ দিয়ে গেল। কাজেই, ইমাম মাহদি বিশ্ব জয় করবে। এটা মানুষের ইমোশন আবেগ। মূল কথা হল, কোনো ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা জায়িয না। যেমন সিরিয়ার কথা হাদীসে এসেছে। আবার নজদের কথা হাদীসে এসেছে। এখন বর্তমানে অনেকেই সিরিয়ার কথা বলছে। কাজেই সিরিয়ার ব্যাপারে যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী আছে, সুতরাং এটা আইএসের কথা। ৫০০ বছর পর আরেকদল বলবে এটা আমাদের কথা। সিরিয়ার প্রথম হল ইয়াযীদ। ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়া। সিরিয়ার নামে ভবিষ্যদ্বাণী হলেই যদি কারো লাগে, তাহলে ইয়াযীদের ব্যাপার লাগা উচিত। নজদের ব্যাপারে যদি আপনারা ভবিষ্যদ্বাণী শোনেন..., সেখান থেকে শয়তানের শিং বেরাবে। আর সিরিয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নবী দুআ করেছেন। সিরিয়ায় ছিল ইয়াযীদের বাহিনী। আর কুফা বানাইছিল ইমাম হুসাইনের বাহিনী। হাসানের বাহিনী। তাহলে বুঝতে হবে, ইমাম হাসান, হুসাইন খারাপ ছিলেন আর ইয়াযীদ ভালো ছিল! কোনো ভবিষ্যদ্বাণী কারোর উপর প্রয়োগ করা যায় না। এটা যারা করে তারা হয় কুরআন-সুন্নাহর নস্‌টাকে মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে অথবা বোঝে না।

ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আমরা চিন্তা কেন করি। আমাদের ভেতরে আশা, কবে দেখব, আমেরিকা মার খেয়ে পচে গেছে। আমরা তো আর পারছি না!... সাদ্দাম হোসেনকে নিয়ে যে বাঙালি কী পাগল হল। সাদ্দাম হোসেন নিজে একজন নাস্তিক মানুষ। জীবনভর ইসলামের দুশমনি করে তার দেশে কোনো রকম ইসলাম ঢুকতে দেয় নি। আমেরিকার বিরুদ্ধে লেগেছে তাতে আমরা খুশি, কারণ আমেরিকা বড় শয়তান। বাংলাদেশের মানুষেরা সঙ্গেসঙ্গে পাগল হয়ে গেছে। আমি তখন সৌদি এম্বাসিতে চাকরি করি। সবাই আমার বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপা। আমি সব সময়ই সাদ্দামের বিরুদ্ধে ছিলাম। একজন নাস্তিকের পক্ষে যায় কীভাবে মানুষ। ঠিক তেমনই আইএস কী, আমরা জানি না। কে তারা? মুসলিম, ইয়াহুদি না খ্রিস্টান? তাদের কথা সবই ভালো। কাজ ভালো, আমরা এখন পর্যন্ত প্রমাণ পাই নি।

রাসূল (ﷺ) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে যথাসম্ভব সন্ধির চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধ করতে চান নি। তিনি কর দিয়েছেন, যেন যুদ্ধ না হয়। প্রথমেই যখন

হুদায়বিয়ার সন্ধির সুযোগ পেয়েছেন অবমাননাকর চুক্তিতে সই করেছেন। যেন অভ্যন্তরীণ শান্তি নিরাপত্তা বজায় থাকে। জিহাদ থেকেছে, জিহাদ বাধ্য হয়ে করেছেন। চেষ্টা করেছেন সন্ধি এবং শান্তির।

তাদের কার্যক্রম যেটা মিডিয়ায় দেখি। শরীআতের সাথে মেলে না। আল্লাহ্ জানেন তারা কী করেন, না-করেন। কাজেই, তারা অনেক ভালো কথা বলছেন। একজন তো চ্যালেঞ্জ করেছে টুইটারে। তারা আজ পর্যন্ত ইসরাইলের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না। তাদের আগমনের পর থেকে একমাত্র লাভবান হয়েছে ইসরাইল। আর বাশার আল আসাদ বেঁচে গেছে। নুসরা ফ্রন্ট প্রায় সাইজ করে ফেলেছিল, আইএস আসার কারণে নুসরা ফ্রন্ট সাইজ হয়ে গেছে। বাশার বেঁচে গেছে। এটা হল তার চ্যালেঞ্জ।

সব মিলিয়ে আমরা জানি না। বিশেষ করে আমরা যারা বাংলাদেশে আছি, তাদের এই নিয়ে চিন্তা করারও দরকার নেই। সেখানে যারা আছে তারা বুঝবে, এটা ভালো না খারাপ। আমাদের দেশে আমরা নিজেরা দীন পালন করি, দীনের দাওয়াত দেই, মানুষকে দীনের পথে আনার জন্য চেষ্টা করতে।

আমাকে একজন বলল স্যার, আমি হিজরত করব। আমি বললাম কোথ ায়? সে বলল, সিরিয়ায় চলে যাবে জিহাদ করতে। আমি বললাম, জিহাদ করলে কী হবে? যারা সেখানে আছে তারাই জিহাদ করে কিছু হচ্ছে না, তোমরা ১০/২০/৫০ জন কী করবে? সে বলল, শহীদ হয়ে যাব।

দেখো, আমাদের দেশে ভালো মানুষ কম। খারাপ মানুষ বেশি। যুবকদের ভেতরেও ৯৮ শতাংশ খারাপ। তোমরা কিছু ভালো মানুষ আছে। ধরো, সারা বাংলাদেশে মিলে দুইলাখ ভালো মানুষ আছে। ভালো তরুণ-যুবক আছে। তোমরা সব শহীদ হয়ে গেলে। তাহলে বাংলাদেশেটা কাদের জন্য থাকল?। কি মনে হয় তোমার? তোমাকে কে বলেছে যে নিজের দেশে দাওয়াত না দিয়ে অন্য দেশে গিয়ে জিহাদ করতে হবে? এটা তোমাকে কেউ বলে নি। জিহাদ যদি ফরয হয় তাদের দেশে হবে। আলিমরা বলেন, সে দেশে না হলে তার পরের দেশে তারপরে তার পাশের দেশ। এগুলো কুরআন-হাদীসের কোনো কথা না। তবুও সেসব দেশের মানুষ আলিম-উলামারা বলবেন। এখানে তাদের দরকার আছে কি না। যারা জিহাদের দাবি করছেন, তারা সত্যিই মুজাহিদ কি না। কিন্তু আমরা এত দূর থেকে

এত আবেগী হয়ে কোনো লাভ নেই। এ রকমভাবে অনেক হয়েছে, রক্ত ঝরানো ছাড়া কোনো লাভ হয় নি। আফগানিস্তানের শরীআহসম্মত জিহাদ। উলামারা সমর্থন করেছেন। কিন্তু দীনের কী পরিবর্তন হয়েছে? কাজেই জিহাদ শরীআতসম্মত হলে মানুষ করবে। আমরা জানি না, তারা কী করছেন। যে কাজগুলো আমরা শুনছি, ইসলামি শরীআতে মেলে না।

শোনা যায়, আইএস নাকি প্যারিসে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। এটা ইউরোপিয়ান যুদ্ধনীতিতে ঠিক আছে। তারা ইরাকে বোমা মারছে, ফালুজায় বোমা মারছে, তাদের কোনো নীতি-ধর্ম নেই। বাইবেল অনুযায়ী ঠিক আছে। বাইবেলে একজনের অপরাধে অন্যজনের মারার নির্দেশ আছে। ইসলামে নেই। রাজার অপরাধে নিরস্ত্র নাগরিকদের মারা জায়িয নেই। কোনো যুক্তিতে তোমরা বলতে পারবে কি না, অস্ত্রহীন, যুদ্ধের ময়দানে নেই, সাধারণ মানুষ তুমি যে মেরে ফেলে দিলে! শরীআতে আমরা অন্তত খুঁজে পাই নি। এখন আইএস মেরেছে কি না, জানি না। কী যুক্তিতে মেরেছে তাও জানি না। তবে এটা আমরা কোনোভাবেই শরীআতের আলোকে সমর্থন করতে পারি না। কাজেই এগুলো নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র অনেক। আইএস কে, কারা বানিয়েছে, কারা হয়েছে, এত অস্ত্র কোথায় পাচ্ছে, কীভাবে, তারা কীভাবে টিকে রয়েছে, কতটুকু এগোবে? এটা নিয়ে চিন্তা করে আমাদের লাভ নেই। আমরা নিজেদের দেশে দাওয়াতের কাজ করব।

খেলাধুলা/বিনোদন

জিজ্ঞাসা: ১১৭

আমেরিকা থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন, হালাল এন্টারটেইনমেন্টের (বিনোদনের) ভেতরে কী কী বিষয় পড়ে?

জবাব:

ইসলাম মূলত সব বিনোদনই বৈধ করে যতক্ষণ না সেটার ভেতরে হারাম থাকে। হালাল এন্টারটেইনমেন্টের ভেতরে পড়ে, যেটা অশ্লীলতামুক্ত। সাধারণ কোনো অনুষ্ঠান, ইসলামিক গান, গযল, ছড়া, সাহিত্য, কবিতা। সাধারণ কোনো ড্রামা, যেটা অশ্লীলতামুক্ত, ভালো যদি কেউ করতে পারে। এটা সাধারণত বর্তমানে নেই। এগুলো সব পড়ে। এছাড়া পার্কে যাওয়া, বেড়ানো ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা: ১১৮

এক যুবক প্রশ্ন করেছেন, আমাদের এলাকায় শীতের মৌসুমে ব্যাডমিন্টন খেলা হয়। এবছর এলাকার কিছু যুবক ছেলে টুর্নামেন্ট ছেড়েছে। মোট ২৪টি দলে ৪৮ জন খেলোয়াড় থাকবে। সবার থেকে ৫০০ টাকা করে চাঁদা ধরা হয়েছে। ২০০ টাকা খেলার খরচ বাবদ আর বাকি টাকা দিয়ে বিজয়ী দুই দলকে পুরস্কৃত করা হবে। হুযুরের কাছে জানতে চাই, এভাবে খেলাধুলা শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

জবাব:

প্রথমত শরীর চর্চামূলক খেলাধুলাকে ইসলাম উৎসাহ দেয়। তবে জুয়া

খেলাকে হারাম করে। এটা জুয়ার ভেতরে চলে গেছে। অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষ প্রাইজ (পুরস্কার) দিলে এটা বৈধ। খেলার খরচ বাবদ প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু খরচ নেওয়া যেতে পারে। যেটা খরচে চলে যাবে। কিন্তু জুয়া কাকে বলে? ১০ জন টাকা দেবে। হার-জিতের মাধ্যমে একজন টাকা পাবে। এটার নাম জুয়া। যে পদ্ধতিতেই হোক। সেটা লটারি মাধ্যমে হোক বা হার-জিতের মাধ্যমে হোক। আমি আপনি সাতজনে টাকা দেব। কোনো যৌক্তিকভাবে নয়, ভাগ্য নির্ভরভাবে একজন টাকা নিয়ে যাবে। একজনের কপালে উঠে যাবে, সে টাকা পেয়ে যাবে। এটার নাম জুয়া। এজন্য খেলাতে যদি প্রত্যেক অংশীদার প্রাইজের টাকা জমা দেয়। আর একজন প্রাইজটা নিয়ে যায়, এটা জুয়া।

তবে খেলার খরচ বাবদ; ভাই আমরা মাঠ তৈরি করব। আমরা সবাই অংশগ্রহণ করে খেলাটা করব। প্রাইজ হতে হবে তৃতীয় পক্ষ থেকে। অংশগ্রহণকারীদের থেকে নয়। তাহলে বৈধ হবে। আর এটা ভাই যে অবস্থা বলেছেন, এইটাতে জুয়ায় পরিণত হবে।

জিজ্ঞাসা: ১১৯

ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলায় ম্যাচপ্রতি যদি খেলোয়াড় টাকা নেয়, তাহলে ইসলামি শরীআতের হুকুম কী? এটা বৈধ হবে কি না?

জবাব:

যে খেলা শরীআতে বৈধ... খেলা কয়েক রকম। এক রকমের খেলা হল ভাগ্যনির্ভর। তাস, দাবা ইত্যাদি। এগুলো জায়িয নেই। আরেকটা হল শরীরচর্চামূলক। খেলা দুই প্রকারের। নাজায়িয খেলা, যেটাতে কোনো শরীরচর্চা নেই, ভাগ্যনির্ভর খেলা। আরেকটা হল সেটাতে শরীরচর্চা আছে। শরীরচর্চামূলক খেলাগুলো বৈধ। রাসূল (ﷺ) উৎসাহ দিয়েছেন। এটা খেলা বৈধ, উত্তম। কিন্তু খেলার ম্যাচ করা, এটাকে যে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এমন না। তবে এগুলো বৈধ খেলা। বৈধ খেলাতে যদি কোনো অবৈধ কিছু না থাকে, বেপর্দা, তাহলে এটা বৈধ। আর এই ধরনের খেলায় অংশ নেবার জন্য যদি কেউ অর্থ নেয়, তাহলে এটা অবৈধ না।

বিবিধ

জিজ্ঞাসা: ১২০

দীন পালন সম্পর্কে যদি সামান্য কিছু বলতেন।

জবাব:

আমরা সবাই দীনকে জানার চেষ্টা করছি। জানার সময় আমাদের হৃদয়ে চেতনা হবে যে, আমি ভালো কথাটা জানব, শুনব, পালন করব। তবে আল্লাহ কুরআন কারীমে মুমিনদের একটা বিশেষণ বলেছেন:

اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ.

মুমিন পড়বে। পড়ার পাশাপাশি শুনবে। যা শুনবে তাই-ই পালন করবে না। কথা বাছাই করে, যাচাই করে সুন্দরটা পালন করবে।[১] এটাই মুমিনের গুণ কিন্তু। অর্থাৎ আমরা যা শুনব, অমুক হুযুর বলেছেন, পালন করব– এটা কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বলেন নি। পড়বে, কুরআনে যা আছে তাই পালন করবে। হাদীসে যা আছে তাই পালন করবে। শুনবে। শুনে যাচাই করার মতো ক্ষমতা রাখতে হবে। এই ক্ষমতাটা কুরআন-সুন্নাহ পড়লে হবে। আমরা শুনি, পাশাপাশি পড়ি। কুরআন পড়ি, হাদীস পড়ি। আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত মুমিন হওয়ার তাওফীক দিন– যারা শোনে, শোনার ভেতর থেকে ভালো কথাটাকে আমল করে।

জিজ্ঞাসা: ১২১

আমি ইসলামি অর্থনীতি জানতে চাই। আমাকে কী পড়তে হবে?

---

১. সূরা: [৩৯] যুমার, আয়াত: ১৮।

জবাবঃ

ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে প্রচুর বইপত্র আছে, ইন্টারনেটে আছে, ওয়েবসাইটে আছে, বাজারে আছে। পড়া ছাড়া তো বিকল্প কিছু নেই।

জিজ্ঞাসাঃ ১২২

মোবাইলের ভেতরে আমরা দেখি মেমোরি কার্ডের মধ্যে কিছু খারাপ জিনিস রাখার সুযোগ থাকে। আবার ভালো জিনিসও রাখার সুযোগ থাকে। এরকম যদি কেউ মিশ্রণ করে রাখে, সে ক্ষেত্রে ভালো জিনিসটা রাখা কি ঠিক আছে?

জবাবঃ

হ্যাঁ, রাখা যায়। একটা লাইব্রেরিতে উপন্যাসের বই আছে– খারাপ বই আছে বলে ভালো বই রাখা যাবে না, ভালো বই বেচারারা বিক্রি করতে পারবে না– এটাতো আমরা বলতে পারব না। আমাদের বইয়ের দোকানের সেলফ, আমাদের বাড়ির যে তাকগুলো, এর মতোই মেমোরি কার্ড হল একই জিনিস। এখানে ভালোর পাশে খারাপ রাখাটা কোনো সমস্যা না। তবে আমাদের খারাপ না রেখে ভালোটা রাখাই উচিত– এটা বলা যেতে পারে। যদি কিছু খারাপ আছে বলে আর ভালো রাখা যাবে না... একজন তার বাড়িতে কয়েক গ্যালন মদ রেখেছে বলে কয়েক গ্যালন পানি রাখতে পারবে না– এটা তো আমরা বলতে পারব না।

জিজ্ঞাসাঃ ১২৩

কোনো কোনো আলিম নাকি জিন পালেন। জিনের সাথে কথা বলেন। এই বিষয়টির সত্যতা কতটুকু? এটা সম্ভব কি না?

জবাবঃ

এই ব্যাপারে কয়েকটা পর্যায় আছে। জিনের সাথে মানুষের সাক্ষাৎ হওয়া, কথা হওয়া সম্ভব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে জিনের দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। সাহাবিদের সাথে জিনের দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। কাজেই জিনের সাথে সাক্ষাত-কথা, এটা সম্ভব। এটা হল প্রথম পর্যায়। যেমন

আবু হুরাইরা (রা.) রাসূল (ﷺ) এর খাদ্যভাণ্ডার রক্ষা করছেন। একজন রাতে চুরি করে করে খেয়ে যায়, তিনি তাকে ধরলেন। এরপর উনি তাঁকে একটা দুআ শিখিয়ে দিলে পালিয়ে গেল। রাসূল (ﷺ) বললেন, এটা ইবলিস ছিল। কাজেই, মানুষ দেখতে পারে, তাদের সাথে কথা বলতে পারে। এরকম ঘটনা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু জিনের সাথে কথা বলা দাবি সত্য না মিথ্যা– তা আমরা জানতে পারব না। কারণ জিন কখনো আমরা দেখি না। একটা মানুষের আকৃতিতে মানুষের মাধ্যমে আসে, আল্লাহ জানেন সত্য-মিথ্যা। এটা দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় হল, জিন পালন করা, জিন পোষা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কাজ। আল্লাহ কুরআনে সূরা জিনে বলেছেন:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا.

কিছু মানুষ জিনদের কাছে আশ্রয়গ্রহণ করত, সহযোগিতা নিত। এই জিনেরা তাদের সাহায্য করে নি। তাদের কষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে।[২] কাজেই জিন পালন করা, জিন বশ করা, জিনের মাধ্যমে তদবীর করা– এই কাজগুলো ইসলামি শরীআতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে জিনের সাথে কথা সম্ভব। কথা হয়ে যেতে পারে। দেখা সম্ভব। দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জিন পালনের মাধ্যমে দুআ তদবীর করা, এগুলো সবই যাদু পর্যায়ের।

জ্ঞানীদের অহংকার

---

২. সূরা: [৭২] জিন্ন, আয়াত: ৬। + ৫:২২৮

অনুবাদকের প্রকাশিত কয়েকটি বই

০১ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
০২ এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
০৩ রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিকির ও ওযীফা
০৪ হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
০৫ ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-মাউযূআত: একটি বিশ্লেষনাত্মক পর্যালোচনা
০৬ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে, পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা
০৭ খুতবাতুল ইসলাম: জুমুয়ার খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
০৮ বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
০৯ ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ
১০ ইমাম আবু হানিফা (রাহ) রচিত আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
১১ সিয়াম নির্দেশিকা
১২ ইসলামে পর্দা
১৩ মুসলমানী নেসাব: আরাকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল ﷺ
১৪ সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
১৫ সহীহ মাসনূন ওযীফা
১৬ আল্লাহর পথে দাওয়াত
১৭ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবেবরাত: ফযীলত ও আমল
১৮ সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান
১৯ মুনাজাত ও নামায
২০ বুহুসুন ফী উলূমিল হাদীস (আরবি ভাষায় রচিত)
২১ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক ও ইসলামী পোশাকের বিধান
২২ তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ
২৩ কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম
২৪ পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা
২৫ মুসনাদ আহমাদ (ইমাম আহমাদ রচিত) বঙ্গানুবাদ, (আংশিক)
২৬ ইযাহারুল হক্ক বা সত্যের বিজয় (আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত), বঙ্গানুবাদ, (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড)
২৭ ইসলামের তিন মূলনীতি: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বঙ্গানুবাদ)
২৮ ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতি আমীমুল ইহসান রচিত হাদীস ভিত্তিক ফিকহ গ্রন্থ), বঙ্গানুবাদ, (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড)
২৯ A Woman From Desert
৩০ জিজ্ঞাসা ও জবাব (১ম খণ্ড)
৩১ জামায়াত ও ঐক্য
৩২ ঈদে মিলাদুন্নবী
৩৩ হজ্জের আধ্যাত্মিক শিক্ষা
৩৪ রামাদানের সাওগাত
৩৫ সালাত, দু'আ ও যিক্‌র
৩৬ জিজ্ঞাসা ও জবাব (২য় খণ্ড)
৩৭ জিজ্ঞাসা ও জবাব (৩য় খণ্ড)
৩৮ জিজ্ঞাসা ও জবাব (৪র্থ খণ্ড)
৩৯ দৈনন্দিন মাসনূন দুআ ও যিক্‌র

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

মোবাইল: ০১৭৩০৭৪৭০০১, ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮

dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust

www.assunnahtrust.com